সূচিপত্র।

বঙ্গদর্শন।

৮৫ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। সেই জনহীন কানন,—এতক্ষণ অন্ধকার, শব্দহীন ছিল—এখন আলোকময়—পক্ষিকূজনশব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল। সেই আনন্দময় প্রভাতে আনন্দময় কাননে, "আনন্দমন্দিরে," সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্ম্মে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। কাছে বসিয়া জীবানন্দ। এমন সময়ে ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রহ্মচারী বিনাবাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন, কেহ কোন কথা কহিতে সাহস করিল না। পরে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইলে, ভবানন্দ, জীবানন্দ উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানি না। তাহার পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্যবদনে মহেন্দ্রকে বলিলেন, "বাবা তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্ত্রী কন্যাকে কাল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষাবৃত্তান্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর বলিলেন যে, "চল তাহারা যেখানে আছে তোমাকে সেখানে লইয়া যাই।"

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী অগ্রে অগ্রে মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়-অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র দেখিল অতি বিস্তৃত, অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। এই নবারুণোদিত প্রাতঃকালে, যখন

নিকটস্থ কানন সূর্য্যালোকে হীরকখচিতবৎ জ্বলিতেছে তখনও সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতর কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না—দেখিতে দেখিতে দেখিতে দেখিতে ক্রমে দেখিতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিত-হৃদয়, সম্মুখে সুদর্শনচক্র ঘূর্ণ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটভস্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্নমস্ত মূর্ত্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে লক্ষ্মী আলুলায়িতকুন্তলা শতদলমালামণ্ডিতা ভয়ত্রস্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, বাদ্যযন্ত্র, মূর্ত্তিমান্ রাগ রাগিণী প্রভৃতিপরিবেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সর্ব্বোপরি, বিষ্ণুর মাথার উপরে উচ্চ মঞ্চে বহুলরত্নমণ্ডিত আসনোপবিষ্টা এক মোহিনী মূর্ত্তি—লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক সুন্দরী, লক্ষ্মী সরস্বতীর অধিক ঐশ্বর্য্যান্বিতা। গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাঁহাকে পূজা করিতেছে। ব্রহ্মচারী অতি গম্ভীর, অতি ভীত স্বরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সকল দেখিতে পাইতেছ।" মহেন্দ্র বলিল, "পাইতেছি।"

ব্রহ্ম। উপরে কি আছে দেখিয়াছ।

মহে। দেখিয়াছি, কে উনি?

ব্রহ্ম। মা?

মহে। মা কে?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আমরা যাঁর সন্তান।"

মহেন্দ্র। কে তিনি।

ব্রহ্ম। সময়ে চিনিবে। বল—বন্দে মাতরং। এখন চল, দেখিবে চল।

তখন ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। সেখানে মহেন্দ্র দেখিলেন এক অপরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?"

ব্র। মা—যা ছিলেন।

ম। সে কি?

ব্র। ইনি কুঞ্জর কেশরী প্রভৃতি বন্যপশু সকল পদতলে দলিত করিয়া, বন্যপশুর আবাসস্থানে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বালঙ্কারপরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি বালার্কবর্ণাভা সকল-ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহাকে প্রণাম কর।"

মহেন্দ্র ভক্তিভাবে জগদ্ধাত্রীরূপিণী মাতৃভূমিকে প্রণাম করিলে পর, ব্রহ্মচারী তাঁহাকে এক অন্ধকার সুড়ঙ্গ দেখাইয়া বলিলেন "এই পথে আইস।" ব্রহ্মচারী স্বয়ং আগে আগে চলিলেন। মহেন্দ্র সভয়ে পাছু পাছু চলিলেন। ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কোথা হইতে সামান্য আলো আসিতেছিল। সেই ক্ষীণালোকে এক কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,

"দেখ মা যা হইয়াছেন।"

মহেন্দ্র সভয়ে বলিল, "কালী?"

ব্র। কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্ব্বস্বা এই জন্য নগ্নিকা। আজি দেশের সর্ব্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন—হায় মা!

ব্রহ্মচারীর চক্ষে দর দর ধারা পড়িতে লাগিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাতে খেটক খর্পর কেন?"

ব্রহ্ম। আমরা সন্তান; অস্ত্র মার হাতে এই দিয়াছি মাত্র—বল বন্দে মাতরং।

"বন্দে মাতরং" বলিয়া মহেন্দ্র কালীকে প্রণাম করিল। তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "এই পথে আইস।" এই বলিয়া তিনি দ্বিতীয় সুড়ঙ্গ আরোহণ করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহাদিগের চক্ষে প্রাতঃসূর্য্যের রশ্মিরাশি প্রভাসিত হইল। চারিদিক্ হইতে মধুরকণ্ঠ পক্ষিকুল গায়িয়া উঠিল। দেখিলেন এক মর্ম্মর প্রস্তরনির্ম্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে সুবর্ণনির্ম্মিতা দশভুজা প্রতিমা নবারুণকিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছে। ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন,

"এই মা যা হইবেন। দশভুজ দশদিকে প্রসারিত,—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা"—বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদ কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল "দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী শত্রুমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ। এস আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি। তখন দুই জনে যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে, এক কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে, শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।"

উভয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদ্গদ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মার এ মূর্ত্তি কবে দেখিতে পাইব।"

ব্রহ্মচারী বলিল, "যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে। সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

মহেন্দ্র সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার স্ত্রী কন্যা কোথায়?"

ব্রহ্ম। চল—দেখিবে চল।

মহেন্দ্র। তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব?

ব্রহ্ম। কেন বিদায় দিবে?

ম। আমি এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিব।

ব্রহ্ম। কোথা বিদায় দিবে।

মহেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে কেহ নাই, আমার আর স্থানও নাই। এ মহামারীর সময় আর কোথায় বা স্থান পাইব।"

ব্রহ্ম। যে পথে এখানে আসিলে, সেই পথে মন্দিরের বাহিরে যাও। মন্দিরদ্বারে তোমার স্ত্রী কন্যাকে দেখিতে

পাইবে। কল্যাণী এ পর্য্যন্ত অভুক্তা। যেখানে তাহারা বসিয়া আছে, সেইখানে ভক্ষ্য সামগ্রী পাইবে। তাহাকে ভোজন করাইয়া তোমার যাহা অভিরুচি তাহা করিও, এক্ষণে আমাদিগের আর কাহারও সাক্ষাৎ পাইবে না। তোমার মন যদি এইরূপ থাকে, তবে উপযুক্ত সময়ে, তোমাকে দেখা দিব।

তখন অকস্মাৎ কোন পথে ব্রহ্মচারী অন্তর্হিত হইল। মহেন্দ্র পূর্ব্বপ্রদৃষ্ট পথে নির্গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, নাটমন্দিরে কল্যাণী কন্যা লইয়া বসিয়া আছে।

এ দিকে সত্যানন্দ অন্য সুরঙ্গ দিয়া অবতরণপূর্ব্বক এক নিভৃত ভূগর্ভকক্ষায় নামিলেন। সেখানে জীবানন্দ ও ভবানন্দ বসিয়া টাকা গণিয়া থরে থরে সাজাইতেছে। সেই ঘরে স্তূপে স্তূপে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, হীরক, প্রবাল, মুক্তা সজ্জিত রহিয়াছে। গত রাত্রের লুঠের টাকা, ইহারা সাজাইয়া রাখিতেছে। সত্যানন্দ সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "জীবানন্দ! মহেন্দ্র আসিবে। আসিলে সন্তানের বিশেষ উপকার আছে। কেন না তাহা হইলে উহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি মার সেবায় অর্পিত হইবে। কিন্তু যতদিন সে কায়মনোবাক্যে মাতৃভক্ত না হয়, ততদিন তাহাকে গ্রহণ করিও না। তোমাদিগের হাতের কাজ সমাপ্ত হইলে, তোমরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উহার অনুসরণ করিও। সময় দেখিলে, উহাকে শ্রীবিষ্ণুমণ্ডপে উপস্থিত করিও। আর সময়ে হউক, অসময়ে হউক, উহাদিগের প্রাণরক্ষা করিও। কেন না যেমন দুষ্টের শাসন সন্তানের ধর্ম্ম, শিষ্টের রক্ষাও সেইরূপ ধর্ম্ম।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দুঃখের পর মহেন্দ্র আর কল্যাণীতে সাক্ষাৎ হইল। কল্যাণী কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র আরও কাঁদিল। কাঁদাকাটার পর চোখমুছার ধুম পড়িয়া গেল। যতবার চোখ মুছা যায়, ততবার আবার জল পড়ে। জলপড়া বন্ধ করিবার জন্য কল্যাণী খাবার কথা পাড়িল। ব্রহ্মচারীর চেলা যে খাবার রাখিয়া গিয়াছে, কল্যাণী মহেন্দ্রকে তাহা খাইতে বলিল। দুর্ভিক্ষের দিনে অন্ন ব্যঞ্জন পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কিন্তু দেশে যাহা আছে, সন্তানের কাছে তাহা সুলভ। সেই কানন সাধারণ মনুষ্যের অগম্য। যেখানে যে গাছে, যে ফল হয়, উপবাসী মনুষ্যগণ তাহা পাড়িয়া খায়। কিন্তু এই অগম্য অরণ্যের গাছের ফল, আর কেহ পায় না। এই জন্য ব্রহ্মচারীর অনুচর বহুতর বন্যফল ও কিছু দুগ্ধ আনিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিল। কল্যাণীর অনুরোধে মহেন্দ্র প্রথমে কিছু ভোজন করিলেন। তাহার পর ভুক্তাবশেষ কল্যাণী বিরলে বসিয়া কিছু খাইল। দুগ্ধ কন্যাকে কিছু

খাওয়াইল, কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখিল, আবার খাওয়াইবে। তার পর নিদ্রায় উভয়ে পীড়িত হইলে, উভয়ে শ্রমদূর করিল। পরে নিদ্রাভঙ্গের পর উভয়ে আলোচনা করিতে লাগিলেন, এখন কোথায় যাই। কল্যাণী বলিল, বাটীতে বিপদ্ বিবেচনা করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি, বাড়ীর অপেক্ষা বাহিরে বিপদ্ অধিক। তবে চল, বাড়ীতেই ফিরিয়া যাই। মহেন্দ্রেরও তাহা অভিপ্রেত। মহেন্দ্রের ইচ্ছা কল্যাণীকে গৃহে রাখিয়া কোন প্রকারে একজন অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিয়া এই পরম রমণীয় অপার্থিব পবিত্রতাযুক্ত মাতৃসেবা ব্রত গ্রহণ করেন। অতএব তিনি সহজেই সম্মত হইলেন। তখন দুইজনে গতক্লম হইয়া কন্যা কোলে তুলিয়া পদচিহ্নাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু পদচিহ্নে কোন পথে যাইতে হইবে, সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যানীমধ্যে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে, বন হইতে বাহির হইতে পারিলেই পথ পাইবেন। কিন্তু বন হইতে বাহির হইবার ত পথ পাওয়া যায় না। অনেকক্ষণ বনের ভিতর ঘুরিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই মঠেই ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন, নির্গমের পথ পাওয়া যায় না। সম্মুখে একজন বৈষ্ণববেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোঁসাই হাস কেন?"

গোঁসাই বলিল, "তোমরা এ বনে প্রবেশ করিলে কি প্রকারে?"

মহেন্দ্র। যেপ্রকারেই হউক, প্রবেশ করিয়াছি।

গোঁসাই। প্রবেশ করিয়াছ ত বাহির হইতে পারিতেছ না কেন? এই বলিয়া বৈষ্ণব আবার হাসিতে লাগিল।

রুষ্ট হইয়া মহেন্দ্র বলিলেন, "তুমি হাসিতেছ, তুমি বাহির হইতে পার?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার সঙ্গে আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি। তোমরা অবশ্য কোন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। নচেৎ এ মঠে আসিবার বা বাহির হইবার পথ আর কেহই জানে না।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বলিল, "আপনি সন্তান?"

বৈষ্ণব বলিল, "হাঁ আমিও সন্তান, আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবার জন্যই আমি এখানে দাঁড়াইয়া আছি।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম কি?"

বৈষ্ণব বলিল, "আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"

এই বলিয়া ধীরানন্দ অগ্রে অগ্রে চলিলেন, মহেন্দ্র, কল্যাণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ধীরানন্দ অতি দুর্গম পথ

দিয়া তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দিয়া, একা বনমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

আনন্দারণ্য হইতে তাহারা বাহিরে আসিলে কিছু দূরে সবৃক্ষপ্রান্তর আরম্ভ হইল। প্রান্তর এক দিকে রহিল, বনের ধারে ধারে রাজপথ। একস্থানে অরণ্যমধ্য দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী কলকল শব্দে বহিতেছে। জল অতি পরিষ্কার, নিবিড় মেঘের মত কালো। দুইপাশে শ্যামল শোভাময় নানা জাতীয় বৃক্ষ নদীকে ছায়া করিয়া আছে, নানা জাতীয় পক্ষী বৃক্ষে বসিয়া নানাবিধ রব করিতেছে। সেই রব—সেও মধুর—মধুর নদীর রবের সঙ্গে মিশিতেছে। তেমনি করিয়া বৃক্ষের ছায়া আর জলের বর্ণ মিশিয়াছে। কল্যাণীর মনও বুঝি সেই ছায়ার সঙ্গে মিশিল। কল্যাণী নদীতীরে এক বৃক্ষমূলে বসিলেন, স্বামীকে নিকটে বসিতে বলিলেন। স্বামী বসিলেন, কল্যাণী স্বামীর কোল হইতে কন্যাকে কোলে লইলেন। স্বামীর হাত হাতে লইয়া কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে আজি বড় বিমর্ষ দেখিতেছি? বিপদ যাহা তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছি—এখন এত বিষাদ কেন?"

মহেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমি আর আপনার নহি—আমি কি করিব বুঝিতে পারি না।"

ক। কেন?

ম। "তোমাকে হারাইলে পর আমার যাহা যাহা ঘটিয়াছিল শুন।" এই বলিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল মহেন্দ্র তাহা সবিস্তারে বলিল।

কল্যাণী বলিলেন, "আমারও অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ গিয়াছে। তুমি শুনিয়া কি করিবে? অতিশয় বিপদেও আমার কেমন করে ঘুম আসিয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু আমি কাল শেষ রাত্রে ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারি না—আমি এক আশ্চর্য্য স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই কেবল আলোময় মূর্ত্তি, সেখানে শব্দ নাই কেবল অতি দূরে যেন কি মধুর গীত বাদ্য হইতেছে এমনি একটা শব্দ। সর্ব্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ। সেখানে যেন সকলের উপরে সকলের দর্শনীয়স্থানে কে বসিয়া আছেন, যেন নীল পর্ব্বত অগ্নিপ্রভ হইয়া ভিতরে মন্দ মন্দ জ্বলিতেছে। অগ্নিময় বৃহৎ কিরীট তাঁহার মাথায়। তাঁর যেন চারি হাত। তাঁর দুই দিকে কি আমি চিনিতে পারিলাম না—বোধ হয় স্ত্রীমূর্ত্তি, কিন্তু এত রূপ, এত জ্যোতিঃ, এত সৌরভ যে আমি সেদিকে চাহিলেই বিহ্বল হইতে লাগিলাম; চাহিতে পারিলাম না, দেখিতে পারিলাম না যে কে। যেন সেই চতু-

ভুজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর এক স্ত্রী মূর্ত্তি! সেও জ্যোতির্ম্ময়ী কিন্তু চারি দিকে মেঘ, আভা ভাল বাহির হইতেছে না, অস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে অতি শীর্ণা কিন্তু অতি রূপবতী মর্ম্মপীড়িতা কোন স্ত্রী মূর্ত্তি কাঁদিতেছে। আমাকে যেন সুগন্ধ মন্দ পবন বহিয়া বহিয়া ঢেউ দিতে দিতে সেই চতুর্ভুজের সিংহাসনতলে আনিয়া ফেলিল। যেন সেই মেঘমণ্ডিতা শীর্ণা স্ত্রী আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'এই সে—ইহারই জন্যে মহেন্দ্র আমার কোলে আসে না।' তখন যেন এক অতি পরিষ্কার সুমধুর বাঁশীর শব্দের মত শব্দ হইল। সেই চতুর্ভুজ যেন আমাকে বলিলেন, 'তুমি স্বামীকে ছাড়িয়া আমার কাছে এস। এই তোমাদের মা, তোমার স্বামী এঁর সেবা করিবে। তুমি স্বামীর কাছে থাকিলে এঁর সেবা হইবে না; তুমি চলিয়া আইস।'—আমি যেন কাঁদিয়া বলিলাম, 'স্বামী ছাড়িয়া আসিব কি প্রকারে।' তখন আবার সেই বাঁশীর শব্দে শব্দ হইল 'আমি স্বামী, আমি মাতা, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি কন্যা, আমার কাছে এস।' আমি কি বলিলাম মনে নাই। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।' এই বলিয়া কল্যাণী নীরব হইয়া রহিলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত, স্তম্ভিত, ভীত হইয়া নীরবে রহিলেন। মাথার উপর দোয়েল ঝঙ্কার করিতে লাগিল। পাপিয়া স্বরে আকাশ প্লাবিত করিতে লাগিল। কোকিল দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। ভীমরাজ কলকণ্ঠে কানন কম্পিত করিতে লাগিল। পদতলে তটিনী মৃদু কল্লোল করিতেছিল। বায়ু বন্যপুষ্পের মৃদু গন্ধ আনিয়া দিতেছিল। কোথাও মধ্যে মধ্যে নদীজলে রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। কোথাও তালপত্র মৃদু পবনে মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল। দূরে নীল পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। দুই জনে অনেকক্ষণ মুগ্ধ হইয়া নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ভাবিতেছ?"

মহে। কি করিব তাহাই ভাবি—স্বপ্ন কেবল বিভীষিকামাত্র, আপনার মনে জন্মিয়া আপনি লয় পায়, জীবনের জলবিম্ব—চল গৃহে যাই।

ক। যেখানে দেবতা তোমাকে যাইতে বলেন তুমি সেইখানে যাও—এই বলিয়া কল্যাণী কন্যাকে স্বামীর কোলে দিলেন।

মহেন্দ্র কন্যা কোলে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর তুমি—তুমি কোথায় যাইবে—"

কল্যাণী দুই হাতে দুই চোক ঢাকিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "আমাকেও দেবতা যেখানে যাইতে বলিয়াছেন আমিও সেইখানে যাইব।"

মহেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বলিল "সে কোথা, কি প্রকারে যাইবে?"—

কল্যাণী বিষের কৌটা দেখাইলেন।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ? বিষ খাইবে ?"

ক। "খাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু—"

কল্যাণী নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিল। প্রতিপলকে বৎসর বোধ হইতে লাগিল। কল্যাণী আর কথা শেষ করিল না দেখিয়া মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কিন্তু কি বলিতেছিলে ?"

ক। খাইব মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু তোমাকে রাখিয়া—সুকুমারীকে রাখিয়া—বৈকুণ্ঠেও আমার যাইতে ইচ্ছা করে না। আমি মরিব না।

এই কথা বলিয়া কল্যাণী বিষের কৌটা মাটীতে রাখিলেন। তখন দুই জনে ভূত ও ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় উভয়েই অন্যমনস্ক হইলেন। এই অবকাশে মেয়েটি খেলা করিতে করিতে বিষের কৌটা তুলিয়া লইল। কেহই তাহা দেখিলেন না।

সুকুমারী মনে করিল, এটি বেশ খেলিবার জিনিস। কৌটাটী একবার বাঁ হাতে ধরিয়া দাহিন হাতে বেশ করিয়া তাহাকে চাপড়াইল, তার পর দাহিন হাতে ধরিয়া বাঁ হাতে তাহাকে চাপড়াইল। তার পর দুই হাতে ধরিয়া টানাটানি করিল। সুতরাং কৌটাটি খুলিয়া গেল—বড়িটি পড়িয়া গেল।

বাপের কাপড়ের উপর ছোট গুলিটি পড়িয়া গেল—সুকুমারী তাহা দেখিল। মনে করিল, এও আর একটা খেলিবার জিনিস। কৌটা ফেলিয়া দিয়া থাবা মারিয়া বড়িটি তুলিয়া লইল।

কৌটাটী সুকুমারী কেন গালে দেয় নাই বলিতে পারি না—কিন্তু বড়িটি সম্বন্ধে কালবিলম্ব হইল না। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং—সুকুমারী বড়িটি মুখে পুরিল। সেই সময়ে তাহার উপর মার নজর পড়িল।

"কি খাইল ! কি খাইল ! সর্ব্বনাশ !" কল্যাণী ইহা বলিয়া, কন্যার মুখের ভিতর আঙ্গুল পুরিল। তখন উভয়েই দেখিলেন যে, বিষের কৌটা খালি পড়িয়া আছে। সুকুমারী তখন আর একটা খেলা পাইয়াছি মনে করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া—সবে দুই চারিটি দাঁত উঠিয়াছে—মার মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বোধ হয় বিষবড়ির স্বাদ মুখে কদর্য্য লাগিয়াছিল—কেন না কিছু পরে মেয়ে আপনি দাঁত ছাড়িয়া দিল, কল্যাণী বড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মেয়ে কাঁদিতে লাগিল।

বটিকা মাটীতে পড়িয়া রহিল। কল্যাণী নদী হইতে আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া মেয়ের মুখে দিলেন। অতি সকাতরে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু কি পেটে গেছে ?"

মন্দটাই আগে বাপ মার মনে আসে—যেখানে অধিক ভালবাসা সেইখানে ভয়ই

অধিক প্রবল। মহেন্দ্র কখন দেখেন নাই যে বড়িটা আগে কত বড় ছিল। এখন বড়িটা হাতে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় অনেকটা খাইয়াছে।"

কল্যাণীরও কাজেই সেই বিশ্বাস হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনিও বড়ি হাতে লইয়া নিরীক্ষণ করিলেন। এদিকে, মেয়ে যে দুই এক ঢোক গিলিয়াছিল, তাহারই গুণে কিছু বিকৃতাবস্থাপ্রাপ্ত হইল। কিছু ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল—কাঁদিতে লাগিল—শেষ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন কল্যাণী স্বামীকে বলিলেন, "আর দেখ কি? যে পথে দেবতায় ডাকিয়াছে, সেই পথে সুকুমারী চলিল—আমাকেও যাইতে হইবে।"

এই বলিয়া, কল্যাণী বিষের বড়ি মুখে ফেলিয়া দিয়া মুহূর্তমধ্যে গিলিয়া ফেলিলেন।

মহেন্দ্র রোদন করিয়া বলিলেন, "কি করিলে—কল্যাণি ও কি করিলে।"

কল্যাণী কিছু উত্তর না করিয়া স্বামীর পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন, "বলিলেন প্রভু, কথা কহিলে কথা বাড়িবে, আমি চলিলাম।"

"কল্যাণি কি করিলে" বলিয়া মহেন্দ্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অতি মৃদুস্বরে কল্যাণী বলিতে লাগিল, "আমি ভালই করিয়াছি। ছার স্ত্রীলোকের জন্য পাছে তুমি দেবতার কাজে অযত্ন কর। দেখ, আমি দেববাক্য লঙ্ঘন করিতেছিলেম—তাই আমার মেয়ে গেল। আর অবহেলা করিলে পাছে তুমিও যাও?"

মহেন্দ্র কাঁদিয়া বলিলেন, "তোমায় কোথাও রাখিয়া আসিতাম—আমাদের কাজ সিদ্ধ হইলে আবার তোমাকে লইয়া সুখী হইতাম। কল্যাণী, আমার সব! কেন তুমি এমন কাজ করিলে! যে হাতের জোরে আমি তরবার ধরিতাম, সেই হাতই ত কাটিলে! তুমি ছাড়া আমি কি!"

কল্যাণী। "কোথায় আমায় লইয়া যাইতে—স্থান কোথা আছে? মা, বাপ, বন্ধুবর্গ এই দারুণ দুঃসময়ে সকলি ত মরিয়াছে। কার ঘরে স্থান আছে, কোথায় যাইবার পথ আছে, কোথায় লইয়া যাইবে? আমি তোমার গলগ্রহ। আমি মরিলাম ভালই করিলাম। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সেই—সেই আলোকময় লোকে গিয়া আবার তোমার দেখা পাই।" এই বলিয়া কল্যাণী আবার স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিয়া মাথায় দিলেন। মহেন্দ্র কোন উত্তর না করিতে পারিয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন। কল্যাণী আবার বলিলেন,—অতি মৃদু অতি মধুর অতি স্নেহময় কণ্ঠ—আবার বলিলেন, "দেখ, দেবতার ইচ্ছা কার সাধ্য লঙ্ঘন করে। আমায় দেবতায় যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি মনে করিলে কি থাকিতে পারি—আপনি না মরিতাম ত অবশ্য

কেহ মারিত। আমি মরিয়া তাহাই করিলাম। তুমি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহা সিদ্ধ কর, পুণ্য হইবে। আমারও তাহাতে স্বর্গলাভ হইবে। দুইজনে একত্রে অনন্ত স্বর্গ ভোগ করিব।"

এদিকে বালিকাটি একবার দুধ তুলিয়া সামলাইল—তাহার পেটে বিষ যে অল্প পরিমাণে গিয়াছিল, তাহা মারাত্মক নহে। কিন্তু সে সময়ে সেদিকে মহেন্দ্রের মন ছিল না। তিনি কন্যাকে কল্যাণীর কোলে দিয়া উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অবিরত কাঁদিতে লাগিলেন। তখন যেন অরণ্যমধ্য হইতে মৃদু অথচ মেঘগম্ভীর শব্দ শুনা গেল।

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

কল্যাণীর তখন বিষ ধরিয়া আসিতেছিল, চেতনা কিছু অপহৃত হইতেছিল, তিনি মোহভরে শুনিলেন, যেন সেই বৈকুণ্ঠে শ্রুত অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিতে বাজিতেছে:—

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"

তখন কল্যাণী অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠে মোহভরে বলিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

আর বলিলেন, "প্রাণাধিক বল,

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।"

কাননবির্গত মধুর স্বর আর কল্যাণীর মধুস্বরে বিমুগ্ধ হইয়া কাতরচিত্তে ঈশ্বর মাত্র সহায় স্মরণ করিয়া মহেন্দ্রও ডাকিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন চারিদিক্ হইতে ধ্বনি হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন যেন গাছের পাখীরাও বলিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

নদীর কলকলেও যেন শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন মহেন্দ্র শোকতাপ ভুলিয়া গেলেন—উন্মত্ত হইয়া কল্যাণীর সহিত একতানে ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

কানন হইতেও যেন তাঁহাদের সঙ্গে একতানে শব্দ হইতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

কল্যাণীর কণ্ঠ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু ডাকিতেছেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন ক্রমে ক্রমে কণ্ঠ নিস্তব্ধ হইল, কল্যাণীর মুখে আর শব্দ নাই, চক্ষুঃ নিমিলিত হইল, অঙ্গ শীতল হইল, মহেন্দ্র বুঝিলেন যে, কল্যাণী "হরে মুরারে" ডাকিতে ডাকিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছেন। তখন পাগলের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কানন বিকম্পিত করিয়া, পশুপক্ষিগণকে চমকিত করিয়া মহেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

সেই সময়ে কে আসিয়া তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার সঙ্গে কোমল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল,

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে"

তখন সেই অনন্তের মহিমাময়, সেই অনন্ত অরণ্যমধ্যে, অনন্তপথগামিনীর শরীরসম্মুখে দুইজনে অনন্তের নাম গীত করিতে লাগিলেন। পশু পক্ষী নীরব, পৃথিবী অপূর্ব্ব শোভাময়ী—এই চরম গীতির উপযুক্ত মন্দির। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনার্য্য বাঙ্গালি জাতি।

বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। রাজমহল জেলার অন্তর্গত মালপাহাড়িয়া বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি আছে; তাহারা কোন আর্য্যভাষা কহে না। কিন্তু বাঙ্গালি-মালেরা বাঙ্গালা কথা কয় এবং বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। জেনেরল ক্যানিংহ্যাম প্রাচীন রোমীয়লেখক প্লিনি হইতে দুইটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তখনও মালেরা বলিয়া জাতি ভারতবর্ষে ছিল। পুরাণাদিতে মালদের প্রসঙ্গ ভূয়োভূয়ঃ দেখা যায় এবং মেঘদূতে মালবদিগের নাম উল্লেখ আছে। অতএব এখন যেমন মালজাতি আছে, প্রাচীন মালজাতিও সেইরূপ ছিল। কিন্তু প্লিনি যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, মালেরা আর্য্যজাতি হইতে একটি পৃথক্ জাতি ছিল। জেনারেল ক্যানিংহ্যাম বলেন, এই প্লিনির লিখিত মালেরা টলেমিপ্রণীত মণ্ডলজাতি। টলেমিলিখিত মণ্ডল জাতি আধুনিক মুণ্ড কোলজাতি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। বিভারলি সাহেব অনুমান করেন যে, ঐ প্লিনির লিখিত মালজাতি এখনকার বাঙ্গালি মাল।* এখন বাঙ্গালার বাহিরে যেখানে যেখানে মাল নাম পাই, সেইখানে সেইখানে

* **In his late work on the ancient Geography of India, General Cunningham quotes a passage from Pliny in which the *Malli* are mentioned, as occupying the country between the *Calingae* and the**

অনার্য্যদিগকেই দেখিতে পাই। কান্দু শের বিভাগের মাল বা মাল্লা বা নায়ক অতি অসভ্য অনার্য্যজাতির সে- নামিয়া বলে।* অনার্য্যপ্রধান মানভূম

Ganges. The passage is this ;— "*Gentes. Calingæ proximi mari, et supra mandei malli, quorum mons mallas, finisque ejus tractus est Ganges.*" In another passage we have, *ab iis (Palibothris) in interiore sita monedes et Suari quorum mons maleus*, and putting the two passages together, General Cunningham thinks, "it highly probable that both names may be intended for the celebrated Mount Mandar, to the south of Bhaugulpore, which is fabled to have been used by the Gods and demons at the churning of the ocean." The *Mandei* General Cunningham identifes "with the inhabitants of the Mahanadi river, which is the *Manada* of Ptolemy." "The Malli or Malei would therefore be the same people as Ptolemy's Mandalæ, who occupied the right bank of the Ganges to the south of Palibothra -" the Mandalæ or Mandali having been already identified with the Monedes and the modern Munda Kols. "Or" adds General Cunningham "they may be the people of the Rajmahal Hills who are called Maler, which would appear to be derived from the Canarese Male and the Tamil Malei, a "hill." It would, therefore, be equivalent to the Hindu Pahari or Parbatiya a "hillman." Putting this last suggestion aside for the present, it seems to me that there is some little confusion in the attempt to identify both the Monedes and the Malli with the Mundas If the Mandei and the Malli are distinct nations—and it will be observed that both are mentioned in the same passage—the former rather than the latter would seem to correspond with the *Monedes* or Mundas. The *Malli* would then correspond rather to the Suari "*Quorum Mons Maleas*"—the hills bounded by the Ganges at Rajmahal. They may therefore be the same as the Mals. In other words, the Mals—the words Maler or Malhar seem to be merely a plural form—may possibly be a branch of the great Sauriyan family to which the Rajmahal Paharias, the Oraons and the Sabars all belong, and which Colonel Dalton would describe as Dravidian. Fifteen hundred two thousand years ago this people may have occupied the whole of Western Bengal." *Bengal Census Report* 1871. P 184-185. কথাগুলি বড় বুঝিতে পারিলাম না—কৌতুহলী পাঠকের নিকট উপহার দিবার মানসেই ইহা উদ্ধৃত করিয়াছি।

* Dalton—P 299.

প্রদেশকে মালভূম বা মল্লভূমি বলে। রাজমহলের দ্রাবিড়বংশীয় অনার্য্য পাহাড়িয়াগকে মালের জাতি বলে। উড়িষ্যার কিঁউঝড় নামক আরণ্য রাজ্যে ভুঁইয়া নামক এক অনার্য্যজাতি আছে, তাহাদের একটি থাকের নাম মালভুঁইয়া।* বুকানন হ্যামিল্টন ভাগলপুর জেলার ভিতরে বন্যজাতির মধ্যে মালের বলিয়া একটি অনার্য্যজাতি দেখিয়াছিলেন। কাঁধদিগের মালিয়া বলিয়া একটিজাতি আছে।† রাজমহলীয় মাল পাহাড়িদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে আর্য্যদিগের মধ্যে মল্ল শব্দ আছে—অনেকে বলেন, এই মালেরা আর্য্য মল্ল। আর্য্য মল্ল হইতে মালজাতির উৎপত্তি ? না অনার্য্যমল্লগণ বাহুযুদ্ধে কুশলী বলিয়া আর্য্যভাষায় বাহুযোদ্ধার নাম মল্ল হইয়াছে ? মালেরা যে অনার্য্যজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা একপ্রকার স্থির বলা যাইতে পারে।

সাঁওতালদিগের পাহাড়মধ্যে ডম নামে একটি অনার্য্যজাতি আছে। তাহাদিগের হইতে বাঙ্গালার ডোমজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, হণ্টর সাহেব এমন অনুমান করেন।‡ ইহা সত্য বটে যে অন্যান্য নীচ হিন্দুজাতির ন্যায় ডোমেরা ব্রাহ্মণদিগের পৌরোহিত্য গ্রহণ করে না। তাহাদিগের পৃথক্ ধর্ম্মযাজক আছে। ঐ ধর্ম্মযাজকদিগের নাম পণ্ডিত। এইরূপ ডোমের পণ্ডিত আমি স্বয়ং অনেক দেখিয়াছি। নেপালের নিকটে ডুমী নামে এক অনার্য্যজাতি অদ্যাপি বাস করে।¶

হণ্টর সাহেব দেখাইয়াছেন যে, অনেক অনার্য্যজাতির নাম অনার্য্যভাষার মনুষ্যবাচক শব্দবিশেষ হইতে হইয়াছে; হো শব্দ ইহার পূর্ব্বে উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে। সাঁওতালী ভাষায় হাড় শব্দে মনুষ্য। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, হাড়ি অনার্য্যবংশ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ককেশীয় ও মোঙ্গলীয় ভিন্ন আরও অনেক মনুষ্যজাতি আছে, তাহার মধ্যে কোন কোন জাতি স্বভাবতঃই অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার নিগ্রোরা ইহার উদাহরণ। কেবল রৌদ্রের উত্তাপে তাহারা এত কৃষ্ণবর্ণ এমত নহে, যেমন উষ্ণপ্রদেশে কাফ্রির বাস আছে, তেমনি উষ্ণদেশে গৌরবর্ণ আর্য্য বা মঙ্গলের বাস আছে। আমেরিকার যে প্রদেশে ইণ্ডিয়ানদিগের বর্ণ লোহিত সেই প্রদেশেই স্যাক্সনবংশীয়-

* Dalton P 145.
† Dalton P 293.
‡ Non-Aryan Dictionary P 29.
¶ Non-Aryan Dictionary P 29.

দিগের বর্ণ গৌর; তিনসহস্র বৎসরেও কিছুমাত্র কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে এক প্রদেশেই শ্যামবর্ণ আর্য্যেরা এবং মসীবর্ণ অনার্য্যেরা একত্র বাস করিতেছে। রৌদ্রসন্তাপে কতকদূর কৃষ্ণতা জন্মিতে পারে বটে। ভারতীয় আর্য্যদের তাহার কিছু দূর জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ গৌর, কেহ শ্যামল, কিন্তু বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকটবাসী কতকগুলি অনার্য্যজাতি একেবারে মসীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের বর্ণনা আছে। কথিত আছে যে, বেন রাজার উরুদেশ হইতে দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় খর্ব্বকায় অট্টাস্য এক পুরুষ জন্মে। এই বর্ণনায় মহাভারতের খর্ব্বাকৃত অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্য্যদিগকে পাওয়া যায়। ঐ পুরুষ নিষাদ নামে সংজ্ঞাত হইয়াছে।* ইহারই বংশে নিষাদাখ্য অনার্য্যজাতির উৎপত্তি।† হরিবংশে বেনের উপাখ্যানে ঐরূপ লিখিত হইয়া ঐ পুরুষকে নিষাদ ও ধীবরজাতির আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা আছে।‡ মনু বলিয়াছেন যে, অযোগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষাদের ঔরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত্ত বলে।¶ অমরকোষাভিধানে কৈবর্ত্তদিগের নাম "কৈবর্ত্ত দাস ধীবর।" পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য্যজাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর, কৈবর্ত্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য্য হইল, তবে কৈবর্ত্তও অনার্য্যজাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্ত্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত্ত। শেষোক্ত সকলেই মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত্ত। অপরাপর ঐরূপ কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষা-ধোপা বলিয়া পৃথক্ জাতি হইয়াছে।

পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র নামে অনার্য্যজাতির উল্লেখ মন্বাদিতে পাওয়া যায়। মনু লিখিয়াছেন যে পৌণ্ড্রক প্রভৃতি জাতি

* কিং করোমীতি তান্ সর্ব্বান্ বিপ্রান্ আহ স চাতুরঃ
নিষীদেতি তমূচুস্তে নিষাদস্তেন সোঽভবৎ।

† তেন দ্বারেণ নিষ্ক্রান্তং তৎপাপং তস্য ভূপতেঃ
নিষাদাস্তে তথা জাতা বেনকল্মষসম্ভবাঃ।

‡ নিষাদবংশকর্ত্তাসৌ বভূব বদতাং বরঃ
ধীবরানসৃজচ্চাপি বেনকল্মষসম্ভবান্।

¶ নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনং
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।

মনু দশম অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক

ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্রকদিগের সঙ্গে আর যে সকল জাতি গণনা করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে যবন ও পহ্লব ভারতবর্ষের বাহিরে। ভিতরের সকলগুলিই অনার্য্য যথা—

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদা খসাঃ

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে "অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরা পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি।" মহাভারতেও এই পুণ্ড্রদিগের কথা আছে। সভাপর্ব্বে আছে যে ভীম দিগ্বিজয়ে আসিয়া পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব এবং কৌশিকি কচ্ছবাসী মহৌজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গ আধুনিক বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগকে বলিত। এখনও সাধারণ লোকে সেই প্রদেশকেই বঙ্গদেশ বলে। ভীম পশ্চিম হইতে আসিয়া যে দেশ জয় করিয়া বাঙ্গালার পূর্ব্বভাগে প্রবেশ করিলেন, সে দেশ অবশ্য বাঙ্গালার পশ্চিমভাগে। উইলসন সাহেবও স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণানুবাদে ভারতবর্ষের ভৌগোলিকতত্ত্ব নিরূপণকালে বাঙ্গালার পশ্চিমাংশেই পুণ্ড্রজাতিকেই সংস্থাপন করিয়াছেন।*

* "*Pundras* the western Provinces of Bengal, or as sometimes used in a more comprehensive sense, it includes the following district : Rajshahi Dinagepore, and Rungpoor ; Nadiya, Beerbhoom, Burdwan, part of Midnapoor, and the Jungle Mehals ; Ramghur, Pacheti, Palamow, and part of Chunar. See an account of Pundra translated from what is said to be part of the Brahmanda Section of the Bhavishyat Purana in the quarterly Oriental Magazine, Decr 1824." *Wilson's Vishnu Puranas.*

আমাদিগের প্রিয়বন্ধু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভবিষ্যপুরাণখানি সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন (ভবিষ্যপুরাণ ভবিষ্যৎ পুরাণ নহে; ব্রহ্মখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড খণ্ড নহে; এ গুলি ছোট ছোট সাহেবী ভুল) উহার এক কাপি সংস্কৃত কলেজে আছে। পুঁথিখানি খণ্ডিত, আসাম মণিপুর হইতে আরম্ভ করিয়া কাশী পর্য্যন্ত সমস্ত দেশের বিশেষ বিবরণ উহাতে দেওয়া আছে। কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িয়া ভক্তি হয় না। গ্রন্থখানিতে বিদ্যাসুন্দরের গল্প আছে। মানসিংহ কর্ত্তৃক যশোরের আক্রমণ বর্ণিত আছে। যবনাধিকারের চারিশত বৎসর পরে চম্পারণের ও নেপালের রাজার যে যুদ্ধ হয় তাহার বর্ণনা আছে। বিশেষ গ্রন্থকারের বঙ্গদেশ মধ্যে আসাম, চট্টল এবং মণিপুর পর্য্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এত দূর ত গ্রন্থের পরিচয় গেল। তাহাতে আছে যে পৌণ্ড্রদেশ সাত ভাগে বিভক্ত। গৌড়দেশ, বারেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্দ্ধমান, নারীখণ্ড ও বিন্ধ্য-

তার পর খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়েন্থ-সাঙ নামক চীনপরিব্রাজক এ প্রদেশে আসিয়া পুণ্ড্রদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেখিয়া গিয়াছেন। জেনারেল কানিংহাম সাহেব ঐ চীনপরিব্রাজকের লিখিত দিক্ ও দূরতা লইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায় ছিল তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি কিছু ইতস্ততঃ করিয়া আধুনিক পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পাবনা না হইয়া বাঙ্গালার প্রাচীন রাজধানী মালদহ জেলায় অন্তর্গত ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী পাণ্ডুয়া বলিলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে অধিক সংস্থান ঘটিত। তার পর দশকুমার চরিতে লেখা আছে, "অনুজায় বিষাণবর্ম্মণে দণ্ডচক্রং চ পুণ্ড্রাভিযোগায় বিসৃষ্টবান্।" অর্থাৎ পুণ্ড্র দেশ আক্রমণের জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষাণবর্ম্মাকে দণ্ডচক্র অর্থাৎ সৈন্যাদি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি।* দশকুমারচরিত আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থ। উপরিলিখিত উক্তি কদাচিৎ মৈথিলরাজার উক্তি, অতএব দশকুমার যখন প্রণীত হয় তখনও পুণ্ড্র মিথিলার নিকটবাসী।

পার্শ্ব। এই সকল দেশের লোক দুষ্ট, চোর, পরদাররনিরত ইত্যাদি ইত্যাদি। গৌড়দেশের প্রধান নগরসমূহের মধ্যে মৌরশিদাবাদ (মুরশিদাবাদ নামের সংস্কৃত করণ, মুরশিদাবাদ নাম ১৭০৪ সালে হয়, তাহার আগে উহাকে মুকশুদাবাদ বলিত বলিয়া ষ্টুয়ার্ট হিষ্টরি অফ বেঙ্গলে উক্ত আছে) সুতরাং গ্রন্থখানি ১৫০ বৎসরের মধ্যে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। গৌড়দেশে গৌড়নগরের উল্লেখ নাই। পাণ্ডুয়ারও উল্লেখ নাই। বরেন্দ্রভূমির প্রধান নগর পুটিয়া নাটোর চপলা (যেখানকার রাজা ব্রাহ্মণ) কাকমারী। নীবৃতদেশের প্রধান নগর কচ্ছপ নগর শ্রীরঙ্গপুর ও বিহার। রঙ্গপুরে বাগদী রাজা। নারীখণ্ডের প্রধান নগর বৈদ্যনাথ, দেবগড় করা সোণামুখী ইত্যাদি। বরাভূমের প্রধান নগর রঘুনাথপুর ধবল ইত্যাদি। বর্দ্ধমানের প্রধান নগর বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, মায়াপুর, কৃষ্ণনগর ইত্যাদি। বিন্ধ্যপার্শ্বে প্রধান নগর সুদর্শন পুষ্পগ্রাম ও বদরী কুরুক গ্রাম। এই সকল দেশের আচার ব্যবহার ও চতুঃসীমা আছে। আমাদের যতদূর মানচিত্র বোধ আছে তাহাতে বোধ হয় চতুঃসীমা অনেক মিলিবে না। গৌড়দেশের উত্তরে পদ্মানদী ও দক্ষিণে বর্দ্ধমান। আসল গৌড়নগর ইহার মধ্যে পড়িল না।

উইলসন সাহেব ঐ স্থলে আরও লিখিয়াছেন যে, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোকে পুণ্ড্র দাক্ষিণাত্যে স্থাপিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্লোকটী আমরা উদ্ধৃত করিতেছি,

নদীং গোদাবরীং চৈব সর্ব্বমেবানুপশ্যতঃ
তথৈব বাঙ্গাংশ্চ পুণ্ড্রাংশ্চ চোলান্ পাণ্ড্যাংশ্চ কেরলান্।

* দশকুমার চরিত তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ ইতিহাস স্মৃতি এ সকলের সময় হইতে অর্থাৎ অতি পূর্ব্বকাল হইতে দশকুমার ও হিয়েঙ্গসাঙের সময় হইতে পর্য্যন্ত পুণ্ড্র নামে প্রবল জাতি বাঙ্গালায় পশ্চিমাংশে বাস করিত। এক্ষণে বাঙ্গালায় বা বাঙ্গালার নিকট বা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে পুণ্ড্র নামে কোন জাতি নাই। এই পুণ্ড্র জাতি তবে কোথায় গেল।

সংস্কৃত শব্দে "ণ্ড" থাকিলে বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষায় ডকার, ড়কার হইয়া যায়। আর ণকার লুপ্ত হইয়া পূর্ব্ববর্ত্তী হলবর্ণে চন্দ্রবিন্দুরূপে পরিণত হয়। যথা ভাণ্ডের স্থলে ভাঁড়, ষণ্ডের স্থলে ষাঁড়, শুণ্ডের স্থলে শুঁড়। আর সংস্কৃত হইতে অপভ্রংশপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালাদিতে পরিণত হইতে গেলে শব্দের রকারাদির সংযোগের লোপ হয় যথা—তাম্র স্থলে তামা, আম্র স্থলে আম ইত্যাদি। অতএব পুণ্ড্র শব্দ লৌকিক ভাষায় চলিত হইলে প্রথমে রেফ লুপ্ত করিয়া পুণ্ড শব্দে পরিণত হইবে। তার পর যেমন ভাণ্ড স্থলে ভাঁড় হয়, শুণ্ড স্থলে শুঁড় হয় তেমনি পুণ্ড স্থলে পুঁড় বা পুঁড়ো হইবে। পুঁড়ো বাঙ্গালায় একটি সংখ্যায় প্রধান জাতি।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ও মনুতে পুণ্ড্র অনার্য্যজাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব পুঁড়ো আর একটি অনার্য্য বংশোদ্ভূত বাঙ্গালিজাতি।

শব্দের অপভ্রংশ একপ্রকার হয় না। প্রাচীন ভাষায় কোন শব্দ ভাষান্তরে অপভ্রষ্ট হইয়া প্রবেশ করিলে দুই তিন রূপ ধারণ করে। এক সংস্কৃত স্থান শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় কোথাও থান কোথাও ঠাঁই। চন্দ্র শব্দ কখন চন্দর কখন চাঁদ। যেমন চন্দ্র শব্দ বাঙ্গালির উচ্চারণে চন্দর হয়, ভদ্র শব্দ ভদ্দর হয়, তন্ত্র শব্দ তন্তর হয়, তেমনি পুণ্ড্র শব্দ স্থান বিশেষে পুণ্ডর হইবে। জাতিবাচক অর্থে কখন কখন বাঙ্গালিরা শব্দের পরে একটা ঈকার বেশীর ভাগ যোগ করিয়া দিয়া থাকে; যেমন সাঁওতাল, সাঁওতালী, গয়াল গয়ালী, দেশওয়ালি হইতে দেশওয়ালী। এইরূপ ঈকার যোগে পুণ্ড্র শব্দ পুণ্ডর হইয়া পুণ্ডরীতে পরিণত হয়। পুণ্ডরী বলিয়া একটি বহুসংখ্যক বাঙ্গালি জাতি আছে, পুণ্ড্রুরা এবং পুঁড়োরা যদি অনার্য্য তবে পুণ্ডরীরাও অনার্য্যজাতি।

পুণ্ডরী হইতে পুণ্ডরীক অধিক দূর নহে। অনেক ইতরলোকে লম্বা লম্বা সাধুভাষা ভালবাসে এবং সহজেই মনে করে যে যদি জাতির নাম দীর্ঘসমাসযুক্ত সংস্কৃত শব্দে বলা যায়, তাহা হইলে জাতির বড় গৌরব বৃদ্ধি হয়। ইতরলোকদের বুদ্ধিতে যত আসুক না আসুক, যাজকেরা মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার কাজ গুছাইতে কোন কালেই

পরাঙ্মুখ নহে। অতএব কতকগুলি পুণ্ডরী ক্রমে পুণ্ডরীক শেষ পুণ্ডরীকাক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। সন ১৮৭১ সালের সেন্সস্ রিপোর্টে আটাশ হাজার বাঙ্গালি পুণ্ডরীকাক্ষ জাতি বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। এ আর একটি সাহেবী ভুল। বাস্তবিক পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া কোন একটা পৃথক্ জাতি নাই। পোদেরাই আপনাদিগকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

দক্ষিণ অঞ্চলে শত শত পোদের সঙ্গে স্বয়ং কথোপকথন করিয়া এ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। যখন কোন পোদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি তুমি কি জাতি সে তখনই প্রায় প্রথমে সংস্কৃত আড়ম্বরে জাতিগৌরব বাড়াইবার জন্য বলিয়াছে "আজ্ঞে আমি পুণ্ডরীকাক্ষ।" তার পর যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে পুণ্ডরীকাক্ষ কি জাতি বুঝিতে পারিলাম না। তখন প্রায় সে উত্তর করিয়াছে আমরা পোদ। বাস্তবিক পোদ শব্দ পুণ্ড্র শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে। এবং পুণ্ড্র শব্দ হইতেই পোদ নাম জন্মিয়াছে ইহা আমার বিশ্বাস হয়।

যে সকল কথা বলা গেল, তাহাতে বোধ হয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকিবে যে, পুঁড়ো পুণ্ডরী পুণ্ডরীকাক্ষ এবং পোদ চারিটী আদৌ এক জাতি এবং চারিটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্রজাতির সন্তান। পুণ্ড্রেরা অনার্য্যজাতি ছিল, অতএব বাঙ্গালি সমাজের ভিতর আর চারিটী অনার্য্য জাতি পাওয়া যাইতেছে।

অলঙ্কারশাস্ত্র।

অলঙ্কারশাস্ত্র কাহাকে বলে, আমি আজ সেইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম শুনিলে ইংরেজি-ওয়ালার আপাদমস্তক জলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে, অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আলঙ্কারিকেরা যে অর্থে রসশব্দ ব্যবহার করেন, সাধারণলোকে সে অর্থে ব্যবহার করেন না। সুতরাং লোকের যে সংস্কার অলঙ্কার পড়িলে ইয়ার হওয়া যায় তাহা ভুল। ইংরেজিওয়ালারা অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর চটা কেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। এককালে ইউরোপে অলঙ্কারশাস্ত্রের বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল। তথায় শিশিরো হ্যাপ্রেবক্তা ছিলেন,

লোন্‌জাইনস্‌ গুরু ছিলেন। কিন্তু সে অলঙ্কারপাঠে লোকে কেবল বর্ণবিন্যাস করিতে শিখিতমাত্র, আর কোনরূপ ফল দর্শিত না। যখন পদার্থবিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইল, তখন লোকে অলঙ্কারশাস্ত্র অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিল। যিনি পদার্থবিদ্যার প্রথম পথ দেখান, তিনি অর্থাৎ লর্ড বেকন আলঙ্কারিকদিগের প্রতি অত্যন্ত চটা ছিলেন। সুতরাং লর্ড বেকনের বাঙ্গালি শিষ্য প্রশিষ্য বৃদ্ধপ্রশিষ্যগণও অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর চটিয়াছেন। কিন্তু বেকন অলঙ্কারশাস্ত্রের উপযোগিতা মানিতেন, যিনি কেবলমাত্র ঐ শাস্ত্রের আলোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতেন বেকন কেবল তাঁহার উপরই চটা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ অলঙ্কারশাস্ত্র সাপ কি বেঙ, কিছুমাত্র না দেখিয়া, অলঙ্কারশাস্ত্রের নামশ্রবণমাত্রেই কাণে আঙ্গুল দেন। সংস্কৃত ইংরেজিওয়ালারা বলেন, অলঙ্কারশাস্ত্রে রসবোধ না হইয়া কেবল কতকগুলা নীরস বাগাড়ম্বর শিক্ষা হয় মাত্র; কতকগুলা অলঙ্কার, কতগুলা দোষের নাম, কতকগুলা কাব্যভেদের নাম মুখস্থ করিয়া মরিতে হয় মাত্র এবং ঐ কবিতার শব্দ শক্ত্যুত্থ বস্তুধ্বনি কবিউক্তিতে অলঙ্কারধ্বনি কাব্যলিঙ্গ ভাবিক পরিসংখ্যা উদাত্ত অথবা ইহার সংসৃষ্টি অথবা অঙ্গাঙ্গীভাব সঙ্কর এই লইয়া বৃথা দন্তকচ্‌কচি হয় মাত্র। আসল যাহাতে রুচির পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জন হয় তাহা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে হয় না।

আমরা বলি যদি তাহা না হয় তবে ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ নহে, অলঙ্কার শিক্ষার দোষ। সময়ে সময়ে অলঙ্কারগ্রন্থেরও দোষ, অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ, শুদ্ধ যে রুচিপরিবর্ত্তনই অলঙ্কার শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ নহে। উহা পদার্থবিদ্যাদির ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।

শব্দশাস্ত্র মোটামুটি ধরিতে গেলে, তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, নিরুক্ত, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার। যাহাদ্বারা শব্দগুলি কিরূপ ব্যুৎপত্তি হয়, তাহার প্রণালী অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম নিরুক্ত; যাহাদ্বারা শব্দসমূহ, বাক্যমধ্যে কিরূপে নিবেশিত হয়, তাহার প্রণালী জানা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ। এবং এই সকল বাক্য পরস্পর যোজনা করিয়া বক্তৃতা করিবার, গ্রন্থ লিখিবার এবং প্রবন্ধাদি লিখিবার প্রণালী যাহাদ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহার নাম অলঙ্কার। সুতরাং ব্যাকরণাদি যেরূপ উপযোগী অলঙ্কারও সেইরূপ। অনেকে বলিবেন অলঙ্কার না পড়িয়া কি বক্তৃতা করা যায় না, না গ্রন্থ লেখা যায় না, না সকল গ্রন্থকারই আলঙ্কারিক। যদি না হয় তবে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? আমরা বলি ব্যাকরণ না পড়িলেই কি কথক হওয়া যায় না, না বাক্য রচনা করা যায় না ন্যায়শাস্ত্র না পড়িলে কি

তর্ক করা যায় না, না তর্কশক্তির উদ্ভাবন হয় না, তবে কি ব্যাকরণ ও ন্যায় কাহারোই না। উহা কি অপাঠ্য মধ্যে গণ্য হইবে, তাহা নহে। অলঙ্কারশাস্ত্রের এমত উদ্দেশ্য নহে যে, উহাতে লোককে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, উহাতে কেবল বক্তাকে বিশুদ্ধ প্রণালী দেখাইয়া দেয় মাত্র। যেমন ব্যাকরণ পাঠে অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া দেয় এবং শুদ্ধ শব্দপ্রয়োগের উপায় দেখাইয়া দেয়, যেমন ন্যায়শাস্ত্র তর্ক করিবার সূত্রাদি শিখাইয়া দেয় এবং তর্কদোষ ধরিবার উপায় দেখাইয়া দেয়, সেইরূপ অলঙ্কারেও বক্তৃতার উৎকৃষ্ট প্রণালীও দেখাইয়া দেয়। অলঙ্কারশাস্ত্র পড়িলে অবক্তা বক্তা হইতে পারেন না, অকবি কবি হইতে পারেন না। কিন্তু কবি যদি অলঙ্কার শিখে তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, ও বক্তা যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হইতে পারে। স্বভাব যাহা দেন নাই তাহা শাস্ত্রপাঠে কখন জন্মে না; সঙ্গীত শাস্ত্রে সুপটু লোক যেমন কোথায় তাললয়বিরোধ দেখিলে চটিয়া যান, সেইরূপ অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও কাব্যে বা বক্তৃতায় সুরুচিবিরুদ্ধ কোন দোষ দেখিলেই চটিয়া যান। অলঙ্কার পাঠে অরসিক লোক রসিক হয় না; রসিকতাও স্বভাবপ্রদত্ত।

সমাজে যাহা সুরুচি বলিয়া পরিচিত অলঙ্কার পড়িলে লোক তাহা অবগত হন। যেমন একখানি চিত্র দেখিলেই লোকে খুসি হয়, অথবা অখুসি হয়, কিন্তু কেন খুসি বা অখুসি হইল তাহা বলিয়া দিবার জন্য একজন বিচারক চাই, সেইরূপ কোন গ্রন্থ পড়িয়া কেহ খুসি হয় কেহ অখুসি হয়; কিন্তু কেন যে ওরূপ হইল তাহা সকলে আপনি বুঝিতে পারে না। যে খুসি অখুসির প্রকৃত হেতু বলিয়া দিতে পারে সেই ব্যক্তির অলঙ্কারশাস্ত্র পাঠের ফল হইয়াছে, তিনি সামাজিক কিন্তু আলঙ্কারিক সামাজিক হইতেও উচ্চতর, তিনি সামাজিকদিগের উচ্চতর রুচির পথ দেখাইয়া দেন।

আলঙ্কারিকের কার্য্য অতি গুরুতর। তাঁহাকে সামাজিকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; কবির রুচিসংস্কার করিতে হয়; লোকের রুচিসংস্কার করিতে হয়; সেই সঙ্গে অভিনয় কারীদিগেরও রুচিসংস্কার করিতে হয়। আলঙ্কারিক রুচিশাস্ত্রের কিলাজকার, রুচি কোন পথে যাইবে, কোনটী সৎরুচি, কোনটী কুরুচি এই সমস্ত তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হয়। যদি সত্য বটে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।" প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু মূল নিয়মের অনভিজ্ঞতা হেতু ভিন্নতা জন্মে। সেই মূল নিয়মের প্রদর্শক আলঙ্কারিক।

নৃত্য গীতাদি দেখিবার, সুদৃশ্য দ্রব্য দেখিবার, উত্তম কবিতা শুনিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, যে মনোবৃত্তি থাকা প্রযুক্ত

এই সকল প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম রুচি। রুচি শব্দটী বোধ হয় ঠিক ব্যবহার হয় নাই, উহার ইংরেজি নাম Esthetic faculty। মনুষ্যমাত্রেরই এই মনোবৃত্তি আছে, কিন্তু অসভ্যদেশে ইহার সুবিকাশ হয় না, অত্যন্ত সভ্যদেশে সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্র ইহার পুষ্টিসাধন শিক্ষার এক অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করেন। সে পুষ্টিসাধন কিরূপ হইবে।

অনেকে থিয়েটার দেখিতে গিয়াছি বা যাত্রা শুনিতে গিয়াছি, যাত্রাওয়ালার বা থিয়েটারওয়ালার উদ্দেশ্য পয়সা, লোককে হাসাইয়া বা কাঁদাইয়া, তাহাদিগকে আমোদ দিয়া, কিছু অর্থসংগ্রহ করা। সুতরাং অধিক লোকে যাহা ভাল বাসে তাহারা সেইরূপ যাত্রা বা অভিনয় করিবে। যিনি কবি তিনি অর্থকাম হউন আর না হউন, অনেকে যাহা ভালবাসিবে তিনিও তাহাই লিখিবেন। যদি এইরূপ চলিয়া যায় তাহা হইলে ক্রমে সে যাত্রা বা অভিনয় জঘন্য হইয়া উঠিবে; কারণ যাহাতে দুই একটি কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা হয় সাধারণ লোকে সেই সকল জিনিষ দেখিতে ভাল বাসে। যদি দর্শকবৃন্দের মধ্যে বহুসংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক না থাকেন তাহা হইলে নাটকাদি এই সকল উত্তেজক বস্তুতে পরিপূর্ণ হয়। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যাত্রা কবি যে অতি জঘন্য হইয়াছিল, এবং এখনও যে আমাদিগের রঙ্গভূমি সকল আরও জঘন্য হইয়া উঠিয়াছে তাহারও এই মাত্র কারণ যে দর্শকগণের মধ্যে সুরুচিসম্পন্ন লোক অতি বিরল। ইংলণ্ডে সেক্‌সপিয়ারের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের রঙ্গভূমিরও অবস্থা এইরূপ শোচনীয় ছিল, তখন থিয়েটারে এমত চীৎকার হইত, যে এক মাইল পর্য্যন্ত লোক ঘুমাইতে পারিত না, গোল মাল, মার ধোর, রক্তারক্তি হইত, সময়ে সময়ে দর্শকবৃন্দ তাহাতে যোগ দিয়া মহা আমোদ করিয়া উঠিতেন, ক্রমে সুরুচিসম্পন্ন লোক থিয়েটারে যত যোগ দিতে লাগিলেন, ততই ঐ সকল গোলমাল কমিয়া আসিল। পরে যখন সেক্‌সপিয়ার, বেন্‌ জন্‌সন্‌ প্রভৃতি মহাকবিগণ রুচিবিষয়ে টেক্কা দিতে লাগিলেন, তখনই ইংলণ্ডীয় নাটকের সমুন্নতি লাভ হইতে লাগিল। অতএব দেশের মধ্যে বহুসংখ্যক সুরুচিসম্পন্ন লোক থাকা আবশ্যক, কিন্তু যদি সামান্য লোক থাকা পর্য্যন্তই হয়, এবং আলঙ্কারিক লোক না থাকে, তাহা হইলে কাব্যাদি একঘেয়ে মারিয়া যায়; রুচির পরিবর্ত্তন হয় না সুতরাং সকলেই একরুচির অনুসরণ করে। এই সময়ে অলঙ্কারের কারিকা প্রস্তুত হয়, ঐ কারিকা মতে কাব্যলেখা আরম্ভ হয়, কবিপ্রতিভা সম্যক স্ফূর্ত্তি হয় না। কালিদাসের পর ভারতবর্ষীয় রঙ্গভূমির এই দশা হইয়াছিল। অতএব দেশের মধ্যে, শুদ্ধ সামাজিক থাকিলেই রুচিনামক মনোবৃত্তির

সম্যক্ পরিচালনা হয় না, উহার জন্য আলঙ্কারিক চাহি। নূতন নূতন স্থরুচি-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে পারেন এরূপ লোক চাই, চলিত কাব্যগ্রন্থ সকল হইতে নূতন নূতন ভাব সংকলন করিতে পারে এরূপ লোক চাই, কবিদিগের মত নূতন নূতন পদার্থ মনোনীত করিতে পারেন এরূপ লোক চাই। যিনি তাহা পারেন তিনি যথার্থ আলঙ্কারিক। কারিকা পড়িয়া আলঙ্কারিক হয় না। কারিকা যে সময়ে লিখিত হয় উহা সেই সময়ের পক্ষে খাটে, পরবর্ত্তিসময়ের লোক যদি সেই কারিকা সকলের অনুরূপ করে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের অধোগতি হয়। পরবর্ত্তিসময়ের লোক যদি ঐ কারিকার পরিবর্ত্ত ও উন্নতিসাধন করিতে পারে তাহা হইলে কাব্যশাস্ত্রের উন্নতি হয়। কারিকায় ঐতিহাসিকজ্ঞান হয় উহাতে রুচি সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ হয় না। উহাতে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে অমুক সময়ে রুচির অবস্থা এইরূপ ছিল।

মাধবীলতা।

৩৩

জনার্দ্দন শর্ম্মা সম্বন্ধে লিতম পাগলা যাহা বলিয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। ভিক্ষার ছলে সন্ধ্যার সময় জনার্দ্দন এক গৃহস্থের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইল, ভিক্ষা চাহিল না, কাহাকেও ডাকিল না, কেবল অলক্ষ্যে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল; শেষ যাহা অনুসন্ধান করিতেছিল, তাহা দেখিয়া চলিয়া গেল। সেই বাটীতে মাধবীর মা বাস করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এক পুষ্করিণী-কূলে দাঁড়াইয়া একদিন মাধবীর মা দেওয়ানমহাশয়ের পাল্কী যাইতে দেখিয়াছিল, সে পুষ্করিণী এই বাটীর পশ্চিমাংশে। মাধবীর মা এই বাটীতে কুটুম্বের কন্যা বলিয়া রক্ষিতা; তাহার বিধবা মাতৃস্বসা তাহাকে অতি যত্নে রাখিয়াছিলেন।

জনার্দ্দন সন্ন্যাসী বড় অধিক দূর চলিয়া গেলেন না, সেই বাটীর সম্মুখে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিলেন, তথায় রাত্রিযাপন করিবেন বলিয়া ধুনির কাঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু রাত্রি প্রহরেক অতীত হইল, তথাপি ধুনি আর জ্বলিল না।

মাধবীর মা তৎকালে মাধবীকে লইয়া বসিয়াছিল; মাধবীর বড় জ্বর, পাড়ার গৃহিণীরা সকলে ভয় পাইয়াছিল;

অনেকে আপনারা বসিয়া থেকে ঠাকুরের চরণামৃত খাওয়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে জ্বরের লাঘব হয় নাই। "কালমেঘ" খাওয়ান হইয়াছে তথাপি কোন উপকার হয় নাই। মাধবীর মা নিরুপায় হইয়া এক একবার কাতর-নয়নে মাসীর মুখ প্রতি চাহিতেছিল।

মাসী মালা জপ করিতেছিলেন, আর এক একবার বলিতেছিলেন "ভয় নাই; কালী রক্ষা করিবেন।" রাত্রি ক্রমে দুই প্রহর হইল; শৃগালেরা একযোগে ডাকিয়া উঠিল, মাধবীর মা শিহরিয়া মাধবীকে ক্রোড়ে তুলিল, মাধবী অঘোর অভিভূত যেন নিদ্রিত; চক্ষু মুদিত ছিল, হঠাৎ একবার চক্ষু খুলিয়া গেল, খুলিয়া বড় হইল, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টি নাই, চক্ষু আরও বড় হইল। মা মুখ ফিরাইল। মালা ফেলিয়া বৃদ্ধা নিকটে আসিয়া বসিল। "কালি রক্ষা কর" বলিয়া, মাধবীর মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিল।

এই সময় বাটীর বহির্ভাগে গোলযোগ হইতেছিল। মাধবীর মা তাহা কিছুই শুনিতে পান নাই, বৃদ্ধাও তাহা জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সদর বাটীতে আগুন লাগিয়াছিল, যে লাগাইয়াছিল, সে নিদ্রার ছলে অশ্বত্থমূলে শয়ন করিয়া আছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, প্রথমে গৃহকপোতেরা জাগিয়া উঠিল, আলোকে আহ্লাদে তাহারা ফিরিয়া ঘুরিয়া নাচিয়া গর্জ্জিতে লাগিল, তাহার পর উড়িয়া প্রতিবাসীদের আলিসায় গিয়া সারি সারি বসিতে লাগিল; অগ্নির আলোকে তাহাদের শ্বেত শরীর ঈষৎ রক্তাক্ত দেখাইতে লাগিল। কেবল একটি কপোতী উড়িল না, নীড়ে বসিয়া সভয়ে গলা বাড়াইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল, তাহার নীড়ে দুইটি শাবক ছিল।

বাটীর চতুষ্পার্শ্বে শত শত লোক আসিয়া জমিল। সকলেই ব্যস্ত, সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল, সকলেই জল আনিতে বলিতে লাগিল; কিন্তু নিজে কেহ জল আনিবার চেষ্টা করিল না, সকলেই হাঁ করিয়া অগ্নির ক্রীড়া দেখিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "আহা! সর্ব্বনাশ হইল, সর্ব্বনাশ হইল।" কেহ বলিতে লাগিল, "হায় হায়! আর কিছু না; ঘরে স্ত্রী হত্যা হইল।" কেহ বলিল, "ইস্! দেখ দেখ! আগুনের ঢেউ দেখ; এইবার সদরদ্বার গেল, এইবার ফুরাইল, আর কার সাধ্য ভিতরে যায়।"

এই সময় একজন বৃদ্ধ চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিল "যে কেহ এক প্রাণী বাঁচাবে আমি তাকে একশত টাকা দিব।" এ কথা সকলেই শুনিল, কিন্তু কেহ অগ্রসর হইল না বা কেহ কোন উত্তর দিল না। শেষ জনার্দ্দন শর্ম্মা অঙ্গের ধুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে আসিয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল "কাঁ! তুমি দিবে? কথা ঠিক ত?"

বৃদ্ধ। নিশ্চয় দিব, এখনই দিব, আমি শপথ করে বলিতেছি, এখনই দিব।

জনার্দ্দন। কত টাকা?

বৃদ্ধ। একশত টাকা। যদি বাঁচাতে পার তবে আর কথায় সময় নষ্ট কর না।

জনার্দ্দন। একশত নগদ টাকা ত? ঠিক?

বৃদ্ধ। হাঁ। তার আর অন্যথা হবে না।

জনার্দ্দন। তোমার নাম কি?

বৃদ্ধ। রামকৃষ্ণ বিদ্যানিধি, আমরা কুলেও মুখুটি, হলধরঠাকুরের সন্তান।

জনার্দ্দন। তবে যা কর বৈষ্ণবী।

এই বলিয়া জনার্দ্দন ইতস্ততঃ অবলোকন করিল, দেখিল দূরে একটা শাবল পড়িয়া রহিয়াছে, সদর্পে তাহা উঠাইয়া, অর্দ্ধদগ্ধ দ্বার আকর্ষণ করিল। দ্বার অমনি পড়িয়া গেল, লক্ষ লক্ষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আকাশপথে উঠিল। সকলে আশ্চর্য্য হইয়া সেই দিকে দৌড়িল, তখন জনার্দ্দন এক দীর্ঘ লগুড় লইয়া আসিল, সকলকে সরিয়া যাইতে বলিল, সকলে সরিয়া দাঁড়াইল, আরও সরিয়া যাইতে বলিল, লোকে আরও সরিয়া গেল। তখন দূর হইতে জনার্দ্দন লগুড় হস্তে দৌড়িয়া আসিয়া লগুড়ে ভর করিয়া এক লম্ফে দ্বকবাব উল্লম্ফন করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল, সকলে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহির হইতে সকলে লম্ফের অবস্থা দেখিতে লাগিল, লগুড়াগ্র দেখা যাইতেছে, ঘুরিতেছে, চলিতেছে। অনেকে বলিতে লাগিল, এখনও সন্ন্যাসী উঠানে রহিয়াছে। অকস্মাৎ বিকট আকাশমুখী লগুড়াগ্র হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, সকলে ভয়ে নিস্তব্ধ হইল, লগুড় আর উঠিল না, তখন কেহ কেহ হাহাকার করিতে লাগিল, বুঝি সন্ন্যাসী পুড়িয়া গিয়াছে। এই সময় জনার্দ্দনের হাসি শুনা গেল, জনার্দ্দন বলিতেছে, "কপোতি তুমি এখনও বসিয়া আছ?"

উত্তাপে কপোতী কাতর হইয়াছে, কণ্ঠ কাঁপিতেছে, চঞ্চু বিযুক্ত হইয়াছে, কপোতী চারিদিকে দেখিতেছে, এখানে ওখানে বসিতেছে, আবার ফিরিয়া নীড়ে আসিতেছে। শাবকেরা ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিতেছে। জনার্দ্দন বলিল, "বুঝিছি, মায়া। আমি উদ্ধার করিতে আসিয়াছি. তোমায় উদ্ধার করিব।"

এই বলিয়া জনার্দ্দন আবার লগুড় গ্রহণ করিয়া তাহার অগ্রভাগ অগ্নিতে ধরিল, শেষ দগ্ধ লগুড় ঊর্দ্ধে উচ্চঃস্বরে, "সন্ন্যাসী বেঁচে আছে" বলিয়া বাহিরের লোকেরা মহাকোলাহল করিয়া উঠিল। ক্রমে লগুড় দুলিতে দুলিতে চণ্ডীমণ্ডপ স্পর্শ করিল, চণ্ডীমণ্ডপে আগুন লাগিল। লোকেরা বলিয়া উঠিল, "আপনিই সন্ন্যাসী চণ্ডীমণ্ডপে আগুন দিল, আর সন্ন্যাসীকে।" এই বলিয়া সকলে বাটীর ভিতরে ঢুকিল [illegible] সন্ন্যাসী তাহা [illegible] করিল না।

চণ্ডীমণ্ডপ পুড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী লগুড়দ্বারা নীড় ভাঙ্গিয়া দিল। শাবক দুইটি ভূমে পড়িয়া গেল, জনার্দ্দন তাহাদের পক্ষ ধরিয়া দোলাইয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিল। কপোতী তাহা নিঃশব্দে দেখিল। সন্ন্যাসী তখন লগুড়-হস্তে তাহাকে তাড়না করিল। শোকাকুলা কপোতী ভয়ে উড়িল, চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া ঊর্দ্ধে উঠিল, কিয়দ্দূর উঠিয়াই অগ্নির উত্তাপে অগ্নিতে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী বলিল, "তোর অদৃষ্ট! আমার দোষ কি?"

চণ্ডীমণ্ডপে একখানি পট ছিল, এতক্ষণ সন্ন্যাসী তাহা দেখে নাই, অগ্নির আলোকে দেখিতে পাইয়া একলম্ফে পটের সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইল। পটখানি কালীমূর্ত্তি। জনার্দ্দন বলিল, "মা! আমার অপরাধ হয়েছে, তুমি এখানে আছ তাই এতক্ষণ এ ঘরে আগুন লাগে নাই, আমি তাহা না জেনে আগুন দিয়াছি। ইষ্টদেবি! আমার অপরাধ ক্ষমা কর।"

৩৪

সেই সময় মাধবীর মা দেখিল, সম্মুখে এক ভয়ানক মূর্ত্তি! মনে করিল, যমদূত মাধবীকে লইতে আসিয়াছে, অতএব মাধবীকে বুকে ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আগন্তুক চীৎকার শুনিয়াও শুনিল না; হস্তপ্রসারিয়া মাধবীকে ধরিল। মাধবীর মা মূর্চ্ছা গেল। সেই সাবকাশে আগন্তুক মাধবীকে লইয়া ছুটিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধাও ছুটিল।

আগন্তুককে যমদূত বলিয়া বৃদ্ধার ভ্রম হয় নাই। আপাদমস্তক কর্দ্দমাক্ত বলিয়া আগন্তুকের আকৃতি ভয়ানক দেখাইতেছিল। বৃদ্ধা বাহিরে আসিয়া বুঝিল যে, আগন্তুক অগ্নিভয়ে আপনার সর্ব্বাঙ্গে কাদার প্রলেপ দিয়াছে। আগন্তুক মাধবীকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া উত্তরের প্রাচীরে উঠিল। এবং তথায় দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীর সংলগ্ন অন্য এক গৃহস্থের ত্রিতল অট্টালিকায় উঠিবার নিমিত্ত মাথা তুলিয়া দেখিতে লাগিল; অট্টালিকায় বালির জমাট কিম্বা চূণকাম নাই, এই জন্য তাহাতে উঠিলে উঠিতে পারা যায়; কিন্তু সে অতি দুঃসাহসিক কার্য্য। কিন্তু আগন্তুক আর অধিক ইতস্ততঃ না করিয়া এক দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। সেই ভয়ানক দুঃসাহসিক কার্য্য দেখিয়া বৃদ্ধার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, আপনার বিপদ একেবারে ভুলিয়া বৃদ্ধা একদৃষ্টিতে সেই অপরিচিত ব্যক্তির বিপদ দেখিতে লাগিল; প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার পদস্খলন আশঙ্কা হইতে লাগিল। বৃদ্ধা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঊর্দ্ধমুখে কেবল সেই দিকে চাহিয়া রহিল; বিপদে ইষ্টদেবীকে ডাকিবে, কিন্তু ইষ্টদেবীর নাম আর মনে আসিল না।

বহুকষ্টে অপরিচিত ব্যক্তি দ্বিতল অতিক্রম করিয়া কার্ণিসে দাঁড়াইল; একবার

নিশ্বাস ফেলিল, বৃদ্ধার শরীরে যেন সেই সঙ্গে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। আর কতটা উঠিতে হইবে, তাহা একবার অপরিচিত ব্যক্তি মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার পর আবার পূর্ব্বমত উঠিতে লাগিল। এবার আর বৃদ্ধা চাহিয়া দেখিতে পারিল না, মস্তক নত করিয়া চক্ষু মুদিল, ক্ষণেক পরে বৃদ্ধা আবার চাহিয়া দেখিল, অপরিচিত ব্যক্তি ছাদে উঠিয়াছে। তখন বৃদ্ধা আসন্নবিপদ্ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ অনুভব করিতে লাগিল। বুঝিল, প্রাণ আর কোন ক্রমে রক্ষা হয় না; চণ্ডীমণ্ডপ পর্য্যন্ত অগ্নি আসিয়াছে, তাহার উত্তাপে অন্তঃপুরে আর থাকা যায় না। যে ঘরে মাধবীর মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে, সে ঘর ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু তাহার দ্বারে অগ্নি লাগিতে আর বিলম্ব নাই। অগ্নিময় বাটী হইতে আর কোন কৌশলে বহির্গত হইতে পারা যায় না। অতএব মৃত্যু নিশ্চয় আগত বুঝিয়া বৃদ্ধা রুদ্রাক্ষমালা মস্তকে বাঁধিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর গেল।

এই সময় পূর্ব্বকথিত অপরিচিত ব্যক্তি আবার অট্টালিকা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল। তথায় গিয়া মাধবীর মার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, শেষ বলিল, "নিদ্রিতা! যাও বাছা, নিদ্রা যাও, অনেক কষ্ট পেয়েছ, জাগিয়া "আর লাভ কি?" তোমার নিদ্রাই এখন আবশ্যক।

তাহার পর অপরিচিত ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ দেখিতে লাগিল। দেখিল স্ত্রীলোকদের পলাইবার কোন পথ নাই। বহির্ব্বাটীর দিকে গিয়া দেখিল, তথায় চারিদিকের চালাঘর পুড়িয়াছে, পুড়িতেছে—সে দিকেও পথ নাই, তথাপি বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আগন্তুক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল। তখন জনার্দ্দন শর্ম্মা পটহস্তে চণ্ডীমণ্ডপহইতে নামিতেছিল, আগন্তুককে দেখিতে পাইল না. দেখিলেও চিনিতে পারিত না। কিন্তু আগন্তুক তাহাকে চিনিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া দেখিতে লাগিল, জনার্দ্দন উঠান দিয়া যাইতে যেন অশক্ত, অগ্নির দিকে চাহিতে পারিতেছে না, চক্ষু কুঞ্চিত করিতেছে, উত্তাপ যেন তাহার অসহ্য হইয়াছে। সন্ন্যাসী কয়েক পদ গিয়া ফিরিল; দেখিল, ফেরা বৃথা; চণ্ডীমণ্ডপের উপর অগ্নি তরঙ্গ তুলিয়া খেলিতেছে। উত্তাপ সেদিকেও অসহ্য।

অপরিচিত ব্যক্তি তখন এই সময় অগ্রসর হইয়া বলিল, "পলাও, আর বিলম্ব করিও না।"

জনার্দ্দন। তুমি কে? তুমি কি অগ্নির দেবতা? নতুবা এই জলন্ত হুতাশনের মধ্যে কেমন করে অম্লানবদনে বেড়াইতেছ?

অপরিচিত। আমি যে হই, তুমি

পলাও, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না, এখনও পলাও। আগুন আজ ক্ষেপেছে, আজ দেবতারও বশ নহে, কাহারও কথা শুনিবে না, তোমারই জন্য জ্বলেছে, দেখিতেছ না তোমাকে ফাঁদে ফেলেছে, তোমার চারিদিকে আগুন। যদি সাধ্য থাকে এখনও পলাও।

জনার্দ্দন। আমার আর সাধ্য নাই, মাথা ঘুরিতেছে, চক্ষে যেন কি দেখিতেছি, কাণ হুহু করিতেছে।

অপরি। তবে এইখানে বসে পরকাল চিন্তা কর।

জনার্দ্দন। যে পথ দিয়া তুমি পলাবে সেই পথে আমায় লইয়া চল।

অপরি। আমি পলাব না; অগ্নি নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত আমি এইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিব।

জনার্দ্দন। এই উত্তাপ তুমি কিরূপে সহ্য করিবে? এ উত্তাপে তোমার কি কষ্ট হতেছে না?

অপরি। কিছুমাত্র নহে; অগ্নিতাপে বরং আমার শরীর শীতল হতেছে, আমার অঙ্গে হাত দিয়া দেখ।

জনার্দ্দন। তাই ত! আশ্চর্য্য শীতল! তবে তুমি দেবতা; আমায় বঞ্চনা কর না। সত্য বল।

অপরি। কাদার সঙ্গে মসলা মাখিয়াছি। আমি দেবতা নহি, আমি নরাধম, পৃথিবীতে আমি কেবল আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত রহিয়াছি।

জনার্দ্দন। ও মেয়ে ভুলান কথা কার কাছে বল? পাপ, পাপ! পাপ ত জুয়াচোরের কথা, পয়সা রোজকারের কথা! পাত্র পেলে আমিও পাপের ভয় দেখাই। বোধ হয় তবে তুমিও মতলবি লোক।

অপরি। তুমি পাপ মান না? ভাল, এ আগুন ত তুমিই জ্বেলেছ, এখন দেখ দেখি সেই আগুনে তুমিই পুড়িতে বসিলে। ইহা কি পাপের দণ্ড নহে?

জনার্দ্দন। অমন কতবার হয়ে গেছে; কত স্ত্রীহত্যা, কত ব্রহ্মহত্যা করেছি, তার জন্য কত ফল পেয়েছি, কয়বার পুড়ে মরেছি? অপঘাত মৃত্যু অসাবধানতার ফল; পাপের ফল কিসে?

অপরি। অনিয়ম কাজকেই পাপ বলে; তাহার দণ্ড আছে।

জনার্দ্দন। পাপের দণ্ড! ছয়মাসের শিশু নৌকা ডুবি হয়ে মরে; সে কোন পাপের দণ্ড? ছয়মাসের শিশু কোন পাপ করেছিল? ঝড়ে কাক মরে, সে কোন পাপের দণ্ড? কাক কি করিয়াছিল? তুমি বলিবে কাক বেদবহির্ভূত কোন কার্য্য করেছিল, অথবা কোন ভট্টাচার্য্যের ঘৃতে মুখ দিয়াছিল। তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমি এইমাত্র মনে করে ছিলাম তুমি দেবতা; বুঝিলাম তুমি নির্ব্বোধ। পাপের যদি দণ্ড থাকে তবে পুণ্যেরও দণ্ড আছে; কেন না নিত্য দেখা যায় অনেকে পুণ্য কার্য্য করিতেছে, অথচ সঙ্গে সঙ্গে কষ্টও পাইতেছে।

সুখ-দুঃখসম্বন্ধে পাপপুণ্য সমান। আমি বেদ বেদান্ত পড়েছি, সকলই আঁধার, সকলেই অন্ধের লেখা—মীমাংসা নাই। আসল কথা—সুখ দুঃখের হেতু অবোধ্য; যদি তা না হবে, তবে বল দেখি, ইন্দ্রভূপ রাজা কেন, আর আমার এই দারিদ্র্যদশা কেন?

অপরি। ওখান হইতে একটু দূরে আইস। অগ্নি তোমায় লক্ষ্য করেছে, ঐ দেখ চণ্ডীমণ্ডপ হইতে তোমারই মাথায় পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে।

এই বলিতে বলিতেই চণ্ডীমণ্ডপের একাংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, পূর্ব্বে সতর্ক না হইলে তৎক্ষণাৎ জনার্দ্দনের শেষ হইত। চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়া আরও উত্তাপ বাড়িল; জনার্দ্দন বলিয়া উঠিল, "আমি মরি,আমায় বাঁচাও। না হয় বল আমি আগুনে ঝাঁপ দিই, সে বরং ভাল, শীঘ্র ফুরাবে।"

অপরি। আমি তোমায় কিরূপে বাঁচাব, তাহা বলিয়া দেও।

জনার্দ্দন। তা আমি জানি না, তুমি দেবতা, উপায় তুমি সকলই জান। আমায় বাঁচাও, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।

অপরি। বাঁচিতে কি তোমার এত সাধ?

জনার্দ্দন। আমায় বাঁচাও। আমি কাটাকাটি করে মরিতে পারি; এমন বৃথা দাঁড়াইয়া মরিতে পারি না। এ মরণের বড় যন্ত্রণা।

অপরি। তুমি কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলে?

জনার্দ্দন। আমি ঐ সদর দরওয়াজা লাফাইয়া আসিয়াছিলাম, আমি এখন আর তা—

এই বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী পড়িবার উপক্রম করিল। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে ধরিয়া শুয়াইয়া দিল। জনার্দ্দন চক্ষু বুজিল, আর কথা কহিল না। অপরিচিত ব্যক্তি চীৎকার করিয়া ডাকিল, "জনার্দ্দন!" তখন স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় জনার্দ্দন চক্ষু চাহিয়া আবার চক্ষু মুদিল।

অপরি। জনার্দ্দন! আমায় চিনিতে পার?

জনার্দ্দন তখন ধীরে ধীরে, অলসে, যেন নিদ্রার আবেশে বলিতে লাগিল, "পারি, তুমি দেবতা, সূর্য্য, আমি সূর্য্যমণ্ডলে এসেছি। পুড়ে মরি! রক্ষা কর, আমি শরণাপন্ন।"

অপরিচিত ব্যক্তি আবার ডাকিল, কিন্তু আর কোন উত্তর না পাইয়া, জনার্দ্দনকে বুকে তুলিয়া, নিমেষমধ্যে দগ্ধদ্বার অতিক্রম করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় তাহাকে শয়ন করাইল, তথায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া জনার্দ্দনের মুখপ্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর চীৎকার করিয়া বলিল, "পরিচিত কে আছ, সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা কর।" সে চীৎকার শত শত কণ্ঠনিঃসৃত কোলাহলের উপরে উঠিল, যেন ঝিল্লীরবের

উপর সারস্ ডাকিল; অমনি সভয়ে ঝিল্লীরা নীরব হইল। অপরিচিত ব্যক্তি আবার ফিরিয়া দগ্ধ গৃহে প্রবেশ করিল। একজন পরিচিত ব্যক্তি সে কণ্ঠ শুনিল; শুনিবামাত্র ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুশ্রূষা করিতে বসিল।

পরক্ষণেই সেই অপরিচিত ব্যক্তি আবার বহির্গত হইল। এবার বৃদ্ধাকে আনিয়া, মৃত্তিকায় সযত্নে রাখিয়া পুনর্ব্বার গৃহ প্রবেশ করিল। বৃদ্ধা রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অল্পজ্ঞান আছে; লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ব্যক্তি কে?" বৃদ্ধা পথের প্রতি চাহিল; কোন উত্তর করিল না।

তখন দ্বারের সম্মুখে সকলে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ব্যক্তি আবার এখনই আর একজনকে আনিবে, এই প্রত্যাশায় সকলে গিয়া জমিল; আসিতেছে কি না দেখিবার নিমিত্ত সকলেই পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। সম্মুখে আর স্থান নাই, তথাপি সকলেই ব্যস্ত হইয়া অগ্রে দাঁড়াইবে বলিয়া ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। এই সময় মাধবীর মাকে ক্রোড়ে লইয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি অতি বেগে আসিয়া লম্ফ দিল। কিন্তু সম্মুখে স্থান ছিল না, বেগ সম্বরণ করিতে গিয়া দগ্ধদ্বারের উপর পড়িয়া গেল। চারিদিকে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল।

অপরিচিত ব্যক্তি বিদ্যুদ্‌বেগে অমনি উঠিয়া দাঁড়াইল। তখনও মাধবীর মা তাঁহার ক্রোড়ে। কিন্তু অগ্নিসংস্পর্শে যুবতীর বস্ত্র স্থানে স্থানে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। অপরিচিত ব্যক্তি তাহাকে নামাইয়া, উলঙ্গ করিবার নিমিত্ত উদ্যোগ করিল। যুবতী তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সেই জ্বলন্ত বস্ত্র ধরিয়া জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপ দিল। সকলে হাহাকার করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সকলই ফুরাইয়া গেল। মাধবীর মা লজ্জার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়াছিল, এবার লজ্জার ভয়ে দেহত্যাগ করিল।

লোকেরা সকলে দাঁড়াইয়া শবদাহ দেখিতে লাগিল। যতক্ষণ পারিল খড়, বাঁশ, বস্ত্র, মাধবীর মাকে দগ্ধ করিল। তার পর অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে শবের অঙ্গারমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। কেবল বামপদ খানি অগ্নিতে পড়ে নাই সুতরাং পুড়ে নাই; তাহা অলক্তসংযুক্ত এখনও রহিয়াছে; নগরে অগ্নিশিখা এখনও প্রতিবিম্বিত হইতেছে। অনেকে তাহা দেখিতে ও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু একজন যুবা তাহা দেখিতে পারিল না; "আমি সপ্তকাষ্ঠকী দিই," বলিয়া কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া সেই কোমল পদখানি আবরণ করিল। তাহার পর আবার কাষ্ঠ আনিয়া নিষ্ঠুর লোকের কঠোর দৃষ্টি হইতে শবের সর্ব্বাঙ্গ গোপন করিল। আবার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, শবদাহ সম্পূর্ণ হইল।

গৈরিকবস্ত্রধারী যুবা-ব্রহ্মচারী, আমা-

দের পূর্ব্বপরিচিত মাতঙ্গিনী। ভৈরবী প্রভৃতি চারিজন এই গ্রামে রাত্রিযাপন করিতেছিল, গৃহদাহ দেখিবার নিমিত্ত মাতঙ্গিনী যুবার বেশে আসিয়াছিল।

৩৫

দূর হইতে জনার্দ্দন শর্ম্মা দেখিল মাধবীর মা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভাবিল, "উত্তম হইয়াছে, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে মাধবীর সংবাদ পাইলেই হয়।" আবার ভাবিল, "মাধবীও রক্ষা পায় নাই, কেন না সেই অপরিচিত ব্যক্তি কেবল বৃদ্ধাকে আর মাধবীর মাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু মাধবীকে ত আনে নাই, মাধবী তবে কোথা গেল? মাধবী অবশ্য মরিয়াছে।" মনে মনে এই আলোচনা করিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল, "জগদীশ্বর আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছেন। দুইজনেই মরিয়াছে। কল্যই গিয়া সম্বাদ দিব, দেখি রাণী কি পারিতোষিক দেন।"

এই সময় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ আসিয়া জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্দ্দমাক্ত ব্যক্তি যে তোমাদের উদ্ধার করিল সে কে?"

জনার্দ্দন। সে আমার পরিচিত বটে, আত্মীয়ও বটে।

বৃদ্ধ। উহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিব না; বলিতে সে নিষেধ করে গেছে। পাছে আপনারা কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন, এই ভয়ে সে গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছিল।

বৃদ্ধ। আমরা তাকে চিনিলে দোষ কি?

জনার্দ্দন। দোষ একটু আছে; তা আপনার আর শুনে কাজ নাই; সে আমায় বিশেষ করে নিষেধ করে গেছে, আমি আর তাহা বলিব না।

বৃদ্ধ। ভাল আমরা ত কেহ উহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই।

জনার্দ্দন। গৃহদাহের পূর্ব্ব হইতে ঐ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ছিল, নিত্যই থাকে।

বৃদ্ধ। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বাটীর কেহ নহে, এ বাটীতে পুরুষমাত্রেই নাই।

জনার্দ্দন। পুরুষ ছিল না, কিন্তু ইদানীং জুটিয়াছিল, আমরা সন্ন্যাসী, এরূপ কতই দেখিয়াছি। সে যাহা হউক এখন আর জুটিবে না, যাহার জন্য জুটিয়াছিল এখন ত সে গেল।

বৃদ্ধ। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিলাম না।

জনার্দ্দন। সে সকল কথা যাকৃ; আপনার বুঝিয়াও কাজ নাই। যিনি মরিলেন, তিনি আপনাদের কিম্বা আপনাদের গ্রামেরও কেহ ছিলেন না, শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। যিনি আমাদের উদ্ধার করিলেন, তিনিও শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আবার গেলেন। যাবার সময় আমায় টাকার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ। কোন্ টাকার কথা ?

জনার্দ্দন। আপনি যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। এক একজন এক এক শত টাকার হিসাবে তিনশত টাকা তাহার পাওনা, তা আমি বলেছি যে, আমার হিসাব ছেড়ে দেও, আমি বাহিরের লোক। দুইশত টাকা তাহার ন্যায্য পাওনা; তবু আমি আপনার হয়ে বলেছি যে, একজন ত মরে গেল। তা সে শুনিল না; সে বলে "আমি ত উদ্ধার করেছি, তার পর কে এখন জলে ডুবে মরিবে,কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তা আমার কি ?"

বৃদ্ধা। তা, তারে কাল আসিতে বলিবেন দেখা যাবে।

জনার্দ্দন। আবার তাকে কেন ? তবে আমি বলিলাম কি ? সে যদি আপনাদের নিকট মুখ দেখাবে, তবে মুখে কাদা মাখ্‌বে কেন. এই সোজা কথা আপনি বুঝিতেছেন না ?

বৃদ্ধা। বুঝেছি, কিন্তু সে ব্যক্তি এমন ধর্ম্মিষ্ঠলোক, এমন বীর, সে আমাদের নিকট কেন মুখ দেখাবে না ?

জনার্দ্দন। ঐ যে বলিলাম, যে যুবতী এইমাত্র ভস্ম হইল, উহার নিতান্ত অনুরোধে পড়ে এ গ্রাম পর্য্যন্ত সে এসেছিল, তাতেই ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু শান্তিশতগ্রামে যেখানে উভয়ের বাড়ী সেখানে উহার কোন কলঙ্ক নাই, লোকে জানে মাধবীর মা কুলত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু কার সঙ্গে তা কেহ ঠিক জানে না।

বৃদ্ধ। এমন পাপিষ্ঠকে আমি কদাচ পারিতোষিক দিব না।

জনার্দ্দন। কেন দিবেন না ? পাপিষ্ঠ হইলে টাকা দিবেন না এমত ত কথা ছিল না। যে উদ্ধার করিবে তাকেই আপনি টাকা দিবেন, এই ত কথা ছিল। হলই বা সে নিজে পাপিষ্ঠ, লম্পটলোকের কি দয়া থাকে না ? না, স্নেহ থাকে না ? লাম্পট্য দোষে দয়ার কার্য্য কি কখন কলুষিত হয় ! সে ব্যক্তি লম্পট বলিয়া কি আমাদের প্রাণরক্ষা হয় নাই ? না, আমাদের প্রাণের কোন কমবেশী হইয়াছে ? ধর্ম্ম সতত পবিত্র; চণ্ডালে ধর্ম্ম করিয়াছে বলে ধর্ম্ম কখন কি অপবিত্র হয় ? আর এক বিশেষ কথা আছে; আপনি দুইশত টাকা দিয়া এই ধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন; এ ধর্ম্ম ত সে অপাত্রে থাকিতেছে না—খরিদ করিলেই ধর্ম্ম আপনাতে আসিবে; খরিদ না করেন এ ধর্ম্ম তাহারই থাকিবে। দুইশত টাকায় প্রাণরক্ষা বড় সস্তা।

বৃদ্ধা। কথা ঠিক বটে, তবে আর ভাবা চিন্তা কি ? আইস, আমার সঙ্গে আইস, আমি বলেছি দিব, তার অন্যথা হইবে না। তবে কি জান দুইশত টাকা—অনেকগুলা টাকা; কিছু কম লইলে ভাল হয়।

জনার্দ্দন। তা আমি কি করিব; আমি ত লইতেছি না, তা হইলে আপ-

দের পূর্ব্বপরিচিত মাতঙ্গিনী। ভৈরবী প্রভৃতি চারিজন এই গ্রামে রাত্রিযাপন করিতেছিল, গৃহদাহ দেখিবার নিমিত্ত মাতঙ্গিনী যুবার বেশে আসিয়াছিল।

৩৫

দূর হইতে জনার্দ্দন শর্ম্মা দেখিল মাধবীর মা দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। ভাবিল, "উত্তম হইয়াছে, আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, এক্ষণে মাধবীর সংবাদ পাইলেই হয়।" আবার ভাবিল, "মাধবীও রক্ষা পায় নাই, কেন না সেই অপরিচিত ব্যক্তি কেবল বৃদ্ধাকে আর মাধবীর মাকে বহন করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু মাধবীকে ত আনে নাই, মাধবী তবে কোথা গেল? মাধবী অবশ্য মরিয়াছে।" মনে মনে এই আলোচনা করিয়া জনার্দ্দন উঠিয়া বসিল। আহ্লাদে বলিল, "জগদীশ্বর আমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছেন। দুইজনেই মরিয়াছে। কল্যই গিয়া সম্বাদ দিব, দেখি রাণী কি পারিতোষিক দেন।"

এই সময় পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ আসিয়া জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্দ্দমাক্ত ব্যক্তি যে তোমাদের উদ্ধার করিল সে কে?"

জনার্দ্দন। সে আমার পরিচিত বটে, আত্মীয়ও বটে।

বৃদ্ধ। উহার নাম কি, নিবাস কোথায়?

জনার্দ্দন। তা আমি বলিব না; বলিতে সে নিষেধ করে গেছে। পাছে আপনারা কেহ তাহাকে চিনিতে পারেন, এই ভয়ে সে গায়ে মুখে কাদা মাখিয়াছিল।

বৃদ্ধ। আমরা তাকে চিনিলে দোষ কি?

জনার্দ্দন। দোষ একটু আছে; তা আপনার আর শুনে কাজ নাই; সে আমায় বিশেষ করে নিষেধ করে গেছে, আমি আর তাহা বলিব না।

বৃদ্ধ। ভাল আমরা ত কেহ উহাকে গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই।

জনার্দ্দন। গৃহদাহের পূর্ব্ব হইতে ঐ ব্যক্তি অন্তঃপুরে ছিল, নিত্যই থাকে।

বৃদ্ধ। কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ বাটীর কেহ নহে, এ বাটীতে পুরুষমাত্রেই নাই।

জনার্দ্দন। পুরুষ ছিল না, কিন্তু ইদানীং জুটিয়াছিল, আমরা সন্ন্যাসী, এরূপ কতই দেখিয়াছি। সে যাহা হউক এখন আর জুটিবে না, যাহার জন্য জুটিয়াছিল এখন ত সে গেল।

বৃদ্ধ। তুমি কি বলিতেছ, আমি বুঝিলাম না।

জনার্দ্দন। সে সকল কথা যাকৃ; আপনার বুঝিয়াও কাজ নাই। যিনি মরিলেন, তিনি আপনাদের কিম্বা আপনাদের গ্রামেরও কেহ ছিলেন না, শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। যিনি আমাদের উদ্ধার করিলেন, তিনিও শান্তিশতগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। সেইখানেই আবার গেলেন। যাবার সময় আমার টাকার কথা বলে গেলেন।

বৃদ্ধ। কোন্ টাকার কথা?

জনার্দ্দন। আপনি যে টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। এক একজন এক এক শত টাকার হিসাবে তিনশত টাকা তাহার পাওনা, তা আমি বলেছি যে, আমার হিসাব ছেড়ে দেও, আমি বাহিরের লোক। দুইশত টাকা তাহার ন্যায্য পাওনা; তবু আমি আপনার হয়ে বলেছি যে, একজন ত মরে গেল। তা সে শুনিল না; সে বলে "আমি ত উদ্ধার করেছি, তার পর কে এখন জলে ডুবে মরিবে, কি গলায় দড়ি দিয়া মরিবে, তা আমার কি?"

বৃদ্ধা। তা, তারে কাল আসিতে বলিবেন দেখা যাবে।

জনার্দ্দন। আবার তাকে কেন? তবে আমি বলিলাম কি? সে যদি আপনাদের নিকট মুখ দেখাবে, তবে মুখে কাদা মাখ্‌বে কেন. এই সোজা কথা আপনি বুঝিতেছেন না?

বৃদ্ধা। বুঝেছি, কিন্তু সে ব্যক্তি এমন ধর্ম্মিষ্ঠলোক, এমন বীর, সে আমাদের নিকট কেন মুখ দেখাবে না?

জনার্দ্দন। ঐ যে বলিলাম, যে যুবতী এইমাত্র ভস্ম হইল, উহার নিতান্ত অনুরোধে পড়ে এ গ্রাম পর্য্যন্ত সে এসেছিল, তাতেই ভদ্রলোকের ছেলে লজ্জায় মরে গেছে। কিন্তু শান্তিশতগ্রামে যেখানে উভয়ের বাড়ী সেখানে উহার কোন কলঙ্ক নাই, লোকে জানে মাধবীর মা কুলত্যাগিনী হয়েছে, কিন্তু কার সঙ্গে তা কেহ ঠিক জানে না।

বৃদ্ধ। এমন পাপিষ্ঠকে আমি কদাচ পারিতোষিক দিব না।

জনার্দ্দন। কেন দিবেন না? পাপিষ্ঠ হইলে টাকা দিবেন না এমত ত কথা ছিল না। যে উদ্ধার করিবে তাকেই আপনি টাকা দিবেন, এই ত কথা ছিল। হলই বা সে নিজে পাপিষ্ঠ, লম্পটলোকের কি দয়া থাকে না? না, স্নেহ থাকে না? লাম্পট্য দোষে দয়ার কার্য্য কি কখন কলুষিত হয়? সে ব্যক্তি লম্পট বলিয়া কি আমাদের প্রাণরক্ষা হয় নাই? না, আমাদের প্রাণের কোন কমবেশী হইয়াছে? ধর্ম্ম সতত পবিত্র; চণ্ডালে ধর্ম্ম করিয়াছে বলে ধর্ম্ম কখন কি অপবিত্র হয়? আর এক বিশেষ কথা আছে; আপনি দুইশত টাকা দিয়া এই ধর্ম্ম ক্রয় করিতেছেন; এ ধর্ম্ম ত সে অপাত্রে থাকিতেছে না—খরিদ করিলেই ধর্ম্ম আপনাতে আসিবে; খরিদ না করেন এ ধর্ম্ম তাহারই থাকিবে। দুইশত টাকায় প্রাণরক্ষা বড় সস্তা।

বৃদ্ধা। কথা ঠিক বটে, তবে আর ভাবা চিন্তা কি? আইস, আমার সঙ্গে আইস, আমি বলেছি দিব, তার অন্যথা হইবে না। তবে কি জান দুইশত টাকা—অনেকগুলা টাকা; কিছু কম লইলে ভাল হয়।

জনার্দ্দন। তা আমি কি করিব; আমি ত লইতেছি না, তা হইলে আপ-

নার অনুরোধ আমায় রাখিতে হইত। এখন যদি আপনি সমুদয় পুরা, রোক টাকা না দেন, আপনাকে ধর্ম্মে পতিত হইতে হইবে। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ; আপনি কেন অন্যের জন্য আপনার ধর্ম্মের ক্ষতি করিবেন। বিশেষতঃ এ ধর্ম্ম বড় সামান্য নহে, দুইহাজার টাকা ব্যয় করেও কেহ প্রাণরক্ষা করিতে পারে না; এ ঘটনা ত সর্ব্বদা ঘটে না, আপনার বড় ভাগ্য তাই এই গৃহদাহ হইয়াছে, দেখুন দেখি ধর্ম্মের কি আশ্চর্য্য খেলা— একজনের গৃহদাহ হইল, আপনার ধর্ম্ম-সঞ্চয় হইল!

বৃদ্ধ। তবে আর কোন কথায় কাজ নাই, তুমি টাকা লইয়া যাও; কিন্তু একটা কথা আছে; যিনি মরিলেন তিনি কে?

জনার্দ্দন। তিনি রামদাস শর্ম্মার বিবাহিতা স্ত্রী—কুলটা; রাজা ইন্দ্রভূপের প্রণয়িনী। আর অধিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন না।

এই বলিয়া টাকা লইয়া জনার্দ্দন চলিল। পথে আসিয়া একবার আন্তরিক হাসি হাসিয়া বলিল, "সে বেটা এখন কোথায়; আসিয়া দেখুক, ধর্ম্মের জয় কি পাপের জয়! আবার এ বুড়া বেটা ধর্ম্ম কিনিতে চায়! চাল কেনে, দাল কেনে, কাজেই ধর্ম্মও কিনিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম চাল দালের মধ্যেই বটে।"

রাত্রি প্রভাত হইলে শান্তিশত গ্রামে পারিতোষিক লইতে যাইবে, এই মনে করিয়া জনার্দ্দন পূর্ব্বকথিত অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিল। এমত সময় একজন দীর্ঘাকার পুরুষ আসিয়া জনার্দ্দনের অনতিদূরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও ব্রহ্মচারিবেশধারিণী মাতঙ্গিনী চিতার নিকট দাঁড়াইয়াছিল। দীর্ঘাকার পুরুষ তাহাকে উপলক্ষ করিয়া বলিল, "এ যে নরদেহাবশেষ।"

মাত। দুঃখিনী, অনাথিনীর দেহাবশেষ।

দীর্ঘাকার পুরুষ মৃদুস্বরে বলিল, "মাতঙ্গিনি, তুমি অদ্যাপি শান্তিশতগ্রামে যাও নাই?"

মাতঙ্গিনী চিনিল। ইচ্ছা ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করে, কিন্তু করিল না। বলিল, "মহারাজ আসুন, আর একটু দূরে গিয়া সকল কথা বলিতেছি।" দীর্ঘাকার পুরুষ রাজা মহেশচন্দ্র। মাতঙ্গিনী কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনিই কি এইমাত্র গৃহবাসীদের উদ্ধার করিয়াছেন? আপনি ভিন্ন এরূপ বীরত্ব আর কাহারও সম্ভবে না; কিন্তু তাহা হইলে আপনি এখনও দাঁড়াইয়া আছেন কিরূপে? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি আপনার পা হাত পুড়িয়া গিয়াছিল।"

মহেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি শিবির হইতে এইমাত্র আসিতেছি, গৃহদাহের বৃত্তান্ত সকল আমায় বল; আমি কিছুই জানি না।" মাতঙ্গিনী আপনার জ্ঞানানুসারে

বলিলে মহেশচন্দ্র ভাবিলেন, "এরূপ বীরত্ব কে করিয়াছে? এরূপ লোক এ অঞ্চলে কে আছে?" তাহার পর মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহার আকারসম্বন্ধে কোন চিহ্ন স্মরণ করিয়া বলিতে পার।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তিনি সর্ব্বাঙ্গে কি লেপন করিয়াছিলেন, তাঁহার শরীরের বর্ণ কি চিহ্ন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে একটা কথা এখন আমার স্মরণ হইতেছে, যে তিনি আপনার মত দীর্ঘাকার কি বলিষ্ঠ নহেন।"

মহেশচন্দ্র। তিনি কাহারও সহিত কথা কহিয়াছিলেন?

মাতঙ্গিনী। না, একেবারে না, তিনি নিমেষের মধ্যে কয়জনের প্রাণরক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন; আমার বোধ হইল, যেন ঝড় আসিয়া মানুষের রূপ ধরে এই কার্য্য করিয়া গেল।

মহেশচন্দ্র। তুমি না বলিতেছিলে তাঁহার অঙ্গের দুই এক জায়গা পুড়িয়া গিয়াছে?

মাতঙ্গিনী। নিশ্চয়ই তাঁহার অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে, তিনি যখন অমন করে আগুনের উপর পড়ে গেলেন, তখন অবশ্যই তাঁহার অঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে।

মহেশচন্দ্র। তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিব। এখন আমি যাই; আমার সহিত আবার সাক্ষাৎ না হইলে যেন শান্তিশতগ্রামে যাওয়া না হয়।

যোগেশ।*

যোগেশ-গ্রন্থকার বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহেন; বৎসরাধিক হইল, আমরা তাঁহার চিত্ত-মুকুর সমালোচনা করিয়াছি। তৎকালে আমরা ভাবিয়াছিলাম, যে এই কবি এক সময়ে বিশেষ যশস্বী হইবেন, এক্ষণে তাঁহার যোগেশ পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি, যে তাঁহার যশের সূত্রপাত হইয়াছে।

যোগেশ একখানি কাব্যোপন্যাস—

* যোগেশ কাব্য। শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়প্রণীত। ৮৪ নং রাধাবাজার কলিকাতা প্রেসে মুকর্জ্জি কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থের নায়কের নামে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে। যোগেশ ধনবানের পুত্র, সুশিক্ষিত, সকলপ্রকার সদ্গুণশালী, কবিহৃদয়, রূপবান্। কিন্তু দৈবযোগে তিনি তাঁহার অতুলগুণসম্পন্না পতিপ্রাণা ভার্য্যা নর্ম্মদার গভীরপ্রেম তুচ্ছ করিয়া, তাঁহার বালবন্ধু-পত্নী মন্দাকিনীর প্রতি অনুরক্ত হইলেন। মন্দাকিনী যোগেশকে সহোদরের ন্যায় দেখিতেন, তাঁহাকে সেই মতই দেখিতে লাগিলেন। হতাশ যোগেশ এই প্রত্যাখ্যানে গৃহত্যাগ পূর্ব্বক অতি শৈশব একমাত্রপুত্র, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই ভুলিয়া—সমুদ্রতীরস্থ ভৈরবনামক এক পর্ব্বতে কেবল মন্দাকিনীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। যোগেশের শরীর ক্রমশঃ "শ্মশানে প্রোথিত জীর্ণবংশখণ্ড মত" হইয়া আসিল। এইখান হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে।

একদিন নিদ্রাবস্থায় মন্দাকিনীসম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়া যোগেশের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সুপ্তোত্থিত যোগেশ চমকিত হইয়া নিদ্রাকে সম্বোধন পূর্ব্বক স্বপ্নদৃষ্ট সমস্ত বৃত্তান্ত জাগ্রত চক্ষে দেখাইতে বলিলেন; নিদ্রা যোগেশকে স্বপ্নদৃষ্ট বৃত্তান্ত দেখাইলেন। তাহা চাক্ষুষ হইবামাত্র যোগেশ গভীর কাতরোক্তি করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্রমশঃ প্রভাত হইল, যোগেশ চেতনা পাইয়া পড়িয়া আছেন, এমন সময় তথায় এক ব্যাধ মৃগয়াবেশে উপস্থিত হইল,* এবং যোগেশের তাদৃশ অবস্থা দৃষ্টে ব্যথিতান্তঃকরণে, তাঁহাকে বক্ষে তুলিয়া আপনার কুটীরে লইয়া গেল। সেখানে গিয়া ব্যাধ যোগেশকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যোগেশ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ব্যাধের প্রতিপ্রশ্নে উন্মত্তের ন্যায় "ওই আমার জীবন" বলিয়া আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতে লাগিলেন। বারম্বার ঐরূপ করাতে ব্যাধ নির্দ্দিষ্ট পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, তৎপরে পার্শ্বে দেখিবামাত্র যোগেশকে দেখিতে পাইল না—যোগেশ উন্মত্তাবস্থায় কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ব্যাধ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময়—

শিশু পুত্র শবরের আসি পার্শ্বে তার
ডাকিল তাহায় "বাবা!"—সিহরিয়া ব্যাধ
হেরিল পারশে পুত্র, ভুলিয়া সকল
লইল সন্তানে বক্ষে হাসিতে হাসিতে।

ব্যাধের নিকট হইতে আসিয়া, একদিন ভৈরবপর্ব্বতের গুহায় যোগেশ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় তাঁহার মৃত পিতৃআত্মা উপস্থিত হইলেন। তিনি পুত্রকে যাহা বলিলেন, তাহা গম্ভীর মেঘনির্ঘোষতুল্য, পাঠকালে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, অথচ করুণরসে আপ্লুত— অন্তস্তল ভেদ করে; সে কথাগুলি অতীব দীর্ঘ, কিন্তু আমরা পাঠকবর্গকে তাহা না দেখাইয়া থাকিতে পারিলাম না—*

* এই পুস্তকে উদ্ধৃত করিবার বিষয় অনেক আছে, কিন্তু স্থানাভাববশতঃ তাহার অধিকাংশই উদ্ধৃত করিতে পারিব না।

"আমি পিতৃ-আত্মা তব—প্রেতপুরে আজ
ভ্রমিতেছিলাম প্রাতে বৈতরণী-তীরে,
ভাগ্য প্রেতসনে দেখা ;—হেরিয়া আমায়
কহিল সে ব্যঙ্গ করি 'তনয় তোমার
হ'য়েছে অদ্ভুত জীব আমার কুহকে,
ভৈরব পর্ব্বতে এনে শ্বাপদের সনে
বিহরিছে, পরিহরি আত্মপরিজন।
জীবনের সূত্র তার দিয়াছি ছিঁড়িয়া
আশা, স্মৃতি, সুখ, তার দুরাশার স্রোতে,
এমনি কৌশল করি করেছি বেষ্টন,
জাগ্রতে নিদ্রায় তাহে মগ্ন অনুক্ষণ।'
কি দুরাশা! ভাবিলাম জীবন তোমার—
পরিহরি জীবলীলা আসিনু যখন,
নিতান্ত কৈশোর তুমি,—জননী তোমার
শোকে উন্মাদিনী! আহা কতই কাঁদিল
ধরিয়া চরণ মম ; ভগিনী তোমার
ধূলায় পড়িয়া বালা, "বাবা বাবা" বলি
কাঁদিল চীৎকার করি, সহোদর তব
অশ্রুপূর্ণ নেত্রে চাহি বদনে আমার
বিষাদে আকুল হ'য়ে রহিল দাঁড়ায়ে।
তুমি—সে সময় নাহি বুঝিলে কি শোক,
কাঁদে মাতা, কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী, হেরি
কাঁদিলে পারশে বসি মুমূর্ষু শয্যার।
কনিষ্ঠ সন্তান বলি তোমায় অধিক
বাসিয়াছিলাম ভাল, দেখিনু চাহিয়া
আসন্ন মরণকালে বারেক তোমার
স্নেহ মাখা মুখখানি,—অন্তিম চিন্তায়
উদিল স্মরণে মম, 'কি করিনু তব ?
তরঙ্গসঙ্কুল এই ভীষণ সংসারে
অবোধ শিশুরে আহা! অনাথ করিয়া
চলিনু কেমনে'—দুঃখে ঝরিল নয়ন।
ডাকি সহোদরে তব, কর ধরি তার—
তোমার যুগল কর রাখি তার করে,
কহিনু সজলনেত্রে—'রহিল যোগেশ—
অবোধ সন্তান বাছা, জানে না, উহায়
পথের ভিখারি করি করিনু প্রস্থান ;
পালিও উহারে বৎস!—যতনে তোমারে
দিয়াছি বিপুল শিক্ষা,—কৃতী পুত্র তুমি,
দেখিও যোগেশ যেন জীবনে উহার
ক্লেশ নাহি পায় কভু,'—বলিতে বলিতে
জীবতারা অস্ত গেল ; তদবধি আর
দেখি নাই, ভাবি নাই তোমায় কখনো,
মরতের কোন চিন্তা জাগে নাই মনে,
শুনি ভাগ্যপ্রেত কথা হইল বাসনা
দেখিতে বারেক মম পার্থিব ভবন।
গেলাম তথায়—কিন্তু নিরখিনু যাহা
প্রেতআত্মা মম তায় হৈল বিচলিত।
বিষাদে পূর্ণিত সেই উচ্চ অট্টালিকা,
উত্তপ্ত নিশ্বাসে পূর্ণ পবন তাহার,
আছে কি না আছে তথা নরের বসতি
হেরি সে নীরব গৃহ হয় না ধারণা।
অগ্রজ তোমার সদা বিষণ্ণ বিষাদে,
শাখাহীন তরু প্রায় গিয়াছে শুকায়ে,
প্রাচীনা জননী তব কাঁদি অবিরত
হারায়েছে চক্ষুঃ দুটী,—ভূতল শয্যায়
পড়িয়া সতত শোকে ; ভগিনী তোমার
সতত বিষণ্ণ দুখে সোদর বিরহে।
আর—পরিণীতা সেই রমণী তোমার
কি বলিব!—সে সে দৃশ্য চিত্ত বিদারক!
বিকচ যৌবনা বালা সুবর্ণের ফুল
দারুণ হুতাশে দেহ গিয়াছে শুকায়ে,
প্রফুল্ল পঙ্কজ মুখ রবি অস্তে যেন

হইয়াছে সঙ্কুচিত, শৈবল শরীর
মৃণাল সে ভুজলতা—সলিল বিহনে
জড়ায়ে শুকায়ে যেন পড়িয়া রয়েছে।
চম্পকের কলিমত শিশু পুত্রটিরে
কোলেতে করিয়া বাছা, নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে
গবাক্ষে বসিয়া সদা চাহি পথপানে।
নেত্রে সীতাকুণ্ডসম উত্তপ্ত সলিল
উথলিছে অবিরত, শিশুটি তাহার
চেয়ে আছে অনিমিষে মায়ের বদনে,
খুলিয়াছে অভাগিনী অঙ্গ আভরণ
সধবার চিহ্নমাত্র রেখেছে ললাটে
ক্ষীণ রেখা সিন্দুরের পরম যতনে।
ক্রোধ, ক্ষোভ, যুগপৎ উদিয়া মানসে
প্রেত আত্মা বিচলিত হইল আমার।
সে করুণ দৃশ্য নেত্রে নারিনু সহিতে
তোমার উদ্দেশে দ্রুত আসিনু এখানে"
"যোগেশ!"গম্ভীরে ছায়া কহিলা আবার,
"বড় আদরের পুত্র আছিলে আমার
প্রাচীন বয়সে মম অন্তিম জীবনে
ছিলে তুমি একমাত্র আনন্দ পুতলি,
কত আশা উছলিত হৃদয়ে তখন
হেরিয়া তোমার ফুল্ল বদন কমল!
ভাবিতাম জগতের যা কিছু পবিত্র
যা কিছু আনন্দ ভবে, যা কিছু বাসনা,
সকলি সমষ্টি করি, দয়াবান-বিধি
তোমা হেন পুত্রনিধি দিয়াছেন মোরে।
বিদ্যা, ধন, যশঃ, মান, পুণ্য, সবি সাধ
করিবে সঞ্চয় তুমি জীবন বিকাশে!
সে সাধ আমার পুত্র!—সে চিরবাসনা—
সাধিছ কি এই ভাবে অলস জীবনে?
জনমদাতার ঋণ শোধিছ কি আজ,
নিভৃত গুহায় বসি প্রেম উপাসনে?
প্রেম পুন কার? ছি ছি—শত ধিক্ তোমা
পরের রমণী যেই পর প্রণয়িনী
কলুষ হৃদয়ে তারি কর উপাসনা?
পিতৃ-আত্মা আমি তব রাখ বাক্য মম
ভবনে ফিরিয়া যাও,—হেরিয়া তোমারে
কৃতান্ত-কবল ন্যস্ত জননী তোমার
শুষ্ক স্বর্ণলতা তব পত্নী অভাগিনী
এখনো বাঁচিতে পারে, নতুবা এ শোকে—
প্রিয়জন বিরহের দারুণ যন্ত্রণা
নর পিশাচের তব নির্ম্মম অন্তরে
নাহি হয় অনুভূত—এদারুণ শোকে
মাতা পত্নী ভ্রাতা ভগ্নী ত্যজিবে জীবন।
এত কষ্টে এত যত্নে জীবন দশায়
সৃজিয়া ছিলাম যেই সুখের সংসার
কুপুত্র আমার তুমি জন্মি মম কুলে
নির্বিবেকে করিতেছ শ্মশান তাহায়?
ধিক্ শত ধিক্ তোমা! পাষাণ অন্তরে
জাগে না কি একবার,পড়ে না কি মনে?
জননীর সে মমতা, ভগিনীর স্নেহ,
সোদরের ভালবাসা, পত্নীর প্রণয়!
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে এত যে যতনে
পালিলা জননী তব, মরিতে কি শেষে
তোমারি দংশনবিষে?

* * * *

এই বলিয়া প্রেতআত্মা যোগেশের শোকাতুরা মাতা, স্ত্রী, ভগিনী ও ভ্রাতার তৎকালিক চিত্র শূন্যে অ-ঙ্কিত করিয়া পুত্রকে দেখাইলেন। চিত্রগুলি প্রশংসার যোগ্য। শেষে একটি ঘর দেখাইলেন, তাহাতে যো-

গেশ বসিতেন, ও তাহাই তাঁহার পাঠ-গৃহ ছিল। কোন চিত্রদৃষ্টে যোগেশ অত্যধিক কাতর হন নাই, কিন্তু এই চিত্র দেখিয়া তিনি উন্মত্তর ন্যায় অতিশয় আক্ষেপোক্তি করিলেন। যোগে-শের সে যাতনা স্বাভাবিক হইয়াছে। পরে যোগেশ পিতাকে আপনার ভবি-ষ্যৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে প্রেত যোগেশকে যথোচিত তিরস্করণপূর্ব্বক সুপথে যাইতে অনুরোধ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন।

এই "পিতৃ-আত্মা" শীর্ষক সর্গের কল্পনা সুন্দর।

সন্ধ্যা হইল —

দিবাকর অস্তমান ধূসর বরণে
ধীরে ধীরে হইতেছে প্রকৃতি মলিন,
সুদূর পশ্চিমে যথা সীমান্তে ধরার
মিশিয়াছে নভস্তল—আরক্ত তপন
অনল গোলক মত নামিতেছে ধীরে।
তপনের নিম্নভাগে সুবর্ণের ছটা
পড়েছে ছড়ায়ে চূর্ণ জলদের গায়,
দিবাকরে সম্ভাষিয়ে লইতে যেন বা
স্বর্গের সুবর্ণ দ্বার খুলিছে অমর।
ধূসরবরণা মহী উচ্চতরু তার,
শূন্যভেদী গিরিশৃঙ্গ, সাগর তটিনী,
বিষণ্ণ ভাবেতে যেন মেলিয়া নয়ন
সেই রবি অস্তপানে রয়েছে চাহিয়া

এমন সময়ে ভৈরব পর্ব্বতের এক স্থান হইতে "রমণীর মন বিধি কেন এত প্রেমময়" ইত্যাদি শব্দে গীতধ্বনি উঠিল; গীত থামিলে যোগেশ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,

"রমণী হৃদয়ে প্রেম! কোথায় সে নারী?
পুরুষের তরে যেই প্রণয়ে কাতর?"

শেষ চিত্তের অত্যধিক আবেগবশতঃ উক্তরূপ দুই চারিটি কথা চীৎকার করিয়া বলিলেন, তাহা পর্ব্বতবাসিনী এক ভৈরবীর কাণে গেল। প্রোক্ত সঙ্গীত-গায়িকা তিনিই। সেই নির্জ্জনে যোগে-শের স্পষ্টোচ্চারিত কথাগুলি সহসা শুনিবা-মাত্র ভৈরবী তাহা মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ব্বপরি-চিত ব্যাধ তথায় আসিয়া, যোগে-শের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ও যোগে-শের অদৃশ্য হওয়ার কথা ভৈরবীকে বলিল; শুনিবামাত্র ভৈরবী তচ্ছ্রুত চীৎকার যোগেশকৃত সন্দেহ করিয়া ব্যাধকে তাহা বলায়, সে যোগেশের সন্ধানার্থ দৌড়িল। ভৈরবী তাঁহার বাসগৃহে—ভৈরবনামক শিবমূর্ত্তি-প্রতি-ষ্ঠিত এক মন্দিরে—প্রবেশ করিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি হইল, পৃথিবী অন্ধকারা-বৃতা—

ভীষণা যামিনী যেন দেহ বিস্তারিয়া
পড়িয়াছে শৈল অঙ্গে চাপিয়া হৃদয়।

এমন সময় যোগেশ ব্যাধকর্ত্তৃক ভৈরবী-সমীপে আনীত হইলেন। ভৈরবী কথায় কথায় যোগেশের দুঃখের কারণ জানিলেন। পরে যোগেশকে স্তোক দিবার জন্য গণনা করিয়া বলিলেন, যে যোগেশের পরজন্মে মন্দাকিনী তাঁহারই পরিণীতা হইবেন। অনন্তর যোগেশের পাপখণ্ডন নিমিত্ত অষ্টাহ ভৈরবদেবের

পূজা করিবেন ইত্যাদি বলিয়া, যোগেশও শবরকে স্ব স্ব স্থানে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে যোগেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভৈরবীর নিজের জীবনের অতীত ঘটনা মনে পড়িতে লাগিল; তাহার পর ভৈরবী যোগেশের বাটীতে তাঁহার সংবাদ স্বয়ং দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইলেন; আবার ভৈরবীব্রত ত্যাগ করিয়া আপনার বাটী ফিরিয়া যাইবার কথা কত ভাবিলেন।

ভৈরবীর নিকট হইতে আসিয়া যোগেশ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে ছিলেন। তাঁহার—

মস্তক-উপরে শূন্য অনন্ত বিস্তারি
ক্ষীরোদ সমুদ্র মত কিরণে ভাসিছে।
পদতলে শৈলমালা উঠিয়া পড়িয়া
নেত্র-পথ অতিক্রমি হয়েছে ধাবিত।

সহসা যোগেশ "মন্দাকিনী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সেই নিস্তব্ধ রাত্রিকালে সে চীৎকার চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সে প্রতিধ্বনি আমরা যেন এখনও শুনিতেছি—

শূন্য গগনের বক্ষে কঠোর শবদে
ছুটিল সে ভীমরব অনন্ত আকাশে।
সাগরে পড়িয়া রব তরঙ্গে তরঙ্গে
চলিল হিল্লোলে ভাসি অকূল সলিলে।
উঠিয়া পড়িয়া শৈলে প্রতিধ্বনি করি
ছুটিল সে ভীমরব সীমান্তে গিরির।
পল্লবে পল্লবে বৃক্ষে শিখায় তৃণের
জড়ায়ে জড়ায়ে রব ছুটিল প্রান্তরে।

এমন সময় ভাগ্য যোগেশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যোগেশকে বলিলেন, যে তাঁহার জীবন আর অধিক দিন স্থায়ী নহে, অতএব যোগেশকে আজীবন কষ্ট দিয়া তিনি তাঁহার একটি মাত্র অন্তিম বাসনা পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। যোগেশ কেবল মন্দাকিনীকে দেখিতে চাহিলেন, আর মন্দাকিনী কখনও তাঁহাকে স্মরণ করে কি না, তাহা ভাগ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভাগ্য বলিলেন, "মন্দা সে কথা কখনও ভাবে না, যদি সে কথার ছায়ামাত্র কখনও মন্দার মনে আইসে, তবে তখনই তাহা নিদ্রিতকর্ত্তৃক বক্ষবিক্ষিপ্ত সরীসৃপবৎ অপসৃত করে।" তখন ক্ষোভে যোগেশ যাহা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রণয়ের "নিঃস্বার্থতা" ছত্রে ছত্রে প্রতিপন্ন হইতেছে—

"তাও জানি" ধীরে ধীরে কহিলা যোগেশ
"শুধু অপ্রণয় নাহি করে মন্দাকিনী
ভুজঙ্গ ভাবিয়ে মোরে করে পরিহার।
তথাপি আমার এই নিভৃত অন্তরে
রেখেছি অনন্ত প্রেম মন্দাকিনী তরে।
সে ভাবে পাপাত্মা আমি—পাশব পিপাসা
করিবারে চরিতার্থ অনুরক্ত তায়।
সেই দুখ—সেই ঘৃণা—সেই লজ্জা মম,
সেই চিন্তা অহর্নিশি অন্তরে আমার
দংশিয়া শোণিতসহ রয়েছে মিশিয়া।
প্রতিদান নাহি দিল নহি দুখী তায়,
দুখী শুধু তার সেই দারুণ ঘৃণায়।
আশা তৃষ্ণা বিসর্জ্জিয়া সজল নয়নে
পদপ্রান্তে পড়ি যবে কহিলাম তায়;

"রূপের ভিখারি নই—নহি যৌবনের
দর্শন পর্শনে তবু নহি অভিলাষী
শুধু এই হৃদয়ের—হৃদয় ঢালিয়া
উন্মত্ত সাধক মত, নিঃস্বার্থ প্রণয়ে
বাসিয়াছিলাম ভাল অন্তরে অন্তরে।
আঁখির মিলনে কিম্বা মুখের বচনে
আশাতীত প্রতিদান হইত আমার।
তাও কি কঠিন এত?—ভাল একবার
কহ দেখি অন্তরেও ভালবাস কি না।"
কিন্তু যে উত্তর তার করিলা পাষাণী
মর্ম্মস্থলে আজো তাহা রয়েছে বিঁধিয়া।
এত যে কঠিন মন্দা আমি কিন্তু তারে
সুধাস্রোতস্বিনী বই ভাবি নাই কভু।

*　　*

তাহার পর যোগেশ মন্দাকিনীকে আবার দেখিতে চাহিলেন, ভাগ্য তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন; যোগেশ ঈষৎ হাসিয়া ভাগ্যকে "অদৃষ্টদেবতা" বলিয়া গালি দিলেন, তখন ভাগ্য উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,

"ভাগ্য আমি—চিরবৈরী যোগেশ তোমার
তোমা প্রতি সুপ্রসন্ন নহি আমি কভু;
তবে যে কহিনু এত ছলনা কেবল।
লাভালাভ ছলনায় নাহি কিছু মম
আমার স্বভাবি হেন ব্যথিতে দুখীরে।
তাই ভর্ৎসনার ছলে স্মৃতি পথে তব
জ্বালিয়া দিলাম তীব্র যন্ত্রণা তোমার।

*　　*

পরে ভাগ্য মন্দাকিনীর চিত্র দেখাইলেন; তাহাতে ভাগ্যের কষ্টদায়ক প্রবৃত্তি বিশেষ পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে। চিত্রটী আমরা উদ্ধৃত করিলাম, এই চিত্র ঈশান বাবুর কল্পনা শক্তির বিশেষ পরিচয় দিতেছে—

বামবাহু পতিকণ্ঠে করিয়া বেষ্টন
স্থাপিয়া দক্ষিণ কর পতির হৃদয়ে
হাস্য বিকসিত মুখে চাহি পতিপানে
করি মৃদু প্রেমালাপ চলে মন্দাকিনী।
যোগেশ সে চিত্র হেরি শিহরি উঠিয়া
ত্রস্তে সরাইয়া নিল পশ্চিমে বদন।
অমনি হাসিয়া ভাগ্য পশ্চিম প্রান্তরে
যোগেশের নেত্রপথে সে মূর্ত্তি স্থাপিলা।
পূরবে সরায়ে নিল যোগেশ বদন
হাসিয়া স্থাপিলা ভাগ্য সে চিত্র পূরবে।
উত্তরে যোগেশ ত্রস্তে স্থাপিলা নয়ন,
উচ্চে হাসি ভাগ্য চিত্র স্থাপিলা উত্তরে।
অবনত করি আঁখি চীৎকার করিয়া
কহিলা যোগেশ "আর চাহি না দেখিতে।"
"দেখ দেখ" কহি ভাগ্য পুনঃ নেত্রপথে
স্থাপিলা সে চিত্র হাস্য করি উচ্চৈঃস্বরে।
অবশেষে দুই করে আবরি নয়ন
যোগেশ পড়িল বসি "মন্দাকিনী" বলি।
তবু নাহি পরিত্রাণ, ভাবিলা যোগেশ
অঙ্গুলী তাহার যেন ধরি মন্দাকিনী
করিতেছে আকর্ষণ দেখিবার তরে।
পতি পত্নী দুইজনে দুই শ্রুতিমূলে
স্পর্শ করি ওষ্ঠ যেন কহে "দেখ দেখ।"
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া বাহু মুদিয়া নয়ন
সঞ্চালিয়া করদ্বয়—মর্ম্মভেদী স্বরে
কহিলা চীৎকার করি যোগেশ তখন
"কোথা ভাগ্য কোথা তুমি কৃপা করি মোরে
এ দৃশ্য নয়ন হ'তে কর অপসৃত।"
শূন্য হ'তে ভীম বাক্য হইল ধ্বনিত

"যোগেশ যে চিত্র আজ করিলে দর্শন
অনুক্ষণ স্মৃতি তব দগ্ধ হবে তায়
কি জাগ্রতে কি নিদ্রায় শোণিতের সহ
এই স্পর্শ মিশে রবে মর্ম্মস্থলে তব।
রুদ্ধ কর স্মৃতি—কিম্বা ভগ্ন কর হৃদি,
এ স্মৃতি জীবনে তব নহে অপনেয়।"

বলিতে বলিতে ছায়া আকাশে মিলাইয়া গেল, যোগেশ মূর্চ্ছিত হইলেন।

যোগেশ এইরূপ যন্ত্রণা পাইয়া জীবন কাটাইতে লাগিলেন। এক দিন—

চন্দ্রকরে বিভাসিত অকূল জলধি
ধূ—ধূ করিতেছে শুধু স্বপনের মত

যোগেশ যন্ত্রণায় হৃদয় ঢালিয়া সমুদ্রকে, অনন্তর জগৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক মর্ম্মব্যথা জানাইলেন। সমবেদনায় কবিও প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা বলিলেন; সে সকল অতি সুন্দর। যোগেশ কাতরোক্তি করিতেছেন, এমন সময় যোগেশের ছায়ারূপী পিতৃআত্মা পুত্রকে আবার দর্শন দিয়া অনেক অনুযোগ করিলেন। যোগেশ সে সব কথার উত্তর দিতে দিতে বলিলেন—

কিন্তু পিতঃ! পারি কই বুঝাতে হৃদয়ে!
হৃদয়ের ছায়া মম মুছিবার তরে,
কি যত্ন না করিয়াছি—বুঝাতে হৃদয়
কি ব্যথা না সহিয়াছি, দিবস যামিনী
পাপ পুণ্য দুই স্রোত উন্মত্ত তরঙ্গে
আছাড়িয়া বক্ষে মম গিয়াছে বহিয়া,
ঘাত প্রতিঘাতে চিত্ত হয়েছে বিক্ষত,
রক্তে রক্তে অন্তঃস্থল হয়েছে প্লাবিত,
কিন্ত কৈ পারিলাম মুছিতে সে ছায়া!
আর যে পারি না পিতঃ! আর যে সহে না,
এ প্রাণ বহিতে আর পারি না যে আমি;
দিবানিশি বুক যেন উঠিছে ফাটিয়া,
তবু যে জীবন নাহি হয় বহির্গত,
বহ্নিমুখী ভুজঙ্গিনী অনন্ত দংশনে
নিরন্তর দংশিতেছে অন্তর আমার।
এ জীবন আর আমি পারি না বহিতে
লহ—পিতঃ! পদপ্রান্তে তাপিত সন্তানে।

যোগেশের এবম্প্রকার কাতরোক্তিতে সে প্রেতহৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তিনি করে ধরিয়া যোগেশকে উঠাইলেন, ও যোগেশের জীবন নিতান্ত দুর্ব্বিসহ বুঝিয়া সেই দিনই কৃতান্তের নিকট পুত্রের মৃত্যু যাচ্ঞা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং আগামী কল্য প্রাতে যোগেশের দেহত্যাগ হইবে বলিলেন। অনন্তর পুত্রকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া ছায়া মিলাইয়া গেল।

যোগেশ মরিবেন—দারুণ যন্ত্রণা ফুরাইবে—শুনিয়া যোগেশের হর্ষ হইল। দিন ফুরাইল মনে করিয়া যোগেশ একবার আপনার জীবনের অতীত ঘটনাগুলি ভাবিলেন। তৎসমুদয় কবিত্বব্যঞ্জক। তাহার পর নানাপ্রকার বিভীষিকা যোগেশের নয়নগোচর হইতে লাগিল; তদ্দৃষ্টে যন্ত্রণা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি উন্মত্তের মত সৈকতে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এদিকে যোগেশ গৃহত্যাগ করিলে

কিয়দ্দিবস পরে তাঁহার মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন। নর্ম্মদা পিত্রালয়ে আসিয়া থাকিলেন। মন্দাকিনী নর্ম্মদার পিতৃ-দেশস্থা। তাঁহারা উভয়েই বালসখী, এবং শৈশব প্রণয় উভয়ের হৃদয়েই তুল্যরূপে বদ্ধমূল। একদিন মন্দাকিনী বিষবৃক্ষ পড়িতেছিলেন, এমন সময় নর্ম্মদা তথায় আসিলেন; তখন কবি দুইজনের রূপবর্ণন করিবার জন্য পূর্ব্বগামী গ্রন্থকারগণের অনুসরণ করিয়া সরস্বতীবন্দনা করিলেন; বন্দনাটি সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে কবির হৃদয়ের চিত্র দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমরা রূপবর্ণনামাত্র উদ্ধৃত করিতেছি—

দুইটী সুন্দরমূর্ত্তি—দুইটী যুবতী
যৌবন-উদ্যানে দুই বিকচকুসুম,
দুজনাই রূপবতী ; কিন্তু মন্দাকিনী
ঊষার নীহার-ধৌত প্রফুল্ল নলিনী
দলে দলে স্নিগ্ধকান্তি পড়েছে বিকাশি
অনুরাগে স্ফীত বক্ষঃ গরবে উন্মুখ।
সায়াহ্নের সূর্য্যমুখী নিষ্প্রভ নর্ম্মদা,
সঙ্কুচিত দলগুলি অবনত মুখ
হৃদয় পল্লবে ঢাকা সুষমা অস্ফুট।
মন্দাকিনী বসন্তের ফুল্ল সরোরুহ
নিদাঘের দগ্ধকান্তিকুমুদ নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী শরতের পূর্ণিমার শশী
হেমন্তের অস্তগামী শশাঙ্ক নর্ম্মদা।
মন্দাকিনী প্রেমিকের প্রথম স্বপন,
নর্ম্মদা আয়াসলব্ধ বিরহীর স্মৃতি।
মন্দাকিনী তেজস্বিনী জলজ লতিকা
নর্ম্মদা অবনী পৃষ্ঠে লম্বিতা ব্রততী।

* *

নর্ম্মদা আসিলে মন্দাকিনী সস্নেহে তাঁহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া অভাগিনীর দুরদৃষ্ট ভাবিতেছিলেন; সহসা যোগেশের শেষলিপি মনে পড়িল, অমনি মন্দাকিনীর কোমল হৃদয়ে গর্ব্বসংমিশ্রিত ক্রোধের শিখা প্রজ্বলিত হইল; মুখে "প্রতারক!" "যোগেশ এই কি তব নিরমল স্নেহ" কথাগুলি নির্গত হইল। নর্ম্মদা ভাবিলেন, যোগেশ তাঁহার এবম্বিধ দুর্দ্দশা করিয়া গৃহত্যাগী হওয়ায় মন্দাকিনী তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছেন। অমনি নর্ম্মদার চক্ষে তাঁহার আন্তরিকভাব ফুটিয়া উঠিল—

সেই দৃষ্টি তার যেন কহিল কাঁদিয়া
"মন্দাকিনি প্রাণেশেরে নিন্দিও না আর।"

নর্ম্মদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"কেন নিন্দ মন্দাকিনি প্রাণেশে আমার?
তাঁর কিবা অপরাধ? আমি অভাগিনী!
আমার অদৃষ্টে বিধি না লিখিলা সুখ।
নহিলে—তেমন পতি—মূর্ত্তিমান্ দেব
কেন হইবেন বাম অভাগিনী প্রতি।
অবশ্য আমারি কোন ছিল অপরাধ!
কি শাস্ত্র না প্রাণেশের আছিল অধীত?
কি গুণ নাথের মম না ছিল সজনী?
কত মিষ্ট কথাগুলি, কেমন স্বভাব,
মৃদু মন্দ গতি কিবা, কি মধুর মন!
দিনেকের তরে নাহি শুনিনু কখন,
একটি কঠোর কথা প্রাণেশের মুখে।
দাস দাসী প্রতিবাসী আত্মপরিজন
সকলেই প্রাণেশের কহিত সুযশ।

এত গুণবান্ ভগ্নি ! প্রাণেশ আমার
তাঁর নিন্দা অভাগীর বড় বাজে প্রাণে।”

মন্দাকিনী কত প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কত আদর করিলেন, আবার দুঃখিনী নর্ম্মদা বলিলেন—

ভবেশের মুখপানে আবার যখন
চেয়ে দেখি—মধুমাখা হাসিটুকু তার
ঢল ঢল চক্ষুঃ দুটি—আধ আধ কথা
ক্ষুদ্র হস্ত পদগুলি করি সঞ্চালিত
বাছার সে উল্লসিত মধুর ক্রীড়ন
হেরি মনে হয় নাথ জীবিত নিশ্চয়।
এত যে সুন্দর বাছা হইল আমার
না দেখি প্রাণেশ তায় ত্যজিবে কি প্রাণ ?

এই বলিয়া নর্ম্মদা কাঁদিয়া উঠিলেন। মন্দাকিনী, সর্ব্বস্ব পণ—প্রাণ পর্য্যন্ত পণ পূর্ব্বক অচিরে যোগেশের সন্ধান করিয়া দিবেন বলিয়া, তাঁহাকে শয়নগৃহে পাঠাইলেন। নর্ম্মদা চলিয়া গেলে মন্দাকিনী যে সকল স্বগত কথা বলিলেন, তাহা অত্যধিক বলিয়া উদ্ধৃত হইল না ; কিন্তু সে কথাগুলি না পড়িলে মন্দাকিনীকে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

মন্দাকিনী ও নর্ম্মদার এই কথোপকথনে গ্রন্থকার প্রণয়ের গভীরতা উজ্জ্বলবর্ণে, ছত্রে ছত্রে চিত্রিত করিয়াছেন।

নর্ম্মদা মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছেন, ইতিমধ্যে যোগেশের সংবাদ লইয়া ভৈরবী মন্দাকিনীর নিকট আসিলেন। রাত্রিকালে একটি নীরব প্রকোষ্ঠে তিনটী বিষণ্ণা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন ; একজনের বাসনা—

————যেন দুটি শূন্যপথে
বাহু প্রসারিয়া বক্ষে ধরে জড়াইয়া
নৈশ গগনের সেই গাঢ় অন্ধকার।
অথবা ভাবিছে যেন চিরিয়া হৃদয়
যন্ত্রণা ঢালিয়া দেয় তমসার অঙ্গে।

সে নর্ম্মদা ; অপর দুইজনের একজন,

————বসি অবনত মুখে
বিস্ফারিত দুনয়নে চাহি কক্ষতলে।
ভাবনায় অভিভূত ; যেন চিন্তাগুলি
আলেখ্যে অঙ্কিত তার নয়নের পথে।

সে মন্দাকিনী ; অপরা ভৈরবী। সকলে বসিয়া আছেন—কিছু পরে মন্দাকিনী যোগেশের দুরভিলাষসম্বন্ধে ভৈরবীকে অনেক কথা বলিলেন ; কথাগুলি তেজ ও গর্ব্বে নির্গত, তাহাতে মন্দার চরিত্র আরও পরিষ্কার বুঝা যায়। যোগেশ মন্দাকিনীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহারই জন্য দেশত্যাগী, তাহা মন্দাকিনীর মুখে এই প্রথম(?) শুনিয়া নর্ম্মদা মূর্চ্ছিতা হইলেন ; মন্দা ও ভৈরবী অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন ; নর্ম্মদা সংজ্ঞাপ্রাপ্তা হইলে মন্দাকিনী তাঁহাকে অনেক আদর করিতে লাগিলেন। পরে ভৈরবী, তাঁহার সঙ্গে স্বয়ং ভৈরবপর্ব্বতে যাইয়া যোগেশকে বাটী আনিবার কথা মন্দাকিনীকে বলিলেন, ও পাছে মন্দাকিনী যোগেশকে রূঢ় বলেন, তজ্জন্য সোদরার মত তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে মন্দাকে অনুরোধ করিলেন। তাহা শুনিবামাত্র সে গর্ব্বিতহৃদয় গর্ব্বে উছলিয়া উঠিল। মন্দাকিনী তেজে যাহা

উত্তর করিলেন,তৎসমুদয় কেবল যোগেশের প্রতি অমানুষিক সোদরস্নেহে পরিপূর্ণ। বাস্তবিক আমরা মন্দার এই গর্ব্বটুকু দেখিতে বড় ভাল বাসি।

ভেজের সহিত অনেক কথা বলিয়া গিয়া মন্দাকিনী স্বামীর নিকট ভৈরবীকথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত পূর্ব্বক, ভৈরবপর্ব্বতে তাঁহার সহিত যাইতে স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। মন্দার পতি কাতরা নর্ম্মদার প্রবোধার্থ পত্নীকে নর্ম্মদার নিকট থাকিতে বলিয়া স্বয়ং যোগেশকে আনিবার জন্য যাইতে উদ্যত হইলেন; তখন স্নেহময়ী মন্দাকিনী বলিলেন—

"আমিও যে সঙ্গে যাব,—তোমার কথায়
হয় ত যোগেশ নাহি ফিরিবে ভবনে,
আমি গিয়া নর্ম্মদার যন্ত্রণা কহিয়া,
ব্যাকুল করিয়া চিত্ত আনিব ফিরায়ে।
আজীবন আমি নাথ সোদরের মত
যোগেশে বেসেছি ভাল—সে যেন অবোধ
তা ব'লে কি আমি তায় করিব অস্নেহ!
এ টুকু না করি যদি নর্ম্মদার তরে
অমঙ্গল নর্ম্মদার ঘটে যদি নাথ,
সে আক্ষেপ চিরদিন রবে যে আমার!
যোগেশ শুধুই নাথ! সুহৃদ তোমার?
আমার সে প্রাণাধিকা নর্ম্মদার পতি
সে সম সোদর হ'তে অধিক স্নেহের।
আমি বিনা নর্ম্মদার এ সংসারে আর
কেহই যে নাই নাথ! সে যে আমা ছাড়া
নাহি জানে অন্য আর; জনক জননী
দারিদ্র্যে পীড়িত—নাহি চাহে
কন্যাপানে।
শ্বশুরের সম্বন্ধ ত গিয়াছে ঘুচিয়া,
অনাথিনী প্রাণেশ্বর নর্ম্মদা আমার।
আমি কি রহিব স্থির এ বিপদে তার!
চল নাথ সঙ্গে লয়ে, যাই দুইজনে।"

তাহাতে যুবা, মন্দাকিনীর অনুপস্থিতিতে নর্ম্মদাকে প্রবোধ দিবার কেহ না থাকা হেতু, দুঃখের আতিশয্যবশতঃ নর্ম্মদার আত্মহত্যার ভয় পত্নীকে দেখাইয়া, তাঁহাকে নর্ম্মদার নিকট থাকিতে পুনরায় অনুরোধ করিলেন। মন্দাকিনী হাসিয়া বলিলেন—

আমরণ সব ক্লেশ সহিবে রমণী
তথাপি পতির আশা থাকিতে তাহার
জীবন ত্যজিতে নাহি পারিবে কখন।

শেষ নর্ম্মদাকে গৃহে রাখিয়া পতি পত্নী উভয়েরই একত্রে যাওয়া স্থির হইল।

মন্দাকিনী ও তাঁহার পতি যোগেশকে বাটী ফিরাইয়া আনিতে ভৈরবীর সহিত যাত্রা করিলে, একদিন নর্ম্মদা চিন্তাযুক্ত মনে একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন—

কত চিন্তা কত ভয় কতই বাসনা
জাগিতে নিবিতেছিল অন্তরে তাহার।
আনমনে তুলি কর স্থাপিতে ললাটে
সিঁথির সিন্দূররেখা মুছিল তাহায়।
নিরখিতে অধঃপানে করতলে তার
পড়িল নয়ন সেই—হেরিলা সিন্দূর।
শিহরিত কলেবরে ছুটিয়া নর্ম্মদা
গেলা দর্পণের কাছে—হেরিলা ললাটে
চির যতনের তার সিন্দূরের রেখা,
হতাশ জীবনে তার শুধুই সান্ত্বনা,

পতিসুখ-বিরহিত অদৃষ্টে তাহার,
সধবার একমাত্র যে চিহ্ন আছিল
অযতনে আজ তাহা আপনি মুছিল।
"হতভাগিনীর ভাগ্য ভেঙেছে নিশ্চয়"
কহিয়া চীৎকার করি পড়িলা ভূতলে।

এমন সময় এক অপূর্ব্ব কামিনী মূর্ত্তি—এক অমরী,সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন—

তুষারের মত তার অঙ্গের বরণ
হিরণ্ময় দ্যুতি তায় পড়িছে ঝরিয়া,
কি এক গভীর গন্ধে অঙ্গ সুরভিত
প্রবেশিতে পূর্ণ হইল কক্ষ সে সৌরভে।

* *

মেঘে চন্দ্র-করে যেন একত্রে মিশিয়া
সেই স্বপ্নময় দেহ হয়েছে উদ্ভব।
আছে অঙ্গ—আছে মূর্ত্তি—কিন্তু যেন তায়
নাহি সত্তা শরীরের—শুধুই কিরণ
শূন্যময় দেহে তার উঠিছে উথলি।

এ প্রকার রূপকল্পনা কালিদাসের যোগ্য।

অমরী আসিয়া নর্ম্মদাকে বলিলেন, যে তাঁহার পতিনিষ্ঠা দেখিয়া ইন্দ্রাণী স্বহস্তে তাঁহার জন্য স্বর্গে লতাকুঞ্জ প্রস্তুত করিয়াছেন, তথায় তাঁহাকে যাইতে হইবে। নর্ম্মদা ভয়বিহ্বলিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু কোথা প্রাণেশ আমার," অমরী বলিলেন,"যোগেশ আর কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করিবেন, সতীর বৈধব্য নাই—তোমাকে যোগেশের মৃত্যুর পূর্ব্বেই অনন্তধামে যাইতে হইবে।" এই বলিয়া অমরী নর্ম্মদার করধারণ করিলেন—

প্রাণশূন্য দেহখানি অমনি তাহার
ঢলিয়া পড়িল ভূমে ছিন্ন লতা প্রায়।
আযৌবন পতিপদ পূজিতে পূজিতে,
আযৌবন সহি ক্লেশ পতি-অনাদরে,
অন্তিম জীবনে স্মরি পতির চরণ,
নর্ম্মদা ত্যজিল প্রাণ নবীন যৌবনে।

এ দিকে যোগেশেরও দিন ফুরাইল। যে রাত্রিতে যোগেশের পিতৃআত্মা পুত্রকে দ্বিতীয়বার দর্শন দিয়াছিলেন, সে রাত্রি পোহাইল। বেলা প্রথম প্রহর, মৃত্যুচরের প্রতীক্ষায় যোগেশ ঊর্দ্ধদৃষ্টে এক তরুতলে বসিয়া আছেন, এমন সময়—

সরাইয়া দুই করে জলদের দল,
ছায়াময় মূর্ত্তি এক হইল বাহির।

নিমেষমধ্যে মৃত্যুচর যোগেশের পার্শ্বে "ধূমখণ্ডমত" দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে নির্ব্বাণলাভ করিতে অনুরোধ পূর্ব্বক তাহার উপায় বলিলেন। যোগেশ উক্ত নির্ব্বাণ প্রাপ্তির কামনায় বসিলেন—

বসিলা যোগেশ জড় মূরতির মত
স্থিরভাবে বক্ষঃস্থলে বেষ্টি বাহুদ্বয়।
অচঞ্চল নেত্রদ্বয় হইল ক্রমশঃ,
শান্তির বিমল জ্যোতিঃ ভাতিল বদনে,
অন্তরের প্রাণময়ী গভীর বাসনা
ক্রমে ক্রমে চিত্ত হ'তে খসিতে লাগিল
হইতে লাগিল দৃষ্টি ক্রমে স্থিরতর।

এমন সময় নিস্পন্দ যোগেশের কর্ণে কামিনীকণ্ঠ-নির্গত "যোগেশ" "যোগেশ" শব্দ "তড়িতস্পর্শের" মত প্রবেশ করিল। যোগেশ শিহরিয়া দেখিলেন—

মন্দাকিনী শৈল-অঙ্গে উঠিছে ছুটিয়া।
শ্লথ কলেবর তার কাঁপিল বারেক,

তখনি সংযত চিত্ত করিয়া যোগেশ
মৃত্যুছায়া-পরিব্যাপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠাধরে
বিকাশিয়া ক্ষীণ হাসি দৃষ্টি সরাইলা।

মন্দাকিনী আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, " যোগেশ এ দশা তব আপনি করিলে!" শুনিয়া ভীমকণ্ঠে যোগেশ উত্তর করিলেন—

"বক্ষঃস্থল শূন্য আজ—নহিলে এখনি
দেখাতেম চিরি বুক হৃদয় আমার;
ত্যজিতে এ পাপ তৃষ্ণা, এই দীর্ঘকাল
এত যুঝিয়াছি আমি হৃদয়ের সনে,
নর-প্রকৃতিতে তত পারে না যুঝিতে।
ভাবিয়াছি কতবার তীক্ষ্ণ ছুরিকায়
চিরি বুক পাপতৃষ্ণা দিই ফেলাইয়া।
তথাপি সে পাপতৃষ্ণা পারিনি ত্যজিতে
ঘৃণায় লজ্জায় নিজে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
মরিয়াছি কতবার—প্রাণের ভিতর
ভীষণ-নরক-কুণ্ড ছিলাম ধরিয়া;
আজ সে পিপাসা মম গেছে শুকাইয়া
কিন্তু উন্মাদের জ্ঞান মরণের আগে!"

ইতিমধ্যে মন্দাকিনীর স্বামী ও ভৈরবী তথায় আসিলেন। তখন মন্দাকিনী কাতরকণ্ঠে আবার যোগেশকে বলিলেন—

———"আমিই পাষাণী
আমারি সে ভ্রম ভ্রাতঃ!—কিন্তু জ্ঞানহীনা
রমণী—ভগিনী তব—কনিষ্ঠা তোমার
অপরাধী যদি—কেন এ কঠিন পণ?
আপনা ভুলিলে ভাই—দেখ দেখি চেয়ে
এই কি যোগেশ—সেই জ্ঞানরত্নাকর?
এ কি বেশ,এ কি দেহ,এ কি ভাব তার
সে কান্তি—সে রূপ কোথা?—কোথা সে বরণ?
কোথা সে প্রকৃতি—কোথা সে জ্ঞান গম্ভীর?
সততার চিত্রপট—নীতির দর্পণ,
মহত্ত্বের লীলাভূমি—পুণ্যের আশ্রম,
গাম্ভীর্য্যের প্রতিকৃতি—করুণার খনি
বরদার প্রিয়সুত—কমলার আশা
যে যোগেশ, আজ তার এ দারুণ দশা?
কি দুঃখে—কিসের দুঃখ—কিসের অভাব
অমরে বঞ্চিত করি অপার্থিব ধনে
দিলা বিধি পূর্ণ করি জীবন যাহার
এ ক্ষুদ্র সংসারে ভাই কি অভাব তার?
প্রণয়ের আদ্যাশক্তি নর্ম্মদা যাহার
প্রণয়ে তাহার কেন আক্ষেপ আবার?
এস ভ্রাতঃ!—গৃহে চল—নর্ম্মদা আমার
কণ্ঠাগত প্রাণ আজ বিরহে তোমার।"

যোগেশ কষ্টে নাভিস্থল হইতে বায়ু টানিয়া পুনরায় মন্দাকিনীকে বলিলেন—

এ নহে প্রথম চিত্র—নহিলে যোগেশ
জিজ্ঞাসিত এই দণ্ডে তুমি কি অমরী!
নিরন্তর—নিশি দিন—নিশ্বাসের সহ
বহিত এ স্বপ্নময় প্রশ্ন অহরহঃ।
বিমুক্ত সে স্বপ্ন আজ—জাগ্রত নয়নে
দেখিতেছি দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে আমার,
অমরী না হ'বে যদি—কোন্ প্রয়োজনে
নরাধম যোগেশেরে এখনো করুণা?
যা কহিলে তুমি—সত্য,—একদিন মম
আছিল বিপুল তৃষ্ণা জীবনে আমার
বিদ্যা—ধন—যশ—মান—জ্ঞান—পুণ্য-তরে;

কিন্তু কেন ?—কোন সুখে ?—কোন
অভিলাষে ?—
যোগেশ সে রত্নরাশি করিত সঞ্চয় !
ভাবিতে কি—বুঝিতে কি—অথবা আবার
হেন প্রশ্নে যোগেশের কিবা অধিকার !
সে আশা—সে অভিলাষ—সেই সুখ দুঃখ
আমূল বিলুপ্ত আজ অন্তরে আমার
জীবতারা অস্তমান—নহিলে যোগেশ
প্রতিকৃতি নির্ম্মাইয়া মন্দাকিনী তব
পথে ঘাটে হাটে মাঠে পল্লীতে নগরে
ভারতের যথা তথা করিত স্থাপন।
নিম্নভাগে স্বর্ণাক্ষরে লিখিতাম তার
'মন্দাকিনী এ সংসারে নারী-রত্ন সার।'
তাহার পর—
"এস সখে" বলি কর প্রসারি যোগেশ
মন্দার পতির কর ধরিলা সাদরে,
"এ সংসারে সুখী তুমি তুমি ভাগ্যবান্
ধন, মান, জ্ঞান, যশ, পুণ্য স্তুপাকার
এই মন্দাকিনী সখে সংসারে তোমার !
প্রতিদ্বন্দ্বী—প্রতিযোগী—চির প্রতারক
আজীবন নরাধম যোগেশ তোমার,
কিন্তু এ অন্তিমকালে ক্ষমি অপরাধ
শৈশবের আলিঙ্গন দেহ একবার।"

অতঃপর মন্দাকিনী সস্নেহে অঞ্চলদ্বারা যোগেশের অশ্রু মুছাইয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, যোগেশ মন্দাকিনীর প্রতি করুণাবিস্ফারিত দৃষ্টে চাহিয়া আবার গম্ভীর নির্ঘোষে বলিলেন,

"মন্দাকিনি ! বৃথা যত্ন—বৃথা কেন ক্লেশ !
কাহারে ফিরিতে গৃহে কর অনুরোধ ?
যোগেশে ?—কি পরিতাপ ! এখনো
মমতা ?
দেখ চেয়ে দেহে মোর—কি আছে ইহায়
দেখিছনা—মৃত্যু ছায়া ব্যাপ্ত কলেবরে
দেখিছনা—অস্তমান নয়নের তারা
দেখিছনা—নাশারন্ধ্রে বহে প্রাণবায়ু
কি দেখিছ—কি ভাবিছ—ভীত কেন
হও ?
হতভাগ্য যোগেশের মরণই মঙ্গল।
কিন্তু এই ক্ষোভ মম—মমতা—তোমার
বহু বিলম্বেতে চিত্তে চালিলে আমার।
দেবী অবতীর্ণা সমা ভাবিতাম তোমা
অহঙ্কারী পাষাণী বলি ছিল কিন্তু জ্ঞান।
আজ বুঝিলাম দেবী—পাষাণপ্রতিমা
কিন্তু অন্তঃশীলাবাহী সে হৃদে করুণা।
মন্দাকিনি ! এই জ্যোতি ! দিনকত আগে
বিতরিতে যদি মম দগধ জীবনে
এভাবে যোগেশ আজ ত্যজিতনা প্রাণ !
যাও এবে—গৃহে যাও—নাহি প্রয়োজন
পাপাত্মার তরে ক্লেশ সহি অকারণ।
পতিসুখে আজীবন হ'ও সোহাগিনী
যোগেশের শেষ আশা এই মন্দাকিনি।
আমি চলিলাম—কিন্তু চলিলাম কোথা !
অহো ভবিষ্যৎ মম গাঢ় অন্ধকার।"

অনন্তর যোগেশ অশ্রু মুছিয়া অবনত মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তদ্দৃষ্টে মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে "যোগেশ" "যোগেশ" বলিয়া ডাকিলেন ; যোগেশ ইঙ্গিতদ্বারা তাঁহাদের অন্তরে যাইতে বলিলেন। তখন মন্দাকিনী বলিলেন, "যোগেশ ! নর্ম্মদা তব—ভবেশ তোমার" "আর কেন মন্দাকিনী" বলিয়া যোগেশ দূরে ধূমাকার প্রেতমূর্ত্তি দেখাইলেন। কিয়ৎকাল সকলে বিস্ময়ে সেদিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে যোগেশের দিকে ফিরিয়া দেখেন—

———যোগেশ তখন
বেষ্টিয়া হৃদয়ে বাহু সহাস্য বদনে
বসেছিলা স্থির দৃষ্টে মন্দাকিনী পানে।
স্থির নয়নের তারা ক্রমে যোগেশের
বিন্দু বিন্দু জ্যোতিঃহীন হইতে লাগিল।
ক্রমে স্থির নেত্রতারা হইয়া চঞ্চল
নয়নের দুই কোনে চলিয়া পড়িল।
অধরের ক্ষীণ হাসি গেল শুকাইয়া
চাহি মন্দাকিনী পানে হাসিতে হাসিতে
যোগেশ ত্যজিলা চির হতাশ জীবন।

হাসিতে হাসিতে সে প্রেমপয়োধি শুকাইল—যোগেশের দুঃখময় জীবন ফুরাইল। তাহার পর—

সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ "যোগেশ!" বলিয়া
মন্দাকিনী প্রাণশূন্য দেহ পানে তার
স্থিরদৃষ্টে কতক্ষণ রহিলা চাহিয়া।

*　　　　*

অবশেষে মন্দাকিনী ত্যজি গাঢ় শ্বাস
ধরিয়া পতির কর তুলিলা তাহায়।
পতিপত্নী দুইজনে ধরাধরি করি
শৈল হ'তে নামাইলা যোগেশের দেহ।
অনুচরগণে ডাকি কহিলা রচিতে
সাগরসৈকতে চিতা—শেষে দুইজনে
যোগেশের মৃতদেহ ধরাধরি করি
জলন্ত চিতার বক্ষে করিলা স্থাপন।
প্রজ্বলিত তৃণগুচ্ছ স্বহস্তে করিয়া
মন্দাকিনী দিলা বহ্নি যোগেশের মুখে।
হুহু শব্দে বহ্নিশিখা উঠিল জ্বলিয়া
আরক্তিয়া সিন্ধুনীর ভৈরব শিখর,
আরক্তিয়া শূন্যদেশ সৈকত ভূমির।
নির্নিমেষে মন্দাকিনী রহিলা চাহিয়া
ছায়াময়ী চিতাবক্ষে যোগেশের পানে।
অকূল জলধিতীরে—মন্দার সম্মুখে
চিতায় হইল ভস্ম যোগেশের দেহ।
স্বহস্তে সাগর হ'তে কলসি করিয়া
তুলিয়া সলিল মন্দা ঢালিল চিতায়।
নির্ব্বাপিত চিতানল হইল যখন
কলসি ফেলিয়া দূরে,—পতির হৃদয়ে
চাপিয়া বদন মন্দা কহিলা কাঁদিয়া
"চিতা যে নিবিল নাথ!"—এই সে প্রথম
যোগেশের তরে মন্দা অশ্রু বিসর্জ্জিলা।
"চিতা যে নিবিল নাথ!" বলিয়া আবার
মন্দাকিনী উচ্চৈঃস্বরে করিলা রোদন।

এই সকল কবিতা অমূল্যরত্নবিশেষ। আমরা বিলক্ষণ বলিতে পারি, এপ্রকার অমৃতময় কবিতা বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে অতি বিরল; বিশেষতঃ উপরোদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ের মধ্যে "চিতা যে নিবিল নাথ" এই চারিটি কথায় ঈশান বাবু যেরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত। এই চারিটি কথায় মন্দাকিনীর তৎকালীন হৃদয়ের ভাব যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, ক্ষুদ্র লেখক সহস্র পৃষ্ঠা লিখিয়াও তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সে চারিটী কথার ভাব কথায় সম্যক্ ব্যক্ত হইবার নহে; তাহার ভাষা মনের ভিতর—কথায় নাই। যিনি মন্দাকিনীর এই রোদন বুঝিয়াছেন, তিনি বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে বাঙ্গালা কাব্যপাঠে এত সুখ বুঝি শীঘ্র ঘটে নাই। আমরা আগামীবারে এই রোদনের অর্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

যোগেশ প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার আত্মার বামকরধারণপূর্ব্বক মৃত্যুচর "ধূমশিখা" মত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। তাহার অনতিউর্দ্ধে নর্ম্মদার আত্মা অমরীর করধারণপূর্ব্বক উঠিতেছিল—

বিদ্যুত-প্রতিম রশ্মি অঙ্গ হ'তে তার
ঝরিয়া সে শূন্যপথ উঠিছে উজলি।

মৃত্যুচর যোগেশকে নর্ম্মদার আত্মা দেখাইল। যোগেশ নর্ম্মদার প্রেতাত্মা দেখিয়া তাহার মৃত্যুর বিবরণ প্রভৃতি মৃত্যুচরকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত জানিলেন। তখন—

"নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!" বলি কাতর বচনে
যোগেশ ডাকিল উচ্চে—প্রতিধ্বনি তার
শূন্যধাম ভাসাইয়া হৈল প্রবাহিত।

*　　　　*

"প্রাণেশ! প্রাণেশ!" বলি কাতর বচনে
নর্ম্মদা চীৎকার করি ডাকিলা যোগেশে।
যোগেশ ডাকিলা পুনঃ "নর্ম্মদে! নর্ম্মদে!"
সেই দুই সম্বোধনে শূন্য উথলিল।

হইবে। আর একজন শষ্পোপরি লম্বমান কল্যাণীর মৃতদেহটাও ধরিতে যাইতেছিল—কিন্তু দেখিল যে, একটা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ—সন্ন্যাসী না হইলেও' হইতে পারে। আর ধরিল না। বালিকাকেও ঐরূপ বিবেচনায় ত্যাগ করিল। পরে তাহারা কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া দুইজনকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কল্যাণীর মৃতদেহ আর তাহার বালিকাকন্যা বিনারক্ষকে সেই বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিল।

প্রথমে শোকে অভিভূত এবং ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া মহেন্দ্র বিচেতনপ্রায় ছিলেন। কি হইতেছিল, কি হইল বুঝিতে পারেন নাই, বন্ধনের প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু দুই চারিপদ গেলে বুঝিলেন যে, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। কল্যাণীর শব পড়িয়া রহিল সৎকার হইল না, শিশুকন্যা পড়িয়া রহিল,এইক্ষণে তাহাদিগকে হিংস্র পশু খাইতে পারে, এই কথা মনোমধ্যে উদয় হইবামাত্র মহেন্দ্র দুইটি হাত পরস্পর হইতে বলে বিশ্লিষ্ট করিলেন, একটানে বাঁধন ছিঁড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে এক পদাঘাতে জমাদার সাহেবকে ভূমিশয্যা অবলম্বন করাইয়া একজন সিপাহীকে আক্রমণ করিতেছিলেন। তখন অপর তিনজন তাঁহাকে তিনদিক্ হইতে ধরিয়া পুনর্ব্বার বিজিত ও নিশ্চেষ্ট করিল। তখন দুঃখে কাতর হইয়া মহেন্দ্র সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, যে "আপনি একটু সহায়তা করিলেই এই পাঁচজন দুরাত্মাকে বধ করিতে পারিতাম।" সত্যানন্দ বলিলেন, "আমার এই প্রাচীন শরীরে বল কি—আমি যাঁহাকে ডাকিতেছিলাম, তিনি ভিন্ন আমার আর বল নাই—তুমি,যাহা অবশ্য ঘটিবে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিও না! আমরা এই পাঁচজনকে পরাভূত করিতে পারিব না। চল কোথায় লইয়া যায় দেখি। জগদীশ্বর সকল দিক্ রক্ষা করিবেন।" তখন তাহারা দুইজনে আর কোন মুক্তির চেষ্টা না করিয়া সিপাহীদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু আমি হরিনাম করিয়া থাকি—হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?" সত্যানন্দকে ভালমানুষ বলিয়া জমাদারের বোধ হইয়াছিল, সে বলিল, "তুমি হরিনাম কর, তোমায় বারণ করিব না। তুমি বুড়া ব্রহ্মচারী, বোধ হয় তোমায় খালাসের হুকুমই হইবে, এই বদমাস ফাঁসি যাইবে।" তখন ব্রহ্মচারী মৃদু মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন।

ধীর সমীরে, যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।
ইত্যাদি

নগরে পৌঁছিলে তাহারা কোতয়ালের নিকট নীত হইল। কোতয়াল রাজসরকারে এত্তালা পাঠাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী ও মহেন্দ্রকে সম্প্রতি ফাটকে রাখি-

লেন। সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত, সে প্রায় আর বাহির হইত না, কেন না বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন। নিয়মের দিনে আর অনিয়মের দিনে তুলনা কর।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কারাগারমধ্যে বদ্ধ সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে বলিলেন, "আজ অতি আনন্দের দিন। কেন না আমরা কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি। বল হরে মুরারে!" মহেন্দ্র কাতরস্বরে বলিল, "হরে মুরারে!"

সত্য। কাতর কেন বাপু? তুমি এ মহাব্রত গ্রহণ করিলে, এ স্ত্রীকন্যা ত অবশ্য ত্যাগ করিতে। আর ত কোন সম্বন্ধ থাকিত না।

মহে। ত্যাগ এক, যমদণ্ড আর। যে শক্তিতে আমি এ ব্রত গ্রহণ করিতাম, সে শক্তি আমার স্ত্রী কন্যার সঙ্গে গিয়াছে।

সত্য। শক্তি হইবে। আমি শক্তি দিব। মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, মহাব্রত গ্রহণ কর।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিল যে "আমার স্ত্রী কন্যাকে শৃগালে কুক্কুরে খাইতেছে—আমাকে কোন ব্রতের কথা বলিবেন না।"

সত্য। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। সন্তানগণ তোমার স্ত্রীর সৎকার করিয়াছে—কন্যাকে লইয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিয়াছে।

মহেন্দ্র বিস্মিত হইল, বড় বিশ্বাস করিল না, বলিল, "আপনি কি প্রকারে জানিবেন? আপনি ত বরাবর আমার সঙ্গে।"

সত্য। আমরা মহাব্রতে দীক্ষিত। দেবতারা আমাদিগের প্রতি দয়া করেন। আজি রাত্রেই তুমি সে সম্বাদ পাইবে। আজি রাত্রেই তুমি এ কারাগার হইতে মুক্ত হইবে।

মহেন্দ্র কোন কথা কহিল না। সত্যানন্দ বুঝিলেন, যে মহেন্দ্র বিশ্বাস করিতেছে না। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "বিশ্বাস করিতেছ না—পরীক্ষা করিয়া দেখ।" এই বলিয়া সত্যানন্দ কারাগারের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন। কি করিলেন, অন্ধকারে মহেন্দ্র কিছু দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কাহার সঙ্গে কথা কহিলেন ইহা বুঝিলেন। ফিরিয়া আসিলে, মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি পরীক্ষা?"

সত্য। তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

এই কথা বলিতে বলিতে কারাগারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। একব্যক্তি ঘরের ভিতর আসিয়া বলিল,

"মহেন্দ্র সিংহ কাহার নাম?"

মহেন্দ্র বলিল "আমার নাম।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার খালাষের হুকুম হইয়াছে—যাইতে পার।"

মহেন্দ্র প্রথমে বিস্মিত হইল—পরে মনে করিল মিথ্যা কথা। পরীক্ষার্থ বাহির হইল। কেহ তাহার গতিরোধ করিল না। মহেন্দ্র রাজপথ পর্য্যন্ত চলিয়া গেল।

এই অবসরে আগন্তুক সত্যানন্দকে বলিল, "মহারাজ! আপনিও কেন যান না? আমি আপনারই জন্য আসিয়াছি।"

সত্য। তুমি কে? ধীরানন্দ গোঁসাই?

ধীর। আজ্ঞা হাঁ।

সত্য। প্রহরী হইলে কি প্রকারে?

ধীর। ভবানন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমি নগরে আসিয়া আপনারা এই কারাগারে আছেন শুনিয়া এখানে কিছু ধুতুরা মিশান সিদ্ধি লইয়া আসিয়াছিলাম। যেখাঁ সাহেব পাহারায় ছিলেন, তিনি তাহা সেবন করিয়া ভূমিশয্যায় নিদ্রিত আছেন। এই জামা জোড়া পাকড়ী বর্ষা যাহা আমি পরিয়া আছি, সে তাঁহারই।

সত্য। তুমি উহা পরিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া যাও। আমি এরূপে যাইব না।

ধীর। কেন—সে কি?

সত্য। আজ সন্তানের পরীক্ষা।

মহেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফিরিলে যে?"

মহেন্দ্র। আপনি নিশ্চিত সিদ্ধ পুরুষ। কিন্তু আমি আপনার সঙ্গ ছাড়িয়া যাইব না।

সত্য। তবে থাক। উভয়েই আজ রাত্রে অন্যপ্রকারে মুক্ত হইব।

ধীরানন্দ বাহিরে গেল। সত্যানন্দ ও মহেন্দ্র কারাগারমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারীর গান অনেকে শুনিয়াছিল। অন্যান্য লোকের মধ্যে জীবানন্দের কাণে সে গান গেল। মহেন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইবার তাহার প্রতি আদেশ ছিল, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। পথিমধ্যে একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে সাতদিন খায় নাই, রাস্তার ধারে পড়িয়াছিল। তাহার জীবনদান জন্য জীবানন্দ দণ্ড দুই বিলম্ব করিয়াছিলেন। মাগীকে বাঁচাইয়া তাহাকে অতি কদর্য্য ভাষায় গালি দিতে দিতে (বিলম্বের অপরাধ তার) এখন আসিতেছিলেন। দেখিলেন, প্রভুকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে—প্রভু গান গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন।

জীবানন্দ মহাপ্রভু, সত্যানন্দের সঙ্কেত সকল বুঝিতেন। "কুরু মম বচনং সত্বররচনং"—কি করিতে হইবে?

"ধীর সমীরে, যমুনাতীরে,
বসতি বনে বনমালী।"

নদীর ধারে কেহ আছে না কি? ভাবিয়া চিন্তিয়া, জীবানন্দ নদীর ধারে ধারে চলিলেন। জীবানন্দ দেখিয়াছিলেন, যে ব্রহ্মচারী স্বয়ং মুসলমানকর্ত্তৃক নীত হইতেছেন। এস্থলে, ব্রহ্মচারীর উদ্ধারই তাঁহার প্রথম কাজ। কিন্তু জীবানন্দ ভাবিলেন, "এ সঙ্কেতের সে অর্থ নয়। তাঁর জীবনরক্ষার অপেক্ষাও তাঁহার আজ্ঞাপালন বড়—এই কথাই তাঁহার কাছে প্রথম শিখিয়াছি। অতএব তাঁহার আজ্ঞাপালনই করিব।"

নদীর ধারে ধারে জীবানন্দ চলিল। যাইতে যাইতে সেই বৃক্ষতলে নদীতীরে দেখিল যে এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ আর এক জীবিতা শিশুকন্যা। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যাকে জীবানন্দ একবারও দেখেন নাই। মনে করিলেন হইলে হইতে পারে যে ইহারাই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা। কেন না প্রভুর সঙ্গে মহেন্দ্রকে দেখিলাম, তাহার স্ত্রী কন্যা দেখিলাম না। যাহা হউক মাতা মৃতা, কন্যাটী জীবিতা। আগে ইহার রক্ষাবিধান করা চাই—নহিলে বাঘ ভালুকে খাইবে। ভবানন্দ ঠাকুর এইখানেই কোথায় আছেন, তিনি স্ত্রীলোকটির সৎকার করিবেন, এই ভাবিয়া জীবানন্দ বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চলিলেন।

মেয়ে কোলে করিয়া জীবানন্দ গোঁসাই সেই নিবিড় জঙ্গলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। জঙ্গল পার হইয়া একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামখানির নাম ভৈরবীপুর। লোকে বলিত ভরুইপুর। ভরুইপুরে দুই চারি ঘর সামান্য লোকের বাস, নিকটে আর বড় গ্রাম নাই, গ্রাম পার হইয়াই আবার জঙ্গল। চারিদিকে জঙ্গল—জঙ্গলের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু গ্রামখানি বড় সুন্দর। কোমলতৃণাবৃত গোচারণভূমি, কোমল শ্যামলপল্লবযুক্ত আম, কাঁটাল, জাম, তালের বাগান, মধ্যে মধ্যে নীলজলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ দীর্ঘিকা, তাহাতে জলে বক, হংস, ডাহুক; তীরে কোকিল, চক্রবাক; কিছুদূরে ময়ূর উচ্চরবে কেকাধ্বনি করিতেছে। গৃহে গৃহে, প্রাঙ্গণে গাভী, গৃহের মধ্যে মরাই, কিন্তু আজ কাল দুর্ভিক্ষে ধান নাই—কাহারও চালে একটি ময়নার পিঁজরে, কাহারও দেয়ালে আলিপনা—কাহারও উঠানে শাকের ভূমি। সকলই দুর্ভিক্ষপীড়িত, কৃশ, শীর্ণ, সন্তাপিত। তথাপি এই গ্রামের লোকের একটি শ্রীছাঁদ আছে—জঙ্গলে অনেক রকম মনুষ্যখাদ্য জন্মে, এজন্য জঙ্গল হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া সেই গ্রামবাসীরা প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

একটি বৃহৎ আম্রকাননমধ্যে একটি ছোট বাড়ী। চারিদিকে মাটীর প্রাচীর চারিদিকে চারিখানি ঘর। গৃহস্থের গোরু আছে, ছাগল আছে, একটা ময়ূর আছে, একটা ময়না আছে, একটা টিয়া

আছে। একটা বাঁদর ছিল,কিন্তু সেটাকে আর খাইতে দিতে পারে না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। একটা ঢেঁকি আছে, বাহিরে খামার আছে, উঠানে লেবু গাছ আছে, গোটাকতক মল্লিকা যুঁইয়ের গাছ আছে, কিন্তু এবার তাতে ফুল নাই। সব ঘরের বারাণ্ডায় একটা একটা চরকা আছে; কিন্তু বাড়ীতে বড় লোক নাই। জীবানন্দ মেয়ে কোলে করিয়া সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই জীবানন্দ একটা ঘরের বারাণ্ডায় উঠিয়া একটা চরকা লইয়া ঘেনর ঘেনর আরম্ভ করিলেন। সে ছোট মেয়েটী কখন চরকার শব্দ শুনে নাই, বিশেষতঃ মা ছাড়া হইয়া অবধি কাঁদিতেছে, চরকার শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়া আরও উচ্চ সপ্তকে উঠিয়া কান্দিতে আরম্ভ করিল। তখন ঘরের ভিতর হইতে একটি ১৭।১৮ বৎসরের মেয়ে বাহির হইল। মেয়েটি বাহির হইয়াই দক্ষিণ গণ্ডে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী সন্নিবিষ্ট করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। "এ কি এ, দাদা চরকা কাটো কেন, মেয়ে কোথা পেলে, দাদা তোমার মেয়ে হয়েছে না কি—কোথায় মেয়ে হলো?"

জীবানন্দ মেয়েটী আনিয়া সেই যুবতীর কোলে দিয়া তাহাকে কীল মারিতে উঠিলেন, বলিলেন, "বাঁদরী, আমার আবার মেয়ে, আমাকে কি হেঁজিপেঁজি পেলি না কি, ঘরে দুধ আছে?"

তখন সে যুবতী বলিল, "দুধ আছে বইকি, খাবে।"

জীবানন্দ বলিল, "হ্যাঁ খাবো।"

তখন সে যুবতী ব্যস্ত হইয়া দুধ জ্বাল দিতে গেল। জীবানন্দ ততক্ষণ চরকা ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিলেন। মেয়েটী সেই যুবতীর কোলে গিয়া আর কাঁদে না। মেয়েটী কি ভাবিয়া ছিল বলিতে পারি না—বোধ হয় এই যুবতীকে ফুল্লকুসুমতুল্য সুন্দরী দেখিয়া মা মনে করিয়াছিল। বোধ হয় উননের তাপের আঁচ মেয়েটীকে একবার লাগিয়াছিল তাই সে একবার কাঁদিল। কান্না শুনিবামাত্র জীবানন্দ বলিলেন "ও নিমি ও পোড়ার মুখি ও হনুমানি তোর এখনও দুধ জ্বাল হলো না।" নিমি বলিল, "হয়েছে।" এই বলিয়া সে পাথর বাটীতে দুধ ঢালিয়া জীবানন্দের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। জীবানন্দ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "ইচ্ছা করে যে এই তপ্ত দুধের বাটী তোর গায়ে ঢালিয়া দিই—তুই কি মনে করেছিস্ আমি খাব না কি?"

নিমি জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কে খাবে?"

জীবা। ঐ মেয়েটা খাবে দেখছিস্ নে, ঐ মেয়েটাকে দুধ খাওয়া।

নিমি তখন আসনপিড়ি হইয়া বসিয়া মেয়েকে কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক লইয়া তাহাকে দুধ খাওয়াইতে বসিল। সহসা তাহার চক্ষু হতে ফোঁটাকতক জল

পড়িল। তাহার একটি ছেলে হইয়া মরিয়া গিয়াছিল, তাহারই ঐ ঝিনুক ছিল। নিমি তখনই হাত দিয়া জল মুছিয়া হাসিতে হাসিতে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল,

"হ্যাঁ দাদা, কার মেয়ে দাদা?"

জীবানন্দ বলিল, "তোর কিরে পোড়ার মুখী।"

নিমি বলিল, "আমায় মেয়েটী দেবে।"

জীবানন্দ বলিল, "তুই মেয়ে নিয়ে কি কর্‌বি।"

নিমি। "আমি মেয়েটীকে দুধ খাওয়াব, কোলে করিব, মানুষ করিব—" বল্‌তে বল্‌তে ছাই পোড়ার চক্ষের জল আবার আসে, আবার নিমি হাত দিয়া মুছে, আবার হাসে।

জীবানন্দ বলিল, "তুই নিয়ে কি কর্‌বি, তোর কত ছেলে মেয়ে হবে।"

নিমি। তা হয় হবে, এখন এ মেয়েটী দাও, এর পর না হয় নিয়ে যেও।

জীবা। তা নে, নিয়ে মরগে যা। আমি এসে মধ্যে মধ্যে দেখে যাব। উটি কায়েতের মেয়ে, আমি চল্‌লুম এখন—

নিমি। সে কি দাদা, খাবে না! বেলা হয়েছে যে, আমার মাথা খাও, দুটি খেয়ে যাও।

জীবা। তোর মাথাও খাব, আবার দুটি খাব, দুই ত পেরে উঠবো না দিদি। মাথা রেখে দুটি ভাত দে।

নিমি তখন মেয়ে কোলে করিয়া ভাত বাড়িতে ব্যতিব্যস্ত হইল।

নিমি পিঁড়ি পাতিয়া জলছড়া দিয়া, জায়গা মুছিয়া মল্লিকাফুলের মত পরিষ্কার অন্ন, কাঁচা কলাইয়ের দাল, জঙ্গলে ডুমুরের দালনা, পুকুরের রুইমাছের মুড়োর ঝোল, এবং দুগ্ধ আনিয়া জীবানন্দকে খাইতে দিল। খাইতে বসিয়া জীবানন্দ বলিলেন,

"নিমাই দিদি, কে বলে মন্বন্তর, তোদের গাঁয়ে বুঝি মন্বন্তর আসে নি?

নিমি বলিল, "মন্বন্তর আস্‌বে না কেন, বড় মন্বন্তর, তা আমরা দুটী মানুষ ঘরে যা আছে, লোককে দি থুই ও আপনারা খাই। আমাদের গাঁয়ে বৃষ্টি হইয়াছিল, মনে নাই?—তুমি যে সেই বলিয়া গেলে, বনে বৃষ্টি হয়। তা আমাদের গাঁয়ে কিছু কিছু ধান হয়েছিল—আর সবাই নগরে বেচে এলো—আমরা বেচি নাই।"

জীবানন্দ বলিল, "বোনাই কোথা?"

নিমি ঘাড় হেঁট করিয়া চুপি চুপি বলিল, "সের দুই তিন চাল লইয়া কোথায় বেরিয়েছেন, কে নাকি চাল চেয়েছে।"

এখন জীবানন্দের অদৃষ্টে এরূপ আহার অনেক কাল হয় নাই। জীবানন্দ আর বৃথা বাক্যব্যয়ে সময় নষ্ট না করিয়া গপ্‌গপ্‌ টপ্‌টপ্‌ সপ্‌সপ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে অন্নব্যঞ্জনাদি শেষ করিলেন। এখন শ্রীমতী

নিমাইমণি শুধু আপনার ও স্বামীর জন্য রাঁধিয়াছিলেন, আপনার ভাতগুলি দাদাকে দিয়াছিলেন, পাথর শূন্য দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া স্বামীর অন্নব্যঞ্জনগুলি আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। জীবানন্দ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সে সকলই উদরনামক বৃহৎ গর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। তখন নিমাইমণি বলিল, "দাদা আর খাবে কিছু?"

জীবানন্দ বলিল, "আর কি আছে?"

নিমাইমণি বলিল, "একটা পাকা কাঁটাল আছে।"

নিমাই সে পাকা কাঁটাল আনিয়া দিল—বিশেষ কোন আপত্তি না করিয়া জীবানন্দ গোস্বামী কাঁটালটিকেও সেই ধ্বংসপুরে পাঠাইলেন। তখন নিমাই হাসিয়া বলিল,

"দাদা আর কিছু নাই।"

দাদা বলিলেন, "তবে যা, আর একদিন আসিয়া খাইব।"

অগত্যা নিমাই জীবানন্দকে আঁচাইবার জল দিল। জল দিতে দিতে নিমাই বলিল, "দাদা, আমার একটা কথা রাখিবে?"

জীবা। কি?

নিমি। আমার মাথা খাও।

জীবা। কি বল্ না পোড়ার মুখী।

নিমি। কথা রাখ্‌বে?

জীবা। কি আগে বল্ না।

নিমি। আমার মাথা খাও পায়ে পড়ি।

জীবা। তোর মাথাও খাই—তুই পায়েও পড়, কিন্তু কি বল?"

নিমাই তখন এক হাতে আর এক হাতের আঙুলগুলি টিপিয়া, ঘাড় হেঁট করিয়া, সেইগুলি নিরীক্ষণ করিয়া, একবার জীবানন্দের মুখপানে চাহিয়া একবার মাটীপানে চাহিয়া, শেষ মুখ ফুটিয়া বলিল, "একবার বউকে ডাক্‌বো?"

জীবানন্দ আঁচাইবার গাড়ু তুলিয়া নিমির মাথায় মারিতে উদ্যত; বলিলেন, "আমার মেয়ে ফিরিয়ে দেও, আর আমি একদিন তোর চাল দাল ফিরিয়া দিয়া যাইব। তুই বাঁদরী, তুই পোড়ারমুখী, তুই যা না বলবার তাই আমাকে বলিস্।"

নিমাই বলিল, "তা হউক, আমি বাঁদরী, আমি পোড়ার মুখী একবার বৌকে ডাক্‌বো?"

জীবা। আমি চল্লুম, এই বলিয়া জীবানন্দ হন্‌হন্ করিয়া বাহির হইয়া যায়,—নিমাই গিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, দ্বারের কপাট রুদ্ধ করিয়া দ্বারে পীঠ দিয়া বলিল, "আগে আমায় মেরে ফেল, তবে তুমি যাও। বৌয়ের সঙ্গে না দেখা করে তুমি যেতে পারিবে না।"

জীবানন্দ বলিল, যে "আমি কত লোক মারিয়া ফেলিয়াছি তা তুই জানিস্?"

এইবার নিমি রাগ করিল, "বলিল, বড় কীর্ত্তিই করেছ—স্ত্রীত্যাগ কর্‌বে, লোক মার্‌বে, আমি তোমায় ভয়

কর্‌বো, তুমিও যে বাপের সন্তান, আমিও সেই বাপের সন্তান—লোক মারা যদি বড়াইয়ের কথা হয়, আমায় মেরে বড়াই কর।”

জীবানন্দ হাসিল, “ডেকে নিয়ে আয়—কোন পাপিষ্ঠকে ডেকে নিয়ে আস্‌বি নিয়ে আয়, কিন্তু দেখ্ ফের যদি এমন কথা বল্‌বি, তোকে কিছু বলি না বলি সেই শালার ভাই শালাকে মাথা মুড়াইয়া দিয়া ঘোল ঢেলে উল্টা গাধায় চড়িয়ে দেশের বার্ করে দিব।”

নিমি মনে মনে বলিল, “আমিও তা হলে বাঁচি।” এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে নিমি বাহির হইয়া গেল, নিকটবর্ত্তী এক পর্ণকুটীরে গিয়া প্রবেশ করিল। কুটীরমধ্যে শতগ্রন্থিযুক্ত বসনপরিধানা রুক্ষকেশা এক স্ত্রীলোক বসিয়া চরকা কাটিতেছিল। নিমাই গিয়া বলিল, “বৌ শিগ্‌গির শিগ্‌গির!” বৌ বলিল, “সিগ্‌গির কি লো! ঠাকুরজামাই তোকে মেরেছে নাকি, ঘায়ে তেল মাখিয়ে দিতে হবে?”

নিমি। কাছাকাছি বটে, তেল আছে ঘরে?

সে স্ত্রীলোক তৈলের ভাণ্ড বাহির করিয়া দিল। নিমাই ভাণ্ড হইতে তাড়াতাড়ি অঞ্জলি অঞ্জলি তৈল লইয়া সেই স্ত্রীলোকের মাথায় মাখাইয়া দিল। তাড়াতাড়ি একটা চলনসই খোঁপা বাঁধিয়া দিল। তার পর তাহাকে এক কীল মারিয়া বলিল, “তোর সেই ঢাকাই কোথা আছে বল।” সে স্ত্রীলোক কিছু বিস্মিতা হইয়া বলিল, “কি লো তুই কি খেপেছিস্ নাকি, না তোর কেউ জুটেছে?”

নিমাই দুম্ করিয়া তাহার পিঠে এক কীল মারিল, বলিল, “শাড়ী বের কর, দুয়ের একটা হয়েছে।”

রঙ্গ দেখিবার জন্য সে স্ত্রীলোক শাড়ীখানি বাহির করিল। রঙ্গ দেখিবার জন্য, কেন না এত দুঃখেও রঙ্গ দেখিবার যে বৃত্তি তাহা তাহার হৃদয়ে লুপ্ত হয় নাই। নবীন যৌবন; ফুল্লকমলতুল্য তাহার নববয়সের সৌন্দর্য্য তৈল বিনা—বেশ বিনা—আহার বিনা—সেই প্রদীপ্ত, অননুমেয় সৌন্দর্য্য সেই শতগ্রন্থিযুক্ত বসনমধ্যে লুক্কায়িত। বর্ণে ছায়ালোকের চাঞ্চল্য, নয়নে কটাক্ষ, অধরে হাসি, হৃদয়ে ধৈর্য্য। আহার নাই—তবু শরীর লাবণ্যময়, বেশ ভূষা নাই, তবু সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। যেমন মেঘমধ্যে বিদ্যুৎ, যেমন মনোমধ্যে প্রতিভা, যেমন জগতের শব্দমধ্যে সঙ্গীত, যেমন মরণের ভিতর সুখ, তেমনি সে রূপরাশিতে অনির্ব্বচনীয় কি ছিল! অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য, অনির্ব্বচনীয় উন্নতভাব, অনির্ব্বচনীয় প্রেম, অনির্ব্বচনীয় ভক্তি। সে হাসিতে হাসিতে (কেহ সে হাসি দেখিল না,) হাসিতে হাসিতে সেই ঢাকাই শাড়ী বাহির করিয়া দিল। বলিল, “কি লো নিমি, কি হইবে?” নিমাই বলিল, “তুই পর্‌বি?” সে

বলিল, "আমি পরিলে কি হইবে?" তখন নিমাই তাহার কমনীয় কণ্ঠে আপনার কমনীয় বাহু বেষ্টন করিয়া বলিল, "দাদা এসেছে, তোকে যেতে বলেছে।" সে বলিল, "আমায় যেতে বলেছেন। ত ঢাকাই শাড়ী কেন, চল না এমনি যাই।" নিমাই তার গালে এক চড় মারিল—সে নিমাইয়ের কাঁধে হাত দিয়া তাহাকে কুটীরের বাহির করিল। বলিল, "চল এই ন্যাকড়া পরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসি।" কিছুতেই কাপড় বদলাইল না, অগত্যা নিমাই রাজি হইল। নিমাই তাহাকে সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ীর দ্বার পর্য্যন্ত গেল, গিয়া তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিকবয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন গ্রন্থিযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন গৃহ আলো হইল। বোধ হইল পাতায় ঢাকা কোন গাছে কত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন কোথায় গোলাবজলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। যেন কে জলন্ত অগ্নিতে ধুপ ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে ত দেখিতে পাইল না। তার পর দেখিল, গৃহপ্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাঁহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে তাহার চক্ষে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন, যে তাহার চক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাত হাতে লইয়া বলিল, "ছি, কাঁদিও না, আমি জানি তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না—তুমি যেপ্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"

জীবানন্দ মাথা তুলিয়া চক্ষু মুছিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"শান্তি! তোমার এ শতগ্রন্থি মলিনবস্ত্র কেন? তোমার ত ধনের অভাব নাই, সে বিষয়ে ত আমি তোমাকে কষ্ট দিই না।"

শান্তি বলিল, "তুমি যে ধন দিয়াছ, তাহা তোমারই জন্য আছে। আমি টাকা লইয়া কি করিতে হয় তাহা জানি না, যখন তুমি আসিবে, যখন তুমি আমাকে আবার গ্রহণ করিবে—"

জীবা। গ্রহণ করিব—শান্তি? আমি কি তোমায় ত্যাগ করিয়াছি?

শান্তি। ত্যাগ নহে—যবে তোমার ব্রত সাঙ্গ হইবে, যবে আবার আমায় ভালবাসিবে—

কথা শেষ না হইতেই জীবানন্দ শান্তিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শেষে জীবানন্দ বলিল,

"কেন দেখা করিলাম!"

শান্তি। কেন করিলে—তোমার ত ব্রত ভঙ্গ করিলে?

জীবা। ব্রতভঙ্গ হউক—প্রায়শ্চিত্ত আছে। তাহার জন্য ভাবি না, কিন্তু তোমায় দেখিয়া ত আর ফিরিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমি এই জন্য নিমাইকে বলিয়াছিলাম যে, দেখায় কাজ নাই। তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। একদিকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎসংসার একদিকে ব্রত হোম যাগ যজ্ঞ; সবই একদিকে, আর একদিকে তুমি। একা তুমি। আমি সকল সময়ে বুঝিতে পারি না যে, কোন দিক্ ভারি হয়। দেশ ত শান্তি, দেশ লইয়া আমি কি করিব? দেশের এক কাঠা ভুঁই পেলে তোমায় লইয়া আমি স্বর্গ প্রস্তুত করিতে পারি, আমার দেশে কাজ কি? দেশের লোকের দুঃখ, যে তোমা হেন স্ত্রী পাইয়া ত্যাগ করিল—তাহার অপেক্ষা দেশে আর কে দুঃখী আছে? যে তোমার অঙ্গে শতগ্রন্থিবস্ত্র দেখিল, তাহার অপেক্ষা অতুর দেশে আর কে আছে? আমার সকল ধর্ম্মের সহায় তুমি। সে ধর্ম্ম যে ত্যাগ করিল, তার কাছে আবার সনাতনধর্ম্ম কি। আমি কোন ধর্ম্মের জন্য দেশে দেশে, বনে বনে, বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের ভার সংগ্রহ করি। পৃথিবী সন্তানদের আয়ত্ত হইবে কি না জানি না; কিন্তু তুমি আমার আয়ত্ত, তুমি পৃথিবীর অপেক্ষা বড়, তুমি আমার স্বর্গ। চল গৃহে যাই—আর আমি ফিরিব না।

শান্তি কিছুকাল কথা কহিতে পারিল না। তার পর বলিল। "ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম্ম কখন ত্যাগ করিও না। দেখ—আমাকে একটা কথা বলিয়া যাও—এ ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত কি?"

জীবানন্দ বলিলেন, "প্রায়শ্চিত্ত—দান—উপবাস—২২ কাহণ কড়ি।"

শান্তি ঈষৎ হাসিল। বলিল, "প্রায়শ্চিত্ত কি তা আমি জানি। এক অপরাধে যে প্রায়শ্চিত্ত—শত অপরাধে কি তাই?"

জীবানন্দ বিস্মিত ও বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"এ সকল কথা কেন?"

শান্তি। এক ভিক্ষা আছে। আমার সঙ্গে আবার দেখা না হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিও না।

জীবানন্দ তখন হাসিয়া বলিল,"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও। তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিব না। মরিবার তত তাড়াতাড়ি নাই। আর আমি এখানে থাকিব না, কিন্তু চোখ ভরিয়া তোমাকে দেখিতে পাইলাম না, একদিন অবশ্য সে দেখা দেখিব। একদিন অবশ্য আমাদের মনস্কামনা সফল হইবে। আমি এখন চলিলাম, তুমি আমার এক অনুরোধ রক্ষা করিও। এ বেশভূষা ত্যাগ কর। আমার পৈতৃক ভিটায় গিয়া বাস কর।

শান্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এখন কোথায় যাইবে?"

জীবা। এখন মঠে ব্রহ্মচারীর অনুসন্ধানে যাইব। তিনি যে ভাবে নগরে গিয়াছেন, তাহাতে কিছু চিন্তাযুক্ত হইয়াছি; দেউলে তাঁহার সন্ধান না পাই, নগরে যাইব।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন। এমত সময়ে বিষণ্ণমুখে ধীরানন্দ তাহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবানন্দ বলিলেন, "গোঁসাই, মুখ অত ভারি কেন?"

ধীরানন্দ বলিলেন, "কিছু গোলযোগ বোধ হইতেছে। কালিকার কাণ্ডটার জন্য নেড়েরা গেরুয়া কাপড় দেখিতেছে, আর ধরিতেছে। অপরাপর সন্তানগণ আজ সকলেই গৈরিক ত্যাগ করিয়াছে। কেবল সত্যানন্দ প্রভু গেরুয়া পরিয়া একা নগরাভিমুখে গিয়াছেন। কি জানি, যদি তিনি মুসলমানের হাতে পড়েন।"

ভবানন্দ বলিলেন, "তাঁহাকে আটক রাখে এমন মুসলমান বীরভূমে নাই। তথাপি আমি একবার নগর বেড়াইয়া আসি। তুমি মঠ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া ভবানন্দ এক নিভৃত কক্ষে গিয়া একটা বড় সিন্দুক হইতে, কতকগুলি বস্ত্র বাহির করিলেন। সহসা ভবানন্দের রূপান্তর হইল। গেরুয়া বসনের পরিবর্ত্তে চুড়িদার পায়েজামা, মেরজাই, কাবা, মাথায় আমামা, এবং পায়ে নাগরা শোভিত হইল। মুখ হইতে ত্রিপুণ্ড্রাদি চন্দনচিহ্ন সকল বিলুপ্ত করিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণগুম্ফশ্মশ্রুশোভিত সুন্দর মুখমণ্ডল অপূর্ব্বশোভা পাইল। তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া মোগলজাতীয় যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ভবানন্দ এইরূপে মোগল সাজিয়া সশস্ত্র হইয়া মঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেখান হইতে ক্রোশেক দূরে দুইটি

অতি অমুচ্চ পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের উপর জঙ্গল উঠিয়াছে। সেই দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি নিভৃতস্থান ছিল। তথায় অনেকগুলি অশ্ব রক্ষিত হইয়াছিল। মঠবাসীদিগের অশ্বশালা এই খানে। ভবানন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি অশ্ব উন্মোচন করিয়া তৎপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। যাইতে যাইতে সহসা তাহার গতিরোধ হইল। সেই পথিপার্শ্বে কলনাদিনী তরঙ্গিণীকূলে গগনভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায়, কাদম্বিনীযুত বিদ্যুতের ন্যায়, দীপ্ত স্ত্রীমূর্ত্তি শয়ান দেখিল। দেখিল জীবন লক্ষণ কিছু নাই—শূন্য বিষের কৌটা পড়িয়া আছে। ভবানন্দ বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ভীত হইল। জীবানন্দের ন্যায়, ভবানন্দও মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যাকে দেখেন নাই। জীবানন্দ যে সকল কারণে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এ মহেন্দ্রের স্ত্রীকন্যা হইতে পারে—ভবানন্দের কাছে সে সকল কারণ অনুপস্থিত। তিনি ব্রহ্মচারীকে মহেন্দ্রকে বন্দীভাবে নীত হইতে দেখেন নাই—কন্যাটীও সেখানে নাই। কৌটা দেখিয়া বুঝিলেন কোন স্ত্রীলোক বিষ খাইয়া মরিয়াছে। ভবানন্দ সেই শবের নিকট বসিল, বসিয়া কপোলে করলগ্ন করিয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। মাথায়, বগলে, হাতে, পায়ে হাত দিয়া দেখিল; অনেক রূপপ্রকার অপরের অপরিজ্ঞাত পরীক্ষা করিল। তখন মনে মনে বলিল, এখনও সময় আছে, কিন্তু বাঁচাইয়া কি করিব। এই রূপ ভবানন্দ অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বৃক্ষের কতকগুলি পাতা লইয়া আসিলেন। পাতাগুলি হাতে পিষিয়া রস করিয়া সেই শবের ওষ্ঠ দন্তভেদ করিয়া অঙ্গুলীদ্বারা কিছু মুখে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, পরে চক্ষে ও নাসিকায় কিছু কিছু রস দিলেন—অঙ্গে সেই রস মাখাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিতে লাগিলেন, মধ্যে মধ্যে নাকের কাছে হাত দিয়া দেখিতে লাগিলেন, যে নিশ্বাস বহিতেছে কি না। বোধ হইল যেন যত্ন বিফল হইতেছে। এইরূপ বহুক্ষণ পরীক্ষা করিতে করিতে ভবানন্দের মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল—অঙ্গুলীতে নিশ্বাসের কিছু ক্ষীণ প্রবাহ অনুভব করিলেন। তখন আরও পত্ররস নিষেক করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশ্বাস প্রখরতর বহিতে লাগিল। নাড়ীতে হাত দিয়া ভবানন্দ দেখিলেন, নাড়ীর গতি হইয়াছে। শেষে অল্পে অল্পে পূর্ব্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগবিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভাবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া ভবানন্দ সেই অর্দ্ধজীবিত দেহ অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া নগরে গেলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা না হইতেই সন্তানসম্প্রদায় সকলেই জানিতে পারিয়াছিল, যে সত্যানন্দ ব্রহ্মচারী আর মহেন্দ্র দুই জনে বন্দী হইয়া নগরের কারাগারে আবদ্ধ আছে। তখন একে একে, দুয়ে দুয়ে, দশে দশে, শতে শতে, সন্তানসম্প্রদায় আসিয়া সেই দেবালয় বেষ্টনকারী অরণ্য পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সকলেই সশস্ত্র। নয়নে রোষাগ্নি, মুখে দম্ভ, অধরে প্রতিজ্ঞা। প্রথমে শত, পরে সহস্র, পরে দ্বিসহস্র। এইরূপে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন মঠের দ্বারে দাঁড়াইয়া তরবারি হস্তে ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—"আমরা অনেক দিন হইতে মনে করিয়াছি যে এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া অজয়ের জলে ফেলিয়া দিব। এই শূয়ারের খোঁয়াড় আগুনে পোড়াইয়া মাতা বসুমতীকে আবার পবিত্র করিব। ভাই, আজ সেই দিন আসিয়াছে। আমাদের গুরুর গুরু পরমগুরু, যিনি অনন্ত জ্ঞানময়, সর্ব্বদা শুদ্ধাচার, যিনি লোকহিতৈষী, যিনি দেশহিতৈষী, যিনি সনাতনধর্ম্মের পুনঃ প্রচার জন্য শরীরপাতনপ্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—যাঁহাকে বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ মনে করি, যিনি আমাদের মুক্তির উপায়, তিনি আজ মুসলমানের কারাগারে বন্দী। আমাদের তরবারে কি ধার নাই?" হস্ত প্রসারণ করিয়া, ভবানন্দ বলিল, "এ বাহুতে কি বল নাই?"—বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিল, "এ হৃদয়ে কি সাহস নাই?—ভাই ডাক, হরে মুরারে মধুকৈটভারে!—যিনি মধুকৈটভ বিনাশ করিয়াছেন—যিনি হিরণ্যকশিপু ধ্বংস, দন্তবক্র, শিশুপাল, প্রভৃতি দুর্জ্জয় অসুরগণের নিধনসাধন করিয়াছেন—যাঁহার চক্রের ঘর্ঘরনির্ঘোষে মৃত্যুঞ্জয় শম্ভু, ভীত হইয়াছিলেন—যিনি অজেয়, রণে জয়দাতা, আমরা তাঁর উপাসক, তাঁর বলে আমাদের বাহুতে অনন্ত বল—তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই আমাদের রণজয় হইবে। চল আমরা সেই যবনপুরী ভাঙ্গিয়া ধূলিগুঁড়ি করি। সেই শূকর নিবাস অগ্নিসংস্কৃত করিয়া অজয়ে ফেলিয়া দিই। সেই বাবুইয়ের বাসা ভাঙ্গিয়া খড়কুটা বাতাসে উড়াইয়া দিই। বল—"হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" তখন সেই কানন হইতে অতি ভীষণ নাদে সহস্র সহস্র কণ্ঠে একেবারে শব্দ হইল, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে!" সহস্র অসি একেবারে ঝনৎকার শব্দ করিল। সহস্র বল্লম ফলক সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল। সহস্র বাহুর আস্ফোটে বজ্রনিনাদ হইতে লাগিল। সহস্র ঢাল যোদ্ধৃবর্গের কর্কশ পৃষ্ঠে তড়বড় শব্দ করিতে লাগিল। মহাকোলাহলে পশু সকল ভীত হইয়া কানন হইতে পলাইল। পক্ষী সকল ভয়ে উচ্চরব করিয়া গগনে উঠিয়া গগন আচ্ছন্ন করিল। সেই সময়ে শত শত জয়-

ঢক্কা একেবারে নিনাদিত হইল। তখন "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" বলিয়া কানন হইতে শ্রেণীবদ্ধ সন্তানের দল নির্গত হইতে লাগিল। ধীর, গম্ভীর পদবিক্ষেপে মুখে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তাহারা সেই অন্ধকার রাত্রে নগরাভিমুখে চলিল। বস্ত্রের মর্ম্মর শব্দ, অস্ত্রের ঝনঝনা শব্দ, কণ্ঠের অস্ফুট নিনাদ, মধ্যে মধ্যে তুমুলরবে হরিবোল। ধীরে,গম্ভীরে, সরোষে, সতেজে, সেই সন্তানবাহিনী নগরে আসিয়া নগর বিত্রস্ত করিয়া ফেলিল। অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত দেখিয়া নাগরিকেরা কে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিকানা নাই। নগররক্ষীরা হতবুদ্ধি হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

এদিকে সন্তানেরা প্রথমেই রাজকারাগারে গিয়া কারাগার ভাঙ্গিয়া রক্ষিকবর্গকে মারিয়া ফেলিল। এবং সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া মস্তকে তুলিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। তখন অতিশয় হরিবোলের গোলযোগ পড়িয়া গেল। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়াই তাহারা যেখানে মুসলমানের গৃহ দেখিল আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু এই সকল কার্য্যে তাহাদের অধিক সময় নষ্ট হইল। ইত্যবসরে নগরের রাজা আসদুল্জমান বাহাদুর নগরস্থ সৈন্য সকল সংগ্রহ করিলেন, এবং কামান, গোলা, বন্দুক লইয়া সন্তানসম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইলেন। সন্তানদিগের অস্ত্র কেবল ঢাল তরবারি ও বল্লম। কামান, গোলা, বন্দুক দেখিয়া তাহারা কিছু ভীত হইল। তোপের মুখে অসংখ্য সন্তান মরিতে লাগিল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "ফিরিয়া চল, অনর্থক বৈষ্ণববধে প্রয়োজন নাই।" তখন পরাজিত হইয়া সন্তানেরা ম্লানমুখে নগর ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

বাঙ্গালির উৎপত্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আর্য্য শূদ্র।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি তাহাতে বোধ হয় ইহা স্থির হইয়াছে যে বাঙ্গালির মধ্যে অনেকগুলি জাতি অনার্য্যবংশ। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়টি এক্ষণে বাঙ্গালি শূদ্র বলিয়া গণিত। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে বাঙ্গালি শূদ্রে সকল না হউক কেহ কেহ অনার্য্যবংশ।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে আমরা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যে সকল প্রমাণ দিয়াছি তাহা সবগুলি ছিদ্রশূন্য নহে। তাহা আমরা কতক স্বীকার করি, কিন্তু এক প্রমাণ অচ্ছিদ্র, অকাট্য আছে। বর্ণ ও আকৃতি। যেখানে বর্ণ ও আকৃতি আর্য্যজাতীয় নহে, সেখানে যে অনার্য্য শোণিত বর্ত্তমান, তাহা নিশ্চিত। আমরা যে কয়টি উদাহরণ দিয়াছি, সকল কয়জাতি সম্বন্ধেই অন্যান্য প্রমাণের উপর এই আকারগত প্রমাণ বিদ্যমান। অতএব ঐ কয়টি জাতির অনার্য্যত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

আমরা মনে করিলে এরূপ উদাহরণ অনেক দিতে পারিতাম। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়াদিগের কথা লিখিতে পারিতাম। পলিয়ারা ভাষায় বাঙ্গালি ও ধর্ম্মে হিন্দু সুতরাং তাহারা বাঙ্গালি বলিয়া গণ্য। কিন্তু তাহাদের আকার ও আচার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃত শূকর পালে এবং শূকর খায়। সুতরাং তাহাদিগের অনার্য্যত্বে কোন সংশয় নাই। মনু,মহাভারতাদির পুলিন্দজাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, এমন অনুমান কতদূর সঙ্গত, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না।

কোন আর্য্যবংশীয় জাতি যে শূকরপালন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ইহা সম্ভব নহে। কেন না শূকর আর্য্যশাস্ত্রানুসারে অতি অপবিত্র জন্তু, বাঙ্গালাজয়কারী আর্য্যেরা ঐ সকল ব্যবসায় যে অনার্য্যদিগের হাতে রাখিবেন, ইহাই সম্ভব। বিশেষ শূকর বা শূকরমাংস আর্য্যদিগের কোন কাজে লাগে না। যদি এইরূপে শূকরপালক জাতিদিগকে অনার্য্য বলিয়া স্থির করা যায়, তাহা হইলে দক্ষিণ বাঙ্গালার কাওরারাও অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। কাওরাদিগের জাতীয় আকারও অনার্য্যদিগের ন্যায়, কাওরারা কোন্ অনার্য্যজাতিসম্ভূত তাহা নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি অনার্য্য জাতির সঙ্গে ইহাদিগের নামের সাদৃশ্য আছে। যথা কোড়োয়া, খাড়োয়া, খাড়িয়া, কৌর, ইত্যাদি। কিরাত শব্দ প্রাকৃততে

ভিন্ন, তাহারা জাত্যন্তর বলিয়া তাহাদিগের বর্ণত্ব নাই।* এইরূপ অসবর্ণ পরিণয়াদিতে কাহারা জন্মিত, তাহা দেখা যাউক।

ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম
জায়তে
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।

মনু ১০ ম অধ্যায় ৮

অর্থাৎ বৈশ্যকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠের জন্ম, এবং শূদ্রকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে নিষাদ বা পারশবের জন্ম। পুনশ্চ

শূদ্রাদায়োগবঃ ক্ষত্তা চাণ্ডালশ্চাধমো
নৃণাং
বৈশ্যরাজন্যবিপ্রাসু জায়ন্তে বর্ণ-
সঙ্করাঃ।

মনু ঐ ১২

অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে শূদ্র হইতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে ক্ষত্ত এবং ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে শূদ্র হইতে চণ্ডালের জন্ম।

যে সকল ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ অব্রত হইয়া পতিত হয়, মনু তাহাদিগকে ব্রাত্য বলিয়াছেন। এবং ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য এবং বৈশ্য ব্রাত্য হইতে নীচজাতির উৎপত্তির কথা লিখিয়াছেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ব্রাত্যদিগকে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূদ্র হইতে জন্মিত বলিয়া বর্ণিত আছে।

এই সকল শঙ্করবর্ণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মধ্যে স্থান পায় নাই, ইহা একরূপ নিশ্চিত। এবং ইহারা যে শূদ্রদিগের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল, তাহাও স্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আয়োগব বা ব্রাত্য এক্ষণে বাঙ্গালায় নাই; কখন ছিল কি না সন্দেহ, কেন না ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় কখন আইসে নাই। কিন্তু চণ্ডালেরা বাঙ্গালায় অতিশয় বহুল; বাঙ্গালি শূদ্রের তাহারা একটি প্রধান ভাগ। চণ্ডালেরা অন্ততঃ মাতৃকুলে আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালায় শূদ্রজাতি অনেকেই সঙ্করবর্ণ, সঙ্করবর্ণ হইলেই যে তাহাদের শরীরে আর্য্যশোণিত, হয় পিতৃকুল নয় মাতৃকুল হইতে আগত হইয়া বাহিত হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বাঙ্গালায় অম্বষ্ঠ আছে, তাহারা যে উভয়কুলে বিশুদ্ধ আর্য্য তাহার প্রমাণ উপরে দেওয়া গিয়াছে। কেন না ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য উভয়েই বিশুদ্ধ আর্য্য।

তৃতীয়, আমরা শেষ তিন পরিচ্ছেদে যাহা বলিলাম, তাহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, বাঙ্গালায় শূদ্রমধ্যে কতকগুলি বিশুদ্ধ আর্য্যবংশীয় এবং কতকগুলি আর্য্যে অনার্য্যে মিশ্রিত, পিতৃমাতৃ-

* সঙ্করস্য পুনর্বর্ণো নাস্তি। সঙ্কীর্ণজাতীনাং অশ্বতরবৎ মাতা পিতৃজাতিব্যতিরিক্ত জাত্যন্তরত্বাৎ ন বর্ণত্বং।

কুলের মধ্যে এক কুলে আর্য্য আর এক কুলে অনার্য্য।

চতুর্থতঃ। কতকগুলি শূদ্রজাতি প্রাচীনকাল হইতে আর্য্যজাতি মধ্যে গণ্য, কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালায় তাহারা শূদ্র বলিয়া পরিচিত; যথা বণিক্। বণিকেরা বৈশ্য। তাহার প্রমাণ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বোধ হয় কেহই তাঁহাদিগের বৈশ্যত্ব অস্বীকার করিবেন না। বাঙ্গালায় শূদ্র মধ্যে যে বৈশ্য আছে, তাহার ইহাই এক অকাট্য প্রমাণ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্থূল কথা।

বাঙ্গালি জাতির উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা পুনরুক্ত করিতেছি।

ভাষা বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় প্রধান জাতি সকল এক প্রাচীন আর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন। যাহার ভাষা আর্য্যভাষা, সেই আর্য্যবংশীয়। বাঙ্গালির ভাষা আর্য্যভাষা, এজন্য বাঙ্গালি আর্য্যবংশীয় জাতি।

কিন্তু বাঙ্গালি অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ আর্য্য নহে। ব্রাহ্মণ অমিশ্রিত এবং বিশুদ্ধ আর্য্য সন্দেহ নাই, কেননা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপত্তি ভিন্ন সঙ্করত্ব সম্ভবে না, সঙ্করত্ব ঘটিলে ব্রাহ্মণত্ব যায়। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্রেও ব্রাহ্মণ হইলে হইতে পারে, কিন্তু ক্ষত্রিয় বৈশ্য বাঙ্গালায় নাই বলিলেই হয়; অতি অল্পসংখ্যক বৈশ্যগণকে বাদ দিলে দেখা যায় যে বাঙ্গালি কেবল দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ আর্য্য, কিন্তু শূদ্রদিগকে বিশুদ্ধ আর্য্য কি বিশুদ্ধ অনার্য্য বিবেচনা করিব কি উভয়েরই মিশ্রিত বিবেচনা করিব, ইহারই বিচারে আমরা এতক্ষণ নিযুক্ত করিয়াছি। কেননা বাঙ্গালি জাতি মধ্যে সংখ্যায় শূদ্রই প্রধান।*

অনুসন্ধানে ইহাও পাওয়া গিয়াছে—যে আর্য্যেরা দেশান্তর হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তখন আমরা এই তত্ত্ব উত্থাপন করিয়াছিলাম, যে তাঁহারা আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বসতি ছিল কি না?

বিচারে পাওয়া গিয়াছে, যে আর্য্যেরা বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনার্য্যদিগের বাস ছিল। তার পর দেখিয়াছি, যে সেই অনার্য্যগণ একবংশীয় নহে। কতকগুলি কোলবংশীয়, আর কতকগুলি দ্রাবিড়বংশীয়। দ্রাবিড়দের পূর্ব্বে কোলবংশীয়েরা বাঙ্গালায় আদি [illegible]

---

* ৭১ সালের লোকসংখ্যাগণনায় স্থির হইয়াছে—যে বাঙ্গালার যে অংশে বাঙ্গালাভাষা প্রচলিত, তাহাতে ৩০৬০০০০০ লক্ষ লোক বসতি করে—তন্মধ্যে [illegible] লক্ষ মাত্র ব্রাহ্মণ।

সংমিশ্রণে উৎপন্ন সন্তানেরা আর্য্য অনার্য্য হইতে আর একটি পৃথক্ জাতি হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডালেরা ইহার উদাহরণ। ইংরেজ একজাতি, বাঙ্গালীরা বহুজাতি। বাস্তবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙ্গালি বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারিপ্রকার বাঙ্গালি পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙ্গালি মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক্ থাকে। বাঙ্গালিসমাজের নিম্নস্তরেই বাঙ্গালি অনার্য্য বা মিশ্রিত আর্য্য ও বাঙ্গালি মুসলমান; উপরের স্তরের প্রায় কেবলই আর্য্য। এইজন্য দূর হইতে দেখিতে বাঙ্গালিজাতি অমিশ্রিত আর্য্যজাতি বলিয়াই বোধ হয় এবং বাঙ্গালার ইতিহাস এক আর্য্যবংশীয় জাতির ইতিহাস বলিয়া লিখিত হয়।

বঙ্গোন্নয়ন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার রোগ।

আমেরিকায় পীতজ্বরে* সহস্র সহস্র শ্বেতকায় মনুষ্যের মৃত্যু হয়; কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিদের এই রোগ প্রায়ই হয় না। আফ্রিকায় গিনির উপকূলে ইউরোপীয় প্রবাসীদের মধ্যে প্রায় পঞ্চমাংশ প্রতিবৎসর জ্বরাক্রান্ত হইয়া মরিয়া যায়। আদিম নিবাসীদের মধ্যে ঐ রোগের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই। ইংলণ্ডের পণ্ডিতবর ডারউইন অনুমান করেন যে, কৃষ্ণকায়দের প্রতি ম্যালেরিয়া অর্থাৎ অবজ্ঞ বায়ুর কম কোপ।†

ভারতবর্ষে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের

* Yellow fever. এই রোগ একপ্রকার পিত্তজ্বর। ইহার আক্রমণে শ্বেতবর্ণ পীত হয়; এজন্য ইহাকে পীতজ্বর বলে।

† Various facts which I have given elsewhere prove that the colour of the skin and hair is sometimes correlated in a surpri manner with a complete immunity for the action of certain veget

প্রতি ম্যালেরিয়ার সমান কোপ। কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না। প্রভেদ থাকিলে, কৃষ্ণাঙ্গের যে এত অনাদর, তাহা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিতাম।

এই দেশে বর্ণভেদে ম্যালেরিয়ার কোপের ভেদ দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু রোগীর বলানুসারে যে উক্ত কোপের ন্যূনাধিক্য হয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্বাস্থ্যরক্ষা বিধায়ক (Sanitary Commissioner) ডাক্তর প্লাঙ্ক সাহেবের এই মত যে, ভারতবর্ষের ব্যাপক জ্বর ও দুর্ভিক্ষজাত জ্বরে কোন প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। উভয়ের কারণ অনশন বা অপুষ্টি।* ডাক্তর লাইয়ন্স বলেন যে, ভারতবর্ষবাসীদের আহার অপ্রচুর ও অপুষ্টিকর। বলের ন্যূনতাবশতঃ তাহাদের জীবনীশক্তি রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে অক্ষম। ডাক্তর মওার্ণ, ডাক্তর শেফ্রিজ প্রভৃতি কতিপয় ভিষগ্বরেরও ঐ মত।

উক্ত মত যে অনেকদূর যুক্তিসিদ্ধ, তাহার কোন সংশয় নাই। ১২৮৭ সনে নদিয়া জেলায় যে মারিভয় হইয়াছিল, তাহাতে তদন্ত করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, বালক বালিকা ও বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মৃত্যুর সংখ্যাই অধিক, এবং যুবক যুবতী আর প্রৌঢ় প্রৌঢ়াদের মৃত্যুসংখ্যা অনেক কম। ইহাতে ডাক্তর লাইয়ন্সের মতের বিলক্ষণ পোষকতা হইতেছে। নানা কারণবশতঃ ভারতবর্ষের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যে যাহাদের আহারের সংস্থান

poisons and from the attacks of certain parasites. * * * Hence it occurred to me that Negroes & other dark races might have acquired their dark tints by the darker individuals escaping from the deadly influence of the miasma of their native countries during a long series of generations. It has long been known that Negroes & even mulattoes are almost completely exempt from the yellow fever so destructive in Tropical America. They likewise escape to a large extent the fatal intermittent fevers that prevail along at least two thousand and six hundred miles of the shores of Africa and which annually cause one fifth of the white settlers to die another fifth to return home invalided. *Darwin's Descent of Man* (1877) *P* 193.

প্রসিদ্ধ মানবতত্ত্ববিৎ কাট্রিফাজেরও ঐ মত।

Sierra Leone is one of the most unhealthy stations for the white man, while for the Negro, it is on the contrary, one of the places where the rate of mortality is the lowest – Quatrefages on the Human species (1879) P 424.

* Supplement to the N. W. Provinces Gazette, June 26, 1880.

আছে, তাহাদের ক্ষুধা নাই, এবং যাহাদের ক্ষুধা আছে, তাহাদের আহারের সংস্থান নাই। ভারতের এই দুর্দ্দশা কেন ঘটিল, তাহার সমালোচনা পরে করা যাইবে।

জ্বররোগ অপেক্ষা ওলাউঠারোগ অধিকতর দুশ্চিকিৎস্য। ডাক্তার টানার প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান ইউরোপীয় চিকিৎসক বলেন যে, উক্ত রোগের প্রকৃত প্রস্তাবে চিকিৎসাই নাই।*

এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যশোহর জেলার অন্তর্গত গদখালি গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে ঐ রোগের প্রথম আবির্ভাব হয়। এক্ষণে এই রোগ জগদ্ব্যাপী হইয়াছে।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১২২৩ সনে ঐ রোগ কলিকাতায় প্রথমতঃ দেখা দিয়া ক্রমশঃ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে; পরে কলের জল হওয়া অবধি তাহার দর্প খর্ব্ব হইয়াছে। বৈদ্যশাস্ত্রে বিসূচিকা ব্যাধির যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, সে সকল লক্ষণের সহিত ওলাউঠার কোন কোন লক্ষণের ঐক্য নাই। সুতরাং ওলাউঠা যে বিসূচিকা নহে, একটি নূতন ব্যাধি, চিকিৎসকমণ্ডলীর মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। রাধারমণ সেন নামক বরিশালের একজন বিজ্ঞচিকিৎসক প্রস্তাবলেখককে বলিয়াছিলেন যে, ১২২৫ সনে ঐ রোগ বরিশাল, মাধবপাশা প্রভৃতি স্থানে প্রথম দেখা দিলে, লোক সকল যারপর নাই ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধ কবিরাজ ইহার পূর্ব্বে ঐ রোগ কখনও দেখেন নাই।

মানবজাতির এই দুর্দ্দান্ত শত্রুর কিরূপে যশোহরে উৎপত্তি হইল, তাহা কোন কালে কেহই বলিতে পারেন না, এবং তাহার অনুসন্ধান করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। তবে বলা যাইতে পারে যে, যেস্থানে ও যে সময়ে নির্ম্মল জল অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, সে স্থানে ও সে সময়ে ওলাউঠা প্রবল হইতে পারে না। কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষাধ্যক্ষ প্রতি বৎসর যে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহার কয়েকখানি পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে যে কলের জল হওয়া অবধি অর্থাৎ ১২৭৬ সন হইতে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব উক্ত নগরে অনেক কম হইয়াছে। বর্ষাকালে সর্ব্বত্রেই জল অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হয়, সুতরাং ঐ কালে ওলাউঠারোগ অতি বিরল। বর্ষাকালে নদীর জল ঘোলমৃৎকণিকায় পরিপূর্ণ হইয়া বিবর্ণ হয় বটে, কিন্তু মৃত্তিকায় কেবল স্বচ্ছতার ব্যাঘাত হয়, প্রকৃত নির্ম্মলতার ব্যাঘাত হয় না।

* তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উৎকট রোগে হোমিওপাথি চিকিৎসায় যেমন সুফল দৃষ্ট হয়, এমন অন্য কোনপ্রকার চিকিৎসাতেই নহে।

জলের এ প্রধান দোষ, তাহার উৎপত্তি কেবল গলিত উদ্ভিদ ও গলিত জন্তুশরীর হইতে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ জলকে জীবন বলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ম্মল জলের ওলাউঠানিবারিকাশক্তি এবং অন্যান্য গুণের পর্য্যালোচনা করিলে প্রাচীনদের বর্ণনায় অত্যুক্তি আছে বোধ হয় না।

বাঙ্গালার কি কি অভাব আছে, তাহা চিন্তা করিতে গেলে, নির্ম্মল জলের অভাব একটি প্রধান অভাব বলিয়া প্রতীত হইবে। প্রায় কোন গ্রামে এমন জলাশয় নাই, যাহাতে গলিতপত্র, গলিত জন্তুদেহ ও শৈবাল না আছে। ভূমির উচ্চতা, জলের নির্ম্মলতা ও বিশুদ্ধ বায়ুসঞ্চালনের উপায় যিনি করিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালার বারআনা রোগ দূর করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন। এমন মহাত্মা কোথায়? যদি এমন উদারচেতা কেহ থাকেন, বঙ্গবাসীদের সাহায্য ব্যতীতই বা তিনি কি করিবেন!

নূতন কথা গড়া।

যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই জানেন, যে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে গেলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক, ভাবপ্রকাশ হইলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজিতে যে এক কথায় ব্যক্ত হয় বাঙ্গালায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিনছত্র লিখিতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোনটি মতেরই সম্পূর্ণ পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়। কখন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়। কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে, লেখার শ্রী থাকে না, এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।

একটি উদাহরণ দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা

করিব। "উকিলীতে আজ কাল বড়ই compition." এখন compition শব্দে যে ভাব ব্যক্ত হয়, বাঙ্গালা ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিবার কোন কথা নাই। আমরা কি করিব? ঐ শব্দটি কি বাঙ্গালা করিয়া লইব, না উহার পরিবর্ত্তে সংস্কৃতধাতুপাঠ খুঁজিয়া "সজ্ঘর্ষ" শব্দ গড়িয়া লইব। না বলিব উকিলীতে আজ কাল অনেক লোক হইয়াছে, অতএব উহাতে পসার করা বড়ই শক্ত।

এই তিন উপায়েই দোষগুণ উভয়ই আছে। সজ্ঘর্ষ শব্দটি হয় ত একেবারেই নূতন, যদি সংস্কৃতে থাকে এরূপ অর্থে কখন ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং সজ্ঘর্ষ বলিলে, যিনি শব্দটি গড়িবেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু উহার এক গুণ আছে। উহা সংস্কৃতমূলক; সুতরাং অনেক লোক উহা ইংরেজি কথা অপেক্ষা ভাল বলিবেন, আর উহা যদি চলিয়া যায়, তবে ইংরেজের কাছে উহার জন্য দেন্দার থাকিতে হইবে না। কিন্তু এ কথা চলিবে কি?

যাহারা ইংরেজি জানে না, Compition কথাটী তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু সজ্ঘর্ষ বলিলে যত লোকে বুঝিবে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোকে বুঝিতে পারিবে।

"উকিলীতে অনেক লোক হইয়াছে, অতএব পসার করা শক্ত" বলিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু অন্য কথায় বলা না হওয়ায় কেমন একটু ভাসা ভাসা লাগে। হয় ত যে প্রণালীতে রচনা হইতেছে, অত কথায় বলিলে সে প্রণালীর সহিত সহচারবিরুদ্ধ হইয়া উঠে।

আমরা যে এই কথা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে নূতনভাব প্রকাশ করিতে গেলে প্রকাশকের বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। হঠাৎ যাহা হয়, একটি করিয়া ফেলা উচিত নহে। কারণ এরূপ দুরূহ কার্য্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিসের নাম দিতে হইলে, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া, সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা চলিত আছে, সেগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক দেখা উচিত, যদি তাহার মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।

প্রথম উদাহরণ।

কাচ সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। সহজে ভাঙ্গা গুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি শব্দ আছে "ঠুন্‌ক" কিন্তু যাঁহারা স্কুলের বই লেখেন, তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার

করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায় তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর, সুতরাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটী না বাঙ্গালা, না ইংরেজি, না সংস্কৃত। অথচ বাঙ্গালায় প্রায় দশ-লক্ষ ছাত্র গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে শিখিল কাচ ভঙ্গুর নহে, ঠুন্‌কও নহে, উহা ভঙ্গপ্রবণ।

দ্বিতীয় উদাহরণ।

"দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান" বাঙ্গালায় নাই। সুতরাং উহার নামও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐ স্থানটির নাম দেওয়া। হিন্দীতে ঐ স্থানকে "দূন" বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্ব্বতের আসন্নভূমি বুঝায়, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বুঝায় না। সুতরাং গুরুমহাশয়ের বেত্রাঘাতে দশলক্ষ বালক একটি "ভুল" শিখিল।

তৃতীয় উদাহরণ।

যেখানে বসিয়া জ্যোতির্ব্বিদেরা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির বা তারাঘর কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজি নাম observatoryর তর্জ্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ উদাহরণ।

ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্ব্বতময় প্রদেশকে লোকে উত্তরাখণ্ড বলে, কিন্তু ইংরেজিতে উহাকে Himalayan regions বলে বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তকে উহার নাম হিমালয়প্রদেশ হইয়াছে। এরূপ উদাহরণের অভাব নাই, যথেষ্ট আছে।

তাই বলিতেছিলাম যে, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে গেলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত। কিন্তু দুঃখের মধ্যে বাঙ্গালিলেখকদিগের মধ্যে কাহারই সে বিবেচনা নাই। তাঁহারা পড়েন ইংরেজি, ভাবেন ইংরেজিতে সুতরাং লিখিবার সময়ে ইংরেজিতে ভাব আসিয়া যোগায়। জাতীয় স্বভাব আলস্য বিশেষ অনুসন্ধান করিতে দেয় না। অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিদ্যায় কুলাইয়া উঠে না। যাঁহারা বেশী অলস, অথচ একটু বুদ্ধি আছে, তাঁহারা ইংরেজি ঠিক্ রাখিয়া দেন। যাঁহাদের উহারই মধ্যে একটু হিতাহিত জ্ঞান আছে, তাঁহারা যাহা হয় একটা তর্জ্জমা করিয়া পরেই বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি কথাটি রাখিয়া দেন, অর্থাৎ দেশ শুদ্ধ লোককে বলিয়া দেন, আমি তর্জ্জমা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার বিদ্যায় কুলাইয়া উঠিল না। অনেকে আবার শুদ্ধ তর্জ্জমা করিয়াই রাখিয়া দেন, ইহাদের লেখা সময়ে সময়ে বড়ই মিষ্ট। Bear the

Responsibility থাকিলে ইহার তর্জ্জমা করেন, জবাবদিহি বহন। Is appointed a Lectureor তর্জ্জমা করেন বক্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। He seconded my proposal, আমার প্রস্তাব দ্বিতীয় করিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

সরস্বতীর বরপুত্র বা ভিক্ষাপুত্র* বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা বড়ই প্রবল। মনে মনে সকলেই অহম্ উত্তম পুরুষ। জ্ঞান আমি জিনিষস। সুতরাং খাটিবার ইচ্ছা একেবারেই নাই। ইংরেজি পুস্তক যেমন দেখিলেন, অমনি তখনি তর্জ্জমা করিয়া ফেলিলেন। প্রায় পূর্ব্বকালের মাছিমারা কেরাণীদিগের মত যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিয়া ফেলিলেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের পুস্তকে দেশী নামগুলি চিনিয়া লওয়া ভার হয়। তাঁহারা মল্লার রায়কে "মল্হর" রায় লেখেন। রাঘবকে "রাঘোবা" লেখেন। তাঁহাদের গ্রন্থে রজপুত-কুল-ধুরন্ধর সংগ্রাম সিংহকে আমরা আর চিনিতে পারি না। তাঁহার নাম হয় রাণা সঙ্গ। জয়জীরাও জিজিরায় হন। তাঁতীয়া রায় টাণ্টিয়া টোপী হন। পবিত্র তীর্থ বারাণসী "বেনারস" হইয়া যায়। লাহোরের নিকট একটি নগর আছে, তাহার নাম গুজরানওয়ালা। কিন্তু বাঙ্গালা ভূগোলে উহাকে চিনিয়া উঠা ভার, উহার নাম গুজম্বার্লা হইয়াছে।

যাহারা দেশীয় নামের বানান পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া লইতে অনিচ্ছুক তাঁহারা যে নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবে ইহা একান্ত অসম্ভব। ইচ্ছামত নূতন শব্দ গঠনের বড় বড় ইংরেজি কথা প্রবেশনের এবং জবাবদিহি বহন গোছ, তর্জ্জমার ফল এই যে বাঙ্গালা পুস্তক প্রায়ই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠে বরং সংস্কৃত বা ইংরেজি বুঝা যায়, তথাপি বাঙ্গালা বুঝা যায় না। ইহারই জন্য শিক্ষিত মহলে বাঙ্গালার তাদৃশ আদর হয় না। ইহার আর এক ভয়ানক দোষ এই যে ভাষার কিছু স্থিরতা থাকে না। অধিকাংশ বাঙ্গালালেখক বাঙ্গালা পড়েন না কেবল লেখেন। নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে তাঁহারা নিজের মনোমত নূতন শব্দ গড়িয়াদেন। পূর্ব্বে অন্য লোক সেই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা সন্ধান লয়েন না। এইরূপে একটি ভাব প্রকাশের জন্য রাশি রাশি নূতন কথা সৃষ্টি করা হয়। অথচ আমরা দেখিতে পাই, হয় চলিত ভাষায়

* যাঁহারা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সরস্বতীর ভিক্ষাপুত্র বলে।

না হয় পার্শ্বস্থ দেশের চলিত ভাষায় অথবা চলিত সংস্কৃতে একটু খুঁজিলে উৎকৃষ্ট শব্দ পাওয়া যাইত।

দুই একজন লোক এমনি আহাম্মক আছে যে ঘরে টাঁকা থাকিতে ধার করে। আমাদের বাঙ্গালি লেখকও ঠিক সেইরূপ হইতেছে। বৃথা অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি হইতেছে, অথচ ভাষার কিছুমাত্র উন্নতি হইতেছে না, এবং বাঙ্গালাভাষা কি তাহাও ঠিক হইতেছে না। বাঙ্গালা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র ভাষা সংস্কৃত হইতে ইহার সত্তা স্বতন্ত্র, জীবন স্বতন্ত্র, উৎপত্তি, স্থিতি, এবং লয় এই তিনই স্বতন্ত্র, এ কথা বর্ত্তমান লিখিত বাঙ্গালাভাষা দেখিলে কাহারও বোধগম্য হয় না। যে পারস্যভাষায় প্রায় ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া দেশের প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, ভদ্রসমাজে কথিত বাঙ্গালাভাষায় শতকরা ৫০টী কথা যে ভাষা হইতে গৃহীত, বাঙ্গালা ব্যাকরণের হাড়ে হাড়ে যে ভাষা বিদ্ধিয়া আছে, যে ভাষার কথা ব্যবহার করিলে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিতে পারে, আমরা প্রাণপণে সে ভাষার কথাগুলি লিখিত ভাষা হইতে দূর করিবার চেষ্টা করি। নালিশ বলিলে সকলে বুঝিতে পারে; কিন্তু তাহা ত্যাগ করিয়া গ্রন্থকারেরা অভিযোগ লেখেন। অথচ সংস্কৃত অভিধান খুজিলে অভিযোগ শব্দে আর এক অর্থ বুঝায়, নালিশ বুঝায় না। এই রূপে আদালতে প্রচলিত সমস্ত পারসী কথা লিখিত বাঙ্গালা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সেই সকলের পরিবর্ত্তে অতি দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সকল অসংস্কৃত অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

উদাহরণ—রফা বলিতে গেলে মোকদ্দমা মিটাইয়া ফেলাকে বলে, মীমাংসা বলিলে সে অর্থ বুঝায় না কিন্তু রফার জায়গায় অনেকেই মীমাংসা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পাট্টাকবুলতি চলিত কথা, সকলেই বুঝিতে পারে, কিন্তু অনেকে উহার পরিবর্ত্তে ভোগনিয়োগপত্র না এমনি কি একটা কথা ব্যবহার করেন তাহা আমাদের মনে থাকে না। কেহ তাহা বুঝেও না।

যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতাধ্যাপকগণ প্রথম বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন পারস্য কথার প্রতি এরূপ বিদ্বেষ থাকা কতক সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন লেখকগণের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত অতি বিরল। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, এবিষয়ে উঁহাদের অপেক্ষাও ইঁহারা অধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থবিষয়ে ভয়ানক ভুল করিয়া ও নানারূপ গোলযোগ করিয়া বসেন।

যে সর্ব্বদা উচ্চ অঙ্গের শাস্ত্রতত্ত্ব ভাবিয়া থাকে তাহার নাম ইংরেজিতে" thoughtful বাঙ্গালা লেখকেরা উহার

নাম রাখিয়াছেন, চিন্তাশীল। চিন্তা বলিলে বাঙ্গালায় দুর্ভাবনা বুঝায়, চিন্তিত, চিন্তাযুক্ত, চিন্তাশীল বলিলে, যে সর্ব্বদা দুর্ভাবনাগ্রস্ত অর্থাৎ মনমরা তাহাকেই বুঝায় সুতরাং চিন্তাশীল শব্দে গ্রন্থকার যাহা বুঝিলেন পাঠক তাহার ঠিক উল্টা বুঝিল।

উপন্যাস বলিতে গল্প বুঝায়, কিন্তু ইংরেজিতে একপ্রকার উপন্যাস আছে তাহার নাম নবেল, তাহাতে এবং উপন্যাসে প্রণালীগত একটু ভেদ আছে এই জন্য বাঙ্গালি লেখকেরা উপন্যাস শব্দ ত্যাগ করিয়া নবেলের নাম নবন্যাস রাখিয়াছেন। নবন্যাস বলিতে গেলে সংস্কৃতে নূতন গচ্ছিতধন বুঝায়, কারণ ন্যাস মানে গচ্ছিতধন, অতএব নবন্যাস কথাটি সম্পূর্ণরূপে পরিহার্য্য।

এক এক দল সৈন্যের নাম আছে column কিন্তু column বলিতে থাম বুঝায় আর থামের সঙ্গে সৈন্যদলের ইংরেজের চক্ষে কোন রূপ সৌসাদৃশ্য থাকায় বোধ হয় ইংরেজে উহাকে column বলে আমাদের সে সৌসাদৃশ্য চক্ষে লাগে না তথাপি আমাদের লেখকেরা অনায়াসে সৈন্যস্তম্ভ বলিয়া উহার তর্জ্জমা করিয়া থাকেন।

তাই আমরা বলিতেছিলাম, লিখিতে বসিয়া ভাবপ্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষরূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত। এবং নূতন শব্দ গঠনের পূর্ব্বে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।

এ সকল অপেক্ষা আর একটি সহজ পরামর্শ আছে। যতদিন পর্য্যন্ত মনোমধ্যে ভাব ইংরেজিতে উদয় হয় ততদিন যেন কেহ বাঙ্গালা লিখিতে না বসেন। বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যেন বাঙ্গালায় ভাবিতে শিখা হয়, তাহা হইলে অনেক সময় নূতন ভাব আপনা আপনিই বাঙ্গালায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাহার জন্য বেশী মাথা কুটাকুটি করিতে হইবে না।

মহাত্মা রামমোহনরায়।*

আধুনিক বঙ্গদেশের গৌরবই মহাত্মা রামমোহন রায়। এই মহাত্মাকে সম্মান করিলে বাঙ্গালিজাতি সম্মানিত হয়। ইঁহাকে সম্মান করা অগ্রে বাঙ্গালিজাতির কর্ত্তব্য। তিনি জীবিতকালে অনাদৃত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্ষণে যখন আমরা তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্যক্ উপলব্ধ করিতে পারিয়াছি, এখন তাঁহার যথোচিত সম্মান ও আদর না করিলে আমরা নিতান্ত নিন্দনীয় হইব। সর্ব্বসাধারণে যাহাতে রামমোহন রায়ের জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার জীবনী প্রকাশ করা উচিত। নগেন্দ্র বাবু সেই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতকাল যে তাঁহার অমূল্য জীবনী প্রচারিত ছিল না, ইহা বাঙ্গালিজাতিরই কলঙ্ক। নগেন্দ্র বাবু সেই কলঙ্ক অপনয়ন করিয়াছেন। সেই জন্য গ্রন্থকার অনেক কারণে আমাদিগের কৃতজ্ঞতার ভাজন। বাঙ্গালিজাতি যে রামমোহন রায়ের নিকট কতপ্রকার ঋণে আবদ্ধ নগেন্দ্র বাবু তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকাশ করিয়া রামমোহন রায়ের প্রতি বাঙ্গালিজাতির কি কর্ত্তব্য তাহা স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের জীবনী অতি সরল বিশুদ্ধ ভাষায় রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার নানাস্থান হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আর্য্যদর্শনে শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় রামমোহনের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন তাহাতে গ্রন্থকারের অনেক সাহায্য হইয়াছে। গ্রন্থকারের একটি চমৎকার গুণ এই তিনি বক্তব্য বিষয় বেশ সাজাইয়া বলিতে পারেন। সে গুণ সমালোচ্য গ্রন্থেও বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের জীবনী আলোচনায় যেস্থলে যেরূপ চিন্তা সহজে উদয় হয়, সেইরূপ চিন্তায় গ্রন্থখানি পরিপূর্ণ; এবং গ্রন্থকার অনেক স্থলে যে সমস্ত মত ও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ ও ন্যায্য।

জীবনীলেখকের যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবশ্যক করে নগেন্দ্র বাবুর তাহা আছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে এমত প্রতীতি হয় যে তিনি রামমোহন রায়কে অত্যন্ত ভক্তি করেন। সেই

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা রায় যন্ত্রে মুদ্রিত সন ১২৮৮ সাল।

ভক্তিভাজনের জীবনী লিখিতে উৎসাহিত হইয়া তিনি বিলক্ষণ পরিশ্রমও করিয়াছেন। পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এমত অনেক বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যাহা পূর্ব্বে অল্পলোকেরই বিদিত ছিল। তিনি সমস্ত বিষয় অতি শ্রদ্ধার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের বিশুদ্ধ নামে যে অপকলঙ্ক ছিল, যে অপকলঙ্ক তাঁহার সমগ্র জীবনের ঘটনাবলির সহিত কখন সম্ভবপর হইতে পারে না; যাহা কেবল তাঁহার শত্রুগণের বিদ্বেষভাবের পরিচায়ক মাত্র বলিয়া উপলব্ধ হইতে থাকে, সেই দুই অপকলঙ্কের নগেন্দ্র বাবু অতি সুন্দররূপে অপনয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সমগ্র গ্রন্থখানি ভক্তির উপহার স্বরূপ এবং যিনি ইহা পাঠ করিবেন তিনি রামমোহন রায়কে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

রামমোহন রায় যে একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনীতে বিলক্ষণ প্রকাশিত হয়। অতি তরুণবয়সে যখন তিনি হিন্দু শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সহসা একদা একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তাঁহার প্রতিভার প্রথম আলোক পরিদৃশ্য হয়। বহুকাল ধরিয়া হিন্দুরা শাস্ত্রালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু কেহ কখন সেই শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া রামমোহনের মত অতি তরুণবয়সেই একেশ্বরবাদে উপনীত হইতে পারেন নাই। যদিও রামমোহনের সময়ে খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ এখানে আসিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তাঁহারা খৃষ্টের বিশেষ মতামত প্রচারে এত ব্যস্ত যে তাহাতে ঠিক প্রকৃত একেশ্বরবাদ কখন প্রকাশিত হয় নাই। তৎকালে খৃষ্টান পাদ্রিগণের মতামতও বিশেষরূপে সকলের শ্রবণযোগ্য হইত না, এবং সাধারণ জনেরা অবগত ছিলেন না। বিশেষতঃ রামমোহন রায় যে অল্পবয়সে একেশ্বরবাদে উপনীত হন, তখন তিনি খৃষ্টীয় মত বোধ হয় অবগত ছিলেন না। যদি থাকেন তাহা হয় ত খৃষ্টীয় মত বলিয়াই জানিতেন। কিন্তু রামমোহন রায়ের বিশেষ গৌরব এই তিনি সেই একেশ্বরবাদ হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে নিহিত দেখিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাস্ত্রের অশেষ মতামত ভেদ করিয়া এই মহৎ সত্য উপলব্ধ করিয়াছিল। রামমোহন রায় প্রথমে ইহা হিন্দুশাস্ত্রের সারমাত্র বলিয়া দেখিলেন, এবং তাহা প্রচার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি এই মত প্রচার করিতে এত উদ্যোগী হইলেন, ইহার সত্য তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছিল, যেন তিনি হঠাৎ কি অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেন কোন দিব্যালোক তাঁহার মনে সহসা প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি সে আলোকে মোহিত হইয়া তাহা জগৎময় প্রকাশিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

রামমোহনের প্রতিভা সকল অবস্থায় তাঁহাকে প্রচালন করিত। তিনি এই প্রতিভাবলে অতি জটিল তর্কসকল ভেদ করিয়া সত্য প্রকাশিত করিতেন। এই প্রতিভাবলে সকল শাস্ত্রালোচনায় অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল নির্দ্ধারণ করিতেন। বাক্‌বিতণ্ডায় ও তর্কযুদ্ধে এই প্রতিভাবলে তিনি সকলের উপর জয়লাভ করিতেন। তাঁহার বিপক্ষে যে কেহ উদয় হউন না কেন, তিনি কাহারও সহিত বিচার করিতে শঙ্কা করিতেন না। যেরূপ তর্কজাল হউক না কেন, সে তর্ক না পড়িতে পড়িতে রামমোহন রায় তাহার অসারতা সুন্দর দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যেন তাঁহার নিকট সকল কুতর্কের অস্ত্র ছিল। কুতর্ক উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহা খণ্ডন করিতেন। একটু কালবিলম্ব হইত না। ইহাই উপস্থিত বুদ্ধি, ইহাই প্রতিভা। এই প্রতিভা যেন আন্তরিক আলোক রূপে তাঁহার মনোমন্দিরে বিরাজিত ছিল। কুতর্কজালের কুজ্ঝটিকা বিস্তৃত হইবামাত্র তাঁহার অভ্যন্তরিক আলোকদ্বারা তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত।

যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন লোক হন, তাঁহারা এক এক যুগের অগ্রণী স্বরূপ হন। রামমোহন রায় এক্ষণকার কালের অগ্রগামী লোক ছিলেন। তাঁহার কালের পূর্ব্বে তিনি উদয় হইয়াছিলেন। অথবা তিনি এক নূতন যুগের প্রারম্ভ করিয়া যান। এদেশীয় দেশাচার সম্বন্ধে আজ কাল অনেক তর্কের পর যে সমস্ত সত্য নির্ণীত হইতেছে, রামমোহন রায় বহুকাল পূর্ব্বে তাহা স্থির করিয়া গিয়াছেন। বলিতে গেলে আমরা আজি কালি তাঁহারই মতামতের অনুসারী হইয়াছি মাত্র। রামমোহন রায় তাঁহার পরিষ্কার বুদ্ধিতে সকল বিষয় বহুকাল পূর্ব্বে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণকার কালের উজ্জ্বল শুখতারা রূপে বঙ্গগগনে উদয় হইয়াছিলেন।

যে সমস্ত অসাধারণ গুণে রামমোহন রায়কে উচ্চগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল, প্রতিভা তাহার অন্যতম। প্রতিভা তন্মধ্যে সামান্য গুণ। কারণ প্রতিভা অনেকেরই থাকিতে পারে। রামমোহন রায় যদি অন্যান্য গুণের আধার না হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই একজন অসাধারণ লোক হইতে পারিতেন না। তাঁহার অপরাপর গুণের মধ্যে তাঁহার সাহসকে আমরা একটি শ্রেষ্ঠতম গুণ বলি। যে সাহস থাকিলে মানব উচ্চে উঠিতে পারে, রামমোহন রায়ের সেই সাহস ছিল। সকল সময়েই মনুষ্যসমাজ এক এক স্থির অবস্থায় অথবা স্তরে স্থাপিত থাকে। রামমোহন রায়ের যে সময় অভ্যুদয় হয়, তখনকার কালে বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ কিরূপ জঘন্য অবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, তাহা সমালোচ্যগ্রন্থমধ্যে সুন্দর বর্ণিত আছে। মনুষ্যসমাজের ধর্ম্ম এই যে, লোকে এই স্তরে সর্ব্বসাধারণকে রক্ষা করিতে চেষ্টা

করে। ইহাই সামাজিক শাসন ও বন্ধন। মানবজাতির অবস্থা কখন এক-ভাবে থাকিতে পারে না। সমাজ কখন একভাবে দাঁড়াইতে পারে না। হয় তাহা ভিতরে ভিতরে উন্নতিপথে উঠিতেছে, না হয় তাহা অবনতির দিকে অবনত হইতেছে। মানবসমাজের নিশ্চেষ্টতায়ও তাহার অপকার সাধন হয়। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ নিশ্চেষ্টতায় ক্রমশই অধঃপাতে যাইতেছিল। দিন দিন তাঁহার অবনতি হইতেছিল। বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ এখন এইরূপ নিশ্চেষ্ট স্থিরভাবে অবস্থিত ছিল। ভিতরে ভিতরে তাহার অবনতিসাধন হইতেছিল। তাহার গতি অধোদিকেই অভিমুখী ছিল। রামমোহন রায় এই সমাজের গতি ফিরাইয়া দিলেন। সামাজিকতরঙ্গে বিপরীত বল বিক্ষেপ করিলেন। সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে বল রামমোহন রায়ের হৃদয়ে; সেই বল, সেই সাহস, সেই অধ্যবসায়, সেই বিদ্যাবুদ্ধি, সেই প্রতিভা, সেই মহান্ আভ্যন্তরিক বলে রামমোহন রায় এই সামাজিক তুফানে দণ্ডায়মান হইলেন। বলিতে গেলে একাকীই দণ্ডায়মান হইলেন। যে বলে, যে সাহসে তিনি আত্মস্বজন, ভাইবন্ধু জনকজননীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই বল রামমোহন রায়কে আবার স্বদেশীয় জনসমাজের প্রতিকূলমুখে সংরক্ষা করিল। সমুদায় সমাজ তাঁহার বিপক্ষে। রামমোহন রায় একাকী বীরের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। শুদ্ধ দাঁড়াইয়া নয়, মহাসমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে যেরূপ অস্ত্রবিক্ষেপ করিতেছে, রামমোহন্ রায় তাহা সেইরূপ বলে কাটাইতেছেন। যাহা সহ্য করিবার তাহা সহ্য করিতেছেন। যাহা কাটাইবার তাহা কাটাইতেছেন। ইহাই বীরত্ব, ইহাই সাহস। এই সাহসে রামমোহন রায় সামাজিক গতি উন্নতির দিকে বিক্ষেপ করিয়াছেন। রামমোহন যখন প্রথম সমাজকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের জন্য সত্যের জন্য দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান; যখন নদ নদী, বন, পর্ব্বত, সিংহ, শার্দ্দূল এবং মানবের ভয়ঙ্কর শত্রুতা প্রভৃতি কিছুতেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারে নাই, তখন তাঁহার হৃদয়বল একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় কত, একদিন দেখা গিয়াছিল। তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম আলোক প্রভাসিত হইয়াছিল। এই হৃদয়বলে কয়জনকে বলীয়ান্ দেখা যায়। এই মহান্ হৃদয়বলে কয়জন লোক সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, সত্যের জন্য, প্রকৃতধর্ম্মের অনুসন্ধানের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন। আবার যখন আমরা ভাবি, রামমোহন রায়ের বয়স তখন কত তরুণ, সম্পত্তি ও সহায় কেমন বিহীন, তখন তাঁহার হৃদয়বলের যে কতদূর গৌরব তাহা একদিন উপলব্ধি হয়। তখন তাঁহাকে

আমরা ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় বলিয়া চিনিতে পারি। চিনিতে পারি, তিনি দেশের উদ্ধারের জন্য উদয় হইতেছেন, তিনি দেশের উন্নতিকল্পে সজ্জিত হইতেছেন। চিনিতে পারি, এই হিমালয় অতিক্রমী তিব্বতভ্রমী রামমোহন রায় একদিন সাতসমুদ্র পার হইয়া আবার বিলাতে যাইবেন, ফ্রান্সে সম্মানিত হইবেন, বিলাতে আবার ফিরিয়া আসিবেন, বিলাতের সর্ব্বস্থানে পূজিত হইবেন, এবং সেই সাত সমুদ্র পারে বিদেশীয় শোভাময়ী ব্রিষ্টলনগরীতে পূজার সহিত দেহত্যাগ করিবেন। চিনিতে পারি, রামমোহন রায়ের এই হৃদয়বল এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবার নহে, বঙ্গদেশে তাহা ধরিবে না, তাহা বিস্তীর্ণ হইয়া সমুদায় পৃথিবী একদা গ্রহণ করিতে উদ্যত হইবে। একস্থানে আবদ্ধ হইলে ইহার তেজ কত, তাহা বঙ্গদেশ জানিয়াছে। বিস্তীর্ণ হইলে, ইহার প্রসার কত, তাহা বিদেশীয়গণ বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছেন।

সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসী হইতে রামমোহন রায়ের অনেক প্রভেদ। এই প্রভিন্নতা না থাকিলে রামমোহন রায় যে তরুণবয়সে সংসার ধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তিনিও হয় ত একজন সন্ন্যাসী হইতেন। আর যে সময়ে রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সে সময়ে সন্ন্যাসধর্ম্মেরও বিশেষ গৌরব ছিল। সেই গৌরব রামমোহন রায়ও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন। তখন সন্ন্যাসী হওয়ার দৃষ্টান্তেরও বঙ্গধামে অভাব ছিল না। ঈশ্বরোপাসনার জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া তখন গৌরবের বিষয় বলিয়া লোকে জ্ঞান করিত। সে কালের অনেক সন্ন্যাসীও হয় ত আজিও জীবিত আছেন। দুই কারণে রামমোহন রায়কে সন্ন্যাসী করে নাই।

প্রথম কারণ এই; যে জন্য সন্ন্যাসিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া যান, রামমোহন রায় সে কারণে যান নাই। সন্ন্যাসিগণ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য প্রলোভনপূর্ণ, মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যান। রামমোহন রায় সংসার পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু সংসার তাঁহাকে দাঁড়াইতে স্থল দেয় নাই। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য সংসারের বহির্দ্দেশে যান নাই। কিন্তু তিনি তত্ত্বানুসন্ধায়ী ছিলেন। সকল ধর্ম্মের সার কি, তিনি অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সকল ধর্ম্মের দোষগুণ বিচারোদ্দেশে তিনি দেশে দেশে বেড়াইতেছিলেন। এইরূপে তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ না হইলে তাঁহাকে ধর্ম্মসংস্কারক মহাত্মা রামমোহন করিতে পারিত না। সংসার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপকারসাধন করিয়াছিল। তাঁহাকে ভবিষ্যৎ রামমোহন রায় করিয়া দিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ, রামমোহন রায়ের হৃদয়। রামমোহন রায়ের হৃদয় সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ের মত যদি শুষ্ক, নির্ম্মম হইত, রামমোহন রায় হয় ত তত্ত্বানুসন্ধানের পর ঈশ্বরোপাসনার জন্য সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতেন। কিন্তু রামমোহন রায় হৃদয়শূন্য লোক ছিলেন না। যে নির্ম্মম জনসমাজমধ্যে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সেই সমাজের জন্য রামমোহনের তরলহৃদয় অতি তরুণ বয়সেই কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই পরিবারমধ্যে যখন সতীদাহের দৃষ্টান্ত ঘটে, তখনই তাঁহার হৃদয় একেবারে ওতপ্রোত হইয়া আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি তখনই যে উচ্চরবে কাঁদিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাতেই তাঁহার হৃদয়ব্যথার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে! তাঁহার মমতা লোকের জন্য ছিল না, তাহা ব্যক্তিগত মমতা ছিল না, কিন্তু তাঁহার মমতা মানবজাতির প্রতি ছিল। তিনি একজনের জন্য যত না কাঁদিতেন, সমাজের জন্য ততোধিক কাঁদিতেন।

রামমোহন রায় একজন বিশেষরূপে সামাজিক লোক ছিলেন। সমাজের রোদন তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিত। সমাজের অমঙ্গল তাঁহার হৃদয়কে আলোড়িত করিত। তিনি বঙ্গসমাজের দুরবস্থা দেখিয়াছিলেন মাত্র নহে, সেই দুরবস্থার জন্য অহরহঃ মনে মনে কাঁদিতেন। তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে সেই দুরবস্থার ভাব প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করিয়াছিল; তাঁহার সহৃদয়তা সেই দুরবস্থা অপনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। তিনি ভারতের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় স্বদেশে আকৃষ্ট ছিল, স্বদেশের দুঃখের জন্য কাঁদিত। তাঁহার হৃদয় যে প্রকৃতপক্ষে কাঁদিত, স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া যখন তিনি তাহার দুঃখমোচনের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইয়াছিলেন, কায়মনোবাক্যে তাহার হিতকামনায় নিরত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সেই হৃদয়ব্যথার একদা পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি আত্মস্বজনের জন্য তত ভাবিতেন না, কিন্তু সমগ্র বঙ্গসমাজ ও জাতির জন্য ভাবিতেন। এ প্রবৃত্তি কি সন্ন্যাসিগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করে। সন্ন্যাসিগণ কেবল আত্মোন্নতির জন্য ব্যস্ত। আপনার মুক্তিসাধনের জন্য দিনরাত অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা সংসারের মায়া মমতা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ফেলেন। হৃদয়ের সকল প্রবৃত্তি ও বাসনা বিসর্জ্জন দেন। আত্মীয়স্বজনের প্রতি স্নেহ মমতা ভুলিয়া যান। সংসারের কেহই তাহাদিগের ভাবনার বিষয় নহে। কাহার প্রতি দয়া নাই, শ্রদ্ধা নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই। কাহারও জন্য এবং কিছুরই জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে কখন ব্যথা উপস্থিত হয় না। যদি হয়, তাহা তাহারা দমন করে। তাহারা হৃদয়কে ক্রমশঃ শুষ্ক ও

নীরস করিয়া ফেলে। প্রথমেই যখন তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিল, তখনই তাহারা একদা তৎসঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছিল। সেই মন, সেই হৃদয় তাহারা বরাবর রক্ষা করিয়া আসিতে থাকে। কোন কোমল প্রবৃত্তির অঙ্কুরমাত্র তাহাতে জন্মিতে পারে না। অঙ্কুরোৎপত্তি হইবামাত্র তাহা বিনষ্ট করে। কারণ তদ্রূপ অঙ্কুরকে স্থান দেওয়াই তাহাদিগের পক্ষে মহাপাতক। এ হৃদয় কি মানবোচিত? এ ব্যক্তিগণকে কি সংসারে স্থান দেওয়া উচিত? তাহারা সংসারের জন্য নহে, সংসারও তাহাদিগকে চাহে না। তাহারা যত শীঘ্র সংসার হইতে দূরীকৃত হয়, যত শীঘ্র তাহাদিগের পাপদৃষ্টান্ত সংসারকে স্পর্শ না করে, ততই সংসারের পক্ষে মঙ্গল ও শ্রেয়স্কর। রামমোহন রায় এ ধাতুর লোক ছিলেন না। তিনি এরূপ হৃদয়ে সংসারধাম পরিত্যাগ করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন নাই। এরূপ হৃদয় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। এরূপ হৃদয়ে তিনি স্বদেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্যাপৃত হন নাই। যখন তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন তাঁহার হৃদয়কোষ স্বদেশের মমতায় ও স্বজাতির হিতকামনায় পরিপূর্ণ ছিল। তিনি গৃহে আসিয়া সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হৃদয়বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন এবং সকল নিন্দার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারই জন্য তিনি বিদূর বিদেশবাসে প্রাণপক্ষিত্যাগ করিলেন।

আশ্চর্য্য এই, রামমোহন রায়ের হৃদয়ে এই প্রকার সামাজিক প্রবৃত্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল। যে অপবিত্র, ঘোর স্বার্থপর জনসমাজক্ষেত্রে রামমোহন রায় বাস করিতেন, সে গগনে এ প্রবৃত্তির সুখস্পর্শ বায়ু কখন বহিত না। যে লোকমণ্ডলীমধ্যে তিনি বাস করিতেন, সে লোকমণ্ডলীর স্বপ্নেতেও কখন এ প্রবৃত্তির বিষয় উদয় হয় নাই। তখন ইউরোপীয় ভাব দেশমধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই। তখন ইংরেজী সাহিত্যে রামমোহন রায় শিক্ষিত হন নাই। সাহিত্য অধ্যয়ন করিলেই এরূপ ভাব তন্মধ্য হইতে গ্রহণ করা বড় সহজ লোকের কার্য্য নহে। রামমোহন রায় এই প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের দুরবস্থা তাঁহার এই প্রবৃত্তিরই স্ফূর্ত্তিসাধন করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া তাঁহার হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়াছিল। এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত জীবন উত্তেজিত হইয়া কার্য্যময় হইয়াছিল। তিনি নিশ্চেষ্ট, ও নিরীহ বাঙ্গালি ছিলেন না। তাঁহার হৃদয়বল ও চেষ্টায় দেশশুদ্ধ আলোড়িত হইয়াছিল। তিনি স্বদেশের

প্রবৃত্তিস্রোতকে ভিন্ন দিকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবৃত্তি তাঁহাকে একজন অসাধারণ লোক করিয়াছিল। একজন মহাজনের যশোগৌরবে উত্তোলিত করিয়াছিল। তিনি ইহারই জন্য সমগ্র বাঙ্গালিজাতি হইতে পৃথক্ হইয়াছেন।

রামমোহন রায় স্বদেশহিতৈষী সন্ন্যাসী ছিলেন। ঐশ্বরিক ধ্যান ও জ্ঞানে তাঁহার সন্ন্যাস নিয়োজিত ছিল না; কিন্তু তাঁহার সন্ন্যাস ঐশ্বরিক সর্ব্বাঙ্গীণ উপাসনা। যে উপাসনা কেবল ঐশ্বরিক ধ্যানে নিঃশেষিত হয় না; যাহার প্রধান কার্য্য ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্যসাধন করা, রামমোহন রায় সেই কার্য্যময় উপাসনায় বিশেষরূপে নিরত ছিলেন। এই উপাসনায় নিরত হইয়া রামমোহন রায় যেরূপ কঠিন যোগসাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি দিবারাত্র এই সাধনায় অনুরক্ত থাকিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি বিব্রত হইয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কার্য্যময় জীবনে বিশ্রান্তি ছিল না। এক কার্য্য সমাধা করিয়া অন্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। স্বদেশের মঙ্গল যখন যেরূপে তাঁহার নিকট উদয় হইয়াছিল, তখন তিনি সেইরূপে তাহা সাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি অনেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, অনেক মঙ্গলকার্য্য সাধন করিয়াছেন। তাঁহার তুল্য লোক আজি পর্য্যন্ত জন্মে নাই বলিয়া তাঁহার প্রারম্ভিত অনুষ্ঠানপ্রণালী অবলম্বিত হইল না। তাঁহার জীবন অগ্নিময় অনুরাগে পরিপূর্ণ ছিল। এখন সে অগ্নিরাশি চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে রাশির তাপ ও তেজঃ ক্ষুদ্র অগ্নিতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক্ষণকার স্বদেশহিতৈষী কতিপয় বাঙ্গালির জীবনে ইহাই প্রমাণিত করে মাত্র। আমরা আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালির জীবন রামমোহন রায়ের মত কার্য্যময় ও উদ্যোগপূর্ণ দেখি নাই। সমুদায় জীবন কেবল মঙ্গলময় উদ্যোগ ও অনুষ্ঠানে উৎসর্গিত দেখি নাই। কার্য্যের পর কার্য্য, অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান, ব্রতের পর ব্রতে কাহারও জীবন অবিশ্রান্তভাবে নিয়োজিত হয় নাই। বিশ্রাম কাহাকে বলে রামমোহন রায়ের জীবনে তাহা লক্ষিত হয় নাই। এই কঠিন কার্য্যময় যোগসাধনায় রামমোহন রায় জীবনকে উৎসর্গিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালির মধ্যে এরূপ যোগী ত কখন জন্মে নাই, অপর জাতিমধ্যেও এরূপ যোগী প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। দুঃখের বিষয় ইহার দৃষ্টান্ত আজি পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালি অবলম্বন করেন নাই।

যে দেশের দুরবস্থা যত, সে দেশের সন্তানগণের কার্য্যভার তত গুরুতর। ভারতের দুরবস্থা যত, ভারতের সন্তানগণের কর্ত্তব্য তত কঠিনতর। এরূপ কর্ত্তব্যজ্ঞান ভারতসন্তানগণের মধ্যে

কাহার আছে? বোধ হয় রামমোহন রায়ের এই জ্ঞান অন্তরে পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ছিল। তিনি জানিতেন আমার স্বদেশ যতদূর দুরবস্থাগ্রস্ত, তাহার মঙ্গলোদ্দেশে ততদূর উদ্যোগী হওয়া আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ কর্ত্তব্যজ্ঞানে রামমোহন রায় তাঁহার সদনুষ্ঠান ব্রতে উত্তেজিত হন নাই। সেই জ্ঞান যে অনুরাগ আনিয়া দিয়াছিল, তাহা একটি প্রবল রিপুরূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি সেই রিপুবশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যতক্ষণ না লোকে কোন রিপুর বশবর্ত্তী হয়, ততক্ষণ তাহার সমস্ত জীবনকে ব্যাপৃত করিতে পারে না। রামমোহন রায়ের জীবনে এই রিপু ক্রমশঃই প্রবল হইতেছিল। তিনি সেই প্রবল রিপুর বশবর্ত্তী হওয়াতে তাঁহার সমুদায় জীবন দেশের মঙ্গলময় কার্য্যাবলীতে ব্যাপৃত হইয়াছিল। এই রিপু তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী রামমোহন রায় করিয়াছিল। আশ্চর্য্য রামমোহন রায়ের কার্য্যশক্তি, আশ্চর্য্য তাঁহার যোগসাধনা!

রামমোহন রায় একজন অধ্যয়নশীল লোক ছিলেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিস্তর গ্রন্থ তন্ন তন্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিলেন; ইংরেজিভাষা সুন্দর জানিতেন। তদ্ব্যতীত তিনি চারিটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার যখন যে গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন হইত, একদিনে তাহা অধ্যয়ন করিতেন। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ তিনি এইরূপ একদিনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অধ্যয়নকালে তাঁহার আহার নিদ্রা মনে থাকিত না। যখন যে গ্রন্থের আবশ্যক হইত, তিনি কলিকাতাময় তজ্জন্য অন্বেষণ করিতেন। কিন্তু তিনি যে শুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য এতদূর অনুরক্ত ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সুধীগণের মত শুদ্ধ বিদ্যার প্রতি অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নশীল হয়েন নাই। তিনি যে মহৎ লক্ষ্যে সমুদায় জীবনকে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, অধ্যয়নশীলতা ও জ্ঞানলাভ তাহার অন্যতর উপায়মাত্র ছিল। ইহা তাঁহার একটি প্রধান উপায় ছিল। তাঁহার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিবার এই প্রধান উপায় ছিল। তিনি ইহাদ্বারা প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত ও নীরব করিয়া সত্যজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচার করিতেন। পৃথিবীতে সত্যের পতাকা দৃঢ়রূপে প্রোথিত করিতেন।

রামমোহন রায়ের জীবনে একটি সুন্দর শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত আছে। হৃদয়ভাব ক্রমশঃ কেমন প্রসারিত হয়, প্রীতি ক্রমশঃ কেমন বর্দ্ধিত হয়, স্বদেশ হিতৈষণা ও স্বজাতিপ্রেম ক্রমশঃ কেমন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয় ইহা রামমোহন রায়ের জীবনে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে। রামমোহন রায় প্রথমে স্বদেশের ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত হন। সেই ধর্ম্মসংস্করণ কার্য্যে তাঁহাকে যে উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার হৃদয়ানুরাগ ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়াছিল। সেই কার্য্যে তিনি আরও দৃঢ়রূপে ব্রতী

হইয়াছিলেন। যাহাতে সামান্য জনগণকে নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যোগী করে, তাহাতে রামমোহন রায়কে দ্বিগুণতর উদ্যোগ ও উৎসাহে পূর্ণ করিয়াছিল। মহজ্জনগণের জীবনের এই একটি সুন্দর ভাব। উৎপীড়নে তাঁহাদিগের সদনুরাগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। রামমোহন রায়ের এই বর্দ্ধিত অনুরাগ শুদ্ধ স্বদেশীয় ধর্ম্মসংস্করণে নিঃশেষিত হয় নাই। ইহা ক্রমে স্বদেশহিতৈষণায় উত্থিত হইয়াছিল। যাহা প্রথমে ধর্ম্মে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে সামাজিক মঙ্গলমাত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসংস্কারক ক্রমে স্বদেশহিতৈষী পেট্রিয়টের মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। স্বদেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গল রামমোহন রায়ের আলোচ্য হইয়াছিল। ধর্ম্মীয় হিতকামনা সামাজিক হিতকামনায় উন্নত হইল। তাঁহার হস্ত স্বদেশের সর্ব্ববিধ মঙ্গলকার্য্যে প্রসারিত হইল। যে হৃদয়াকাশে সন্ধ্যাকালে কেবল একটি মাত্র উজ্জ্বল তারকা ফুটিয়াছিল, সেই হৃদয়াকাশে ক্রমশঃ সহস্র তারকা একে একে প্রস্ফুটিত হইল। অবশেষে তাহা বিশ্বপ্রেমের চন্দ্রালোকে আলোকিত হইয়া গেল। যে রামমোহন রায় একদিন শুদ্ধ স্বদেশের মঙ্গলোপায় ভাবিতেন, সেই রামমোহন রায় পরে ইংরেজ ও ফরাসীসমাজের উন্নতি কল্পনায় একদিন মস্তক আলোড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যখন রামমোহন রায়ের বিশ্বপ্রেমপ্রবৃত্তি কেবলমাত্র সঞ্জাত হইতেছিল তখনই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। আমরা তাঁহাকে স্বদেশহিতৈষী বলি, বিদেশীয়গণ তাঁহাকে বিশ্বপ্রেমিক বলেন। বিদেশীয়গণ অবশ্য তাঁহার বিশ্বপ্রেমের বিশিষ্টরূপ পরিচয় পাইয়াছেন। যদিও স্বদেশ তাঁহার মনকে এত অধিকার করিয়াছিল যে, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বপ্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে নাই, তথাপি আশ্চর্য্য এই, বিদেশীয়গণের নিকট তাঁহার সার্ব্বভৌমিক প্রীতির এতদূর পরিচয় হইয়াছিল যে, তাহারা তাঁহাকে একজন বিশ্বপ্রেমিক নামে অভিহিত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

আমরা রামমোহন রায়ের অনেকগুলি গুণের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এই সমস্ত গুণ তাঁহার জীবনীতে সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পান। এক্ষণে রামমোহনের নাম প্রধানতঃ যে জন্য এদেশ মধ্যে সুপ্রচারিত আছে তাহারই বিষয় আলোচনা করিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। দুই কারণে রামমোহনের নাম ভারতমধ্যে সুবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি এদেশে প্রকৃত ও বৈদিক হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা প্রবর্ত্তিত করেন এবং তৎপরে একেশ্বরের সার্ব্বভৌমিক সামাজিক পূজার পরিস্থাপনা করিয়া যান। এই দুই কার্য্যে তিনি যে শুদ্ধ এতদ্দেশীয় ধর্ম্মীয় জগৎকে আলোড়িত করিয়াছেন

এমত নহে, সেই জগতের প্রবৃত্তিস্রোতকে বিভিন্ন দিকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া দিয়াছেন। বলিতে গেলে, তিনি এদেশের ধর্ম্মীয় জগতে এক মহাবিপ্লবসাধন করিয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যের আলোচনা এদেশে বহুকাল হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিরূপে ও কোন সময় হইতে এরূপ ঘটিয়াছিল, তাহা আজি নিরূপণ করা একপ্রকার অসাধ্য কার্য্য। পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, কিন্তু মুসলমানরাজত্বকালে ত্রয়ীবিদ্যার আলোচনা একেবারে প্রায় উঠিয়া গিয়াছিল বলিলেও বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডের আবশ্যক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শুদ্ধ সেই শাস্ত্রের আলোচনা করিত। এমত কি, মনুর স্মৃতিশাস্ত্র যে ক্রিয়াকাণ্ডের নিদানভূত, সেই স্মৃতিরও মতামত সর্ব্বসময় পরিগৃহীত হইত না। সুতরাং তাহারও আলোচনা ক্রমশঃ বিলোপ হইয়াছিল। এ সমস্ত শাস্ত্রের স্থানে, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সাহিত্য এবং কথঞ্চিৎ বৈষ্ণবগ্রন্থাদির আলোচনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় যে সময়ে উদিত হন, তখনকার কালে বঙ্গদেশে শাস্ত্রালোচনা একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সময়কার অবস্থা সমালোচ্য গ্রন্থের একস্থানে সুন্দর বর্ণিত আছে। আমরা সে স্থলটি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পাঠকগণ তখনকার অবস্থার সহিত এখনকার সামাজিক অবস্থা তুলনা করিয়া দেখুন।

"রামমোহন রায় যে সময়ে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সমুদয় বঙ্গভূমি অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর তাহার সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। বেদের যে সকল ধর্ম্মকাণ্ড, উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না; কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান নন্দোৎসবের কীর্ত্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকেরা মহা আমোদে, মনের আনন্দে কালহরণ করিত। গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদিদ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অর্জ্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইহার বিপক্ষে কেহ একটি কথাও বলিতে পারিতেন না। অন্নের বিচারই ধর্ম্মের কাষ্ঠাভাব ছিল, অন্নশুদ্ধির উপায়েই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত। স্বপাক হবিষ্যভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিত্রকর কর্ম্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতায় বিষয়ী ব্রাহ্মণেরা ইংরেজদিগের অধীনে বিষয়কর্ম্ম করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। তাঁহারা কার্য্যালয় হইতে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া অব-

গাহন স্নান করিয়া ম্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত হইতেন এবং সন্ধ্যা-পূজাদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টমভাগে আহার করিতেন। ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বত্র পূজ্য হইতেন এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদের যশঃ সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতেন। যাঁহারা এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন, তাঁহারা কার্য্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা পূজা হোম সকলই সম্পন্ন করিতেন; এবং নৈবেদ্য ও টাকা ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেন; তাহাতেই তাঁহাদিগের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত হইত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তখন সংবাদপত্রের অভাব অনেক মোচন করিতেন। তাঁহারা প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজার চিহ্ন কোশাকুশি হস্তে লইয়া সকলেরই দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেন এবং দেশ বিদেশের ভাল মন্দ সকলপ্রকারই সংবাদ প্রচার করিতেন। বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎসবে কে কত পুণ্য করিলেন, ইহারই সুখ্যাতি ও অখ্যাতি সর্ব্বত্র কীর্ত্তন এবং ধনদাতাদিগের যশঃ ও মহিমা সংস্কৃত শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা প্রশংসালাভের আশ্বাসে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যদিগকেও যথেষ্ট দান করিতেন। শূদ্র-ধনীদিগের উপর তাঁহাদিগের আধিপত্যের সীমা ছিল না। তাঁহারা শিষ্য-বিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও পাদোদক দিয়া কাহাকেও পদধূলি দিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অদ্যাপি গ্রামে নগরে বিদ্যমান রহিয়াছে। তখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রে ও স্মৃতিশাস্ত্রে অধিক মনোযোগ দিতেন এবং তাঁহাতে যাঁহার যত জ্ঞানানুশীলন থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন হইতেন। কিন্তু তাঁহাদের আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতিদিন তিনবার করিয়া যে সকল সন্ধ্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন তাহার অর্থ অনেকে জানিতেন কি না সন্দেহ। বিষয়ী ধনীদিগের মধ্যে ত কোন প্রকার বিদ্যাচর্চ্চা ছিল না। চলিত বাঙ্গালাভাষায় ব্যাকরণ জানা দূরে থাকুক কাহারও বর্ণাশুদ্ধি জ্ঞান ছিল না। বিষয়কর্ম্মের উপযোগী পত্রলেখা ও অঙ্কজানা থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পারসী পড়িতে ও ইংরেজি অক্ষর ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন; তাঁহারা বিদ্যার গরিমা আর মনে ধারণ করিতে পারিতেন না। তখনকার বাঙ্গালা পুস্তকের মধ্যে কেবল চৈতন্য চরিতামৃত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, আর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রসিদ্ধ; এ সকলই পদ্যের; গদ্যের গ্রন্থ তখন একখানিও ছিল না। বুলবুলি ও ঘুঁড়ীর খেলা, কৃষ্ণযাত্রা ও কবির লড়াই, বিন্ সেতার ও তবলাতেই তখনকার কলিকাতার যুবাদিগের আমোদ ছিল, এবং তাঁহারা দোলের আবির খেলার

ন্যায় নন্দোৎসবের গোলা হরিদ্রা লইয়া পথে ঘাটে দলে দলে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেন ও দেবকীপ্রসূতির প্রসাদ ঝালের লাড়ু ভক্তিপূর্ব্বক খাইতেন। তথাপি অনেক রক্ষা এই ছিল যে, তখন পানদোষ তাহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই এবং ইউরোপদেশের বিজাতীয় সভ্যতার কলঙ্ক তাহাতে লিপ্ত হয় নাই।”

বঙ্গদেশের যখন এইরূপ অবস্থা, রামমোহন রায় তখন জন্মগ্রহণ করেন। দেশ যখন অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ, রামমোহন রায় তখন শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করেন। অতি তরুণ বয়সেই পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ জন্মে এবং সেই পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়েন। ইহার ফলাফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছে। যাহাতে তাঁহার মত সমর্থন করিতে পারেন এরূপ গ্রন্থাদি তিনি নানাদেশে গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং ফিরিয়া আসিয়া তাহারই সম্যক্ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। তিনি স্বদেশীয়গণের মন সেই সকল এক ব্রহ্মপ্রতিপাদক গ্রন্থাদির প্রতি প্রথম আকৃষ্ট করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন পুরাণাদির অলীক মতামতসমূহ দেশমধ্যে এতদূর সুপ্রচারিত যে তাহাতে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরসম্বন্ধীয় প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। যে মূল বৈদিকশাস্ত্রে, উপনিষদে ও দর্শনাদিতে সেই প্রকৃততত্ত্ব সমুদায় প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আলোচনা দেশমধ্যে কিছুই নাই। অথচ হিন্দুজাতির তাহাই প্রধান ও মূল শাস্ত্র। এজন্য তিনি সেই শাস্ত্রের প্রতি যাহাতে সাধারণ জনগণের মন আকৃষ্ট হয় এমত চেষ্টা করিয়া ছিলেন। সে চেষ্টা যে বিফল হইয়াছে এ কথা কেহ বলিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারই সময় হইতে বেদ ও দর্শনাদির আদর বৃদ্ধি হইয়াছে।

মাষ্টার ফেয়ারবেয়ারণ (fairbairn) বলেন * যে আর্য্যজাতির শাস্ত্র মধ্যে যে একেশ্বরবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার সহিত সেমেটিক জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র-নিহিত একেশ্বরবাদের একটু বিভিন্নতা আছে। তিনি কহেন আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল প্রকৃতি-পূজা। আদিতে এই প্রকৃতি পূজাই প্রচলিত ছিল। প্রকৃতি পূজা হইতে আর্য্যজাতি একেশ্বরবাদে উত্থিত হয়েন। এজন্য তিনি বলেন যে যদিও আমরা দেখিতে পাই যে আর্য্যজাতীয় একেশ্বরবাদে ঈশ্বরের একত্ব ব্যক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেমিটিক জাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে যেমন বলে যে সেই এক ঈশ্বর ব্যতীত আর দ্বিতীয়

---

* In his *Studies on the Philosophy of Religion.*

ঈশ্বর নাই, দেব দেবতা সকলই মিথ্যা, একেশ্বরবাদের এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আর্য্যশাস্ত্রে যেমন একদিকে বলিয়াছে ব্রহ্ম একমাত্র, অন্যদিকে বলিয়াছে তাঁহার সহস্র অবতার। কিন্তু সেমেটিক জাতীয় ধর্ম্মে এক ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় দেবতার অস্তিত্ব ও অবতারণ অসম্ভব। জিসস এই একেশ্বর বাদ শিক্ষা দেন। মহম্মদ ইহার প্রধান উপদেশক।* ফেয়ারবেয়ারণের এসমস্ত কথা কতদূর সত্য তাহা এস্থলে আলোচিত হইতে পারে না। তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। কিন্তু রামমোহন প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে আর্য্যজাতীয় ধর্ম্মেও ফেয়ারবেয়ারণ যাহাকে সেমেটিক জাতীয় একেশ্বরবাদ বলেন, তাহা সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তিনি এক নিরাকার ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রহ্ম নাই এই বৈদিক মতদ্বারা পৌত্তলিকতার সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করিয়াছেন। যাঁহারা সেই বেদাদি হইতেও দ্বিতীয় ব্রহ্ম অথবা দেবতার কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদিগের বিপক্ষে আপন মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে রামমোহনের যুক্তি সমুদায় কতদূর শাস্ত্রসঙ্গত তাহা এখনও সমালোচ্য হইতে পারে। এমত হইতে পারে যে, রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদ সম্বন্ধীয় মত মহম্মদীয় অথবা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম হইতে প্রথমে গৃহীত হইয়া থাকিবে; তৎপরে তিনি সেই মত হিন্দুধর্ম্মে আরোপ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয়ের স্বরূপ নিরূপণ যে রূপই হউক না কেন, উপনিষদ ও দর্শন শাস্ত্রে ঐশ্বরিক কল্পনা যে অতি পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বর যত কেন পরিস্ফুটরূপে পরিব্যক্ত হউক না, তাহা কেবল কল্পনা ও নীরস চিন্তার বিষয় মাত্র ছিল, তাহা কেহ কখন পূজার বিষয় করেন নাই। পাতঞ্জলের ঈশ্বরভক্তি কখন পূজাতে পরিণত হয় নাই। তাহা কেবল শুদ্ধ

* Mr. Fairbairn traces upwards IndoEuropean religion from its more complete to its simpler forms, until he finds it in that condition which is generally understood by the word Monotheism, but which, it must be admitted, is more accurately designated as Henotheism, the affirmative belief in one God without the sharply defined exclusive line, which makes it a belief in Him as the only God. This latter form of Monotheism proper may be rather the semetic than the Aryan Conception.— *W. E Gladstone.*

ঈশ্বরকল্পনা করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু দার্শনিক ঈশ্বরকল্পনা ও পূজার ঈশ্বর এ দুই বিভিন্ন ভাব। দার্শনিকতত্ত্বে ঈশ্বরের অনেক স্বরূপ নিরূপণ হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন মুনি, ঋষি আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ঐশ্বরিক পূজাপ্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। ঈশ্বরকে কেহ ব্যক্তিস্বরূপ দর্শন করে নাই। দর্শনশাস্ত্রে ঈশ্বরের একত্ব অদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহা কেবল মতখণ্ডনমাত্র। কোন উপনিষদ বা দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতা ঐশ্বরিক ধর্ম্মস্থাপন করিয়া যান নাই। ধর্ম্মের ঈশ্বর পূজার বিষয়, কিন্তু দর্শন ও তত্ত্ববিদ্যার ঈশ্বর কেবল চিন্তার ফলমাত্র।*

রামমোহন রায় এই বৈদিক ও দার্শনিক ঈশ্বরকে পূজার বিষয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপনিষদ ও দর্শনের ঐশ্বরিক তত্ত্ব কেবল নিরূপণ ও উৎঘোষণ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, সেই শুষ্ক ও নীরস চিন্তার বিষয়কে পূজার সামগ্রী করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তিনি দর্শনশাস্ত্র হইতে ঈশ্বরকে বিমুক্ত করিয়া দেবালয় ও মন্দিরে বেদির উপর তাঁহাকে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "রামমোহন রায় নূতন কি করিয়া গিয়াছেন? নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা কি নূতন? সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভক্তিভাজন মহর্ষিগণ নিরাকার ব্রহ্মকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ অনুভব করিয়াছিলেন।" অনুভব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যরূপে তাঁহার অর্চ্চনাপ্রণালী কেহ স্থাপন করিয়া যান নাই। এদেশে দেবাদির অর্চ্চনাপ্রণালী যেমন প্রবর্ত্তিত আছে একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী সেরূপ প্রবর্ত্তিত করিতে কোন মুনি ঋষি কখন যত্ন করেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম নিরীশ্বর ছিল। অথবা তাহা বৌদ্ধদেবের উপাসনাপ্রণালী মাত্র। রামমোহন যথার্থ একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ভারতে এই তাঁহার নূতন কার্য্য। আশ্চর্য্য এই, যে ভারতে ঐশ্বরিকতত্ত্বের চরম সীমায় মানবচিন্তা উত্থিত হইয়াছে সে ভারতে কখন ঐশ্বরিক পূজা বিদ্যমান ছিল না। যদি থাকে, তাহা সাধারণ্যে প্রচলিত হয়

* Mr, Fairbairn recognises the tendency of the semetic races to Monotheism, and considers that IndoEuropean man not only has been tolerant of the different gods of different nations, but has conceived the Divine Unity as abstract, while the semite holds it as personal. The IndoEuropean tendency was to religious multiplicities, but to philosophic unities. The God of a religion is an object of worship; the deity of a philosophy is. product of speculation—*W. E. Gladstone.*

নাই। আশ্চর্য্য এই, যে ভারতে ঈশ্বর-চিন্তা এতদূর উন্নত হইয়াছে যে, আজিও ইউরোপীয় দর্শন তদূর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই, সেই ভারত চিরকাল পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ ছিল! আশ্চর্য্য এই, যে মুনি ঋষিগণ ঐশ্বরিক ভাবে ততদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখন নিজ নিজ নবভাবে মোহিত হইয়া দেবপূজাস্থলে একেশ্বরের অর্চ্চনা প্রতিষ্ঠা করিয়া যান নাই। সে কার্য্যের জন্য যে একজন রামমোহনের আবশ্যক হইবে এই আশ্চর্য্য। দুইসহস্র বৎসর মধ্যে ভারতে কি এমত কেহ জন্মেন নাই যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠেন।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে প্রকৃত ঐশ্বরিক পূজা নাই। নিজে জিসস ও তদীয় শিষ্যগণ যে ঐশ্বরিক পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে মানস করিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানেরা সে ঐশ্বরিক পূজাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। মহম্মদীয় ধর্ম্মে কেবল ঐশ্বরিক পূজা আছে। কিন্তু সে ঐশ্বরিক পূজায় নিতান্ত অমুদার মুসলমান ভিন্ন অন্য কেহ অধিকৃত নহে। মহম্মদীয় ঐশ্বরিক কল্পনাও তত বিশুদ্ধ নহে। তদপেক্ষা জিসসের ও হিন্দুশাস্ত্রীয় ঐশ্বরিক কল্পনা অধিকতর বিশুদ্ধ ও পবিত্র। রামমোহন যে ঐশ্বরিক কল্পনা গ্রহণ করেন তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদিগের উপনিষদ ও দর্শনেও যখন সে কল্পনা অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে পাওয়া যায়, তখন অন্য ধর্ম্মের কল্পনা গ্রহণ করা অন্যায়। তিনি এই উপনিষদের ঈশ্বরের উপাসনা জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা করিলেন। এক্ষণকার ব্রাহ্মসমাজ রামমোহন রায়ের সুমহৎ কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ভারতে ঐশ্বরিক উপাসনাপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করা নূতন কার্য্য হইলেও জগতে তাহা নূতন কার্য্য নহে। জগতের মধ্যে রামমোহন রায় কি নূতন কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। রামমোহনরায়প্রবর্ত্তিত একেশ্বরের উপাসনাপ্রণালী মধ্যেও একটি নূতন ভাব বিদ্যমান আছে। আমাদিগের গ্রন্থকার রামমোহন রায়ের সেই প্রধান ভাবটি এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"মহাজনগণের জীবনবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যায় যে, নানা মহৎ ভাবের মধ্যে একটি ভাব প্রধান হইয়া তাঁহাদিগের জীবনপথের নেতাস্বরূপ হয়। তাঁহারা যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, সেই ভাবটি তন্মধ্যে মধ্যবিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে। 'আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন' উপনিষদকারদিগের ইহাই প্রধান ভাব। 'বিশ্বব্যাপী মৈত্রী' বুদ্ধদেবের ইহাই প্রধান ভাব। 'আপনাকে আপনি জান,' সক্রেটিসের ইহাই প্রধান ভাব। 'একমাত্র ঈশ্বরের পূজা, অপর সকল দেব-পূজার প্রতিবাদ' মহম্মদের ইহাই প্রধান ভাব। 'ধর্ম্মচিন্তায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' লুথরের ইহাই প্রধান ভাব। 'ভক্তিতেই মুক্তি'

চৈতন্যের ইহাই প্রধান ভাব। 'মানবপ্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি' থিওডোর পার্কারের ইহাই প্রধান ভাব। সেইরূপ রাজা রামমোহন রায়ের প্রধান ভাব 'সার্ব্বভৌমিক উপাসনা।' কেবল তাহাই নহে, সেই সার্ব্বভৌমিক উপাসনার জন্য সমাজপ্রতিষ্ঠা, এটীও জগতের পক্ষে নূতন। দ্বিতীয় ভাবটী প্রথম ভাবেরই অন্তর্ভুক্ত। এই ভাবের মৌলিকত্ব কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।"

রামমোহন রায়ের এই উদারভাব তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডিডে প্রকাশিত আছে। তিনি এইরূপ উদারভাবে এক ব্রহ্মের প্রকাশ্য উপাসনালয় স্থাপন করিয়া ভারতে অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। আজি সেই ব্রাহ্মসমাজ নানা শাখাবিশাখায় বিস্তৃত হইয়া ঈশ্বরের যশোঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে রামমোহন রায়ের সুমহৎ জীবনের পরিচয় দিতেছে। এই ব্রাহ্মসমাজের সহিত রামমোহন রায়ের নাম পৃথিবীতে চিরদিন অবস্থান করিবে।

পূর্ণচন্দ্র বসু

প্রলয়ের জলোদ্ভাবন।

এক্ষণে বাঙ্গালার বহুতর লোক ইংরেজি ভূগোলবৃত্তান্ত শিখিয়াছেন; পৃথিবীর ম্যাপ দেখিয়াছেন, কোথায় কোন সমুদ্র, কোথায় কোন দেশ তাহা ম্যাপে দেখিয়া জল ও স্থলের বিভাগ বুঝিয়াছেন। বুঝিয়া তাঁহারা নিম্নলিখিত কয়টি কথা অনুধাবন করিয়া থাকিবেন, যদি কেহ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া দিই।

(ক) জলের ভাগ পৃথিবীর দক্ষিণ দিকে অধিক; স্থলের ভাগ পৃথিবীর উত্তরদিকে অধিক। ইহা সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু ম্যাপে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

(খ) যদি জিওগ্রাফিওয়ালারা এই কথা স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আর একটি বিষয় দেখুন, দক্ষিণ ভাগের মহাসমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদ্বীপগুলি যেরূপ ভঙ্গীতে স্থানে স্থানে একত্র সন্নিবেশিত আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন এক একটি মহাদ্বীপ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশমাত্র আছে।

এই যে দুইটি বিষয় অতি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিলাম তাহা যদি প্রকৃত বলিয়া কেহ স্বীকার করেন, তাহা হইলে তিনি যেন একটি অনুভবসম্বন্ধে বিচার করেন। অনুভবটি এই :—

এক সময় দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে মহাজল রাশি উচ্ছাবিত হইয়া উত্তরাভিমুখে ছুটিয়াছিল, তাহার মহাবেগ স্থল জঙ্গম পাহাড় পর্ব্বত সকলই ভাঙ্গিয়া, ডুবাইয়া, গলাইয়া দিয়াছিল। যতদূর পর্য্যন্ত সেই মহাস্রোতের বেগ মন্দীভূত না হইয়াছিল ততদূর পর্য্যন্ত আর কিছুই রক্ষা পায় নাই। সেই বেগ দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সুতরাং দক্ষিণ দিকে স্থলভাগ প্রায় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। সেই জলপ্লাবনের নাম প্রলয়। সকল দেশে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে এই প্রলয়ের প্রবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু সকল দেশে সকল শাস্ত্রে বলে যে কেবল বৃষ্টিবর্ষণে পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়াছিল। কোন শাস্ত্রেই বলে না যে দক্ষিণ অংশ হইতে এই জলরাশি সমুত্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ দেখিয়া অনুভব করা যাইতে পারে যে, জলরাশি দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিয়াছিল।

এ অনুভব বোধ হয় অনেকের নিকট অমূলক ও অসঙ্গত। এক্ষণে তাঁহাদের নিকট আর একটি প্রমাণের কথা উত্থাপিত করি। আসিয়া ও মার্কিনদেশের মধ্যবর্ত্তী যে মহাসমুদ্র আছে (Pacific) তাহাই দেখাই; ইহার দক্ষিণভাগ প্রশস্ত উত্তরদিক্ ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ সেই জলরাশির বেগ যত উত্তরে যাইতে হ্রাস পাইয়াছে তত মহাসমুদ্র ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। আবার সেইরূপ অপর মহাসমুদ্র (Atlantic) দেখ; ইহাতে নদীর ন্যায় বক্রতা ও টঁ্যাক আছে, আফ্রিকার যে ভাগ পশ্চিমাংশে বাড়িয়া গিয়াছে, অপর পারে মার্কিনদেশের সেই অংশ সরিয়া গিয়াছে, আবার মার্কিনদেশের যে ভাগ বাড়িয়া আসিয়াছে অপরপারে সেই ভাগ সরিয়া ভিতরে আসিয়াছে। ইহাতে কি বোধ হয়? এই মহাসমুদ্র যখন প্রথম নদীর ন্যায় ছুটিয়াছিল, তখনই এই টঁ্যাক হইয়াছিল। ম্যাপ দেখিয়া যিনি ইহা স্বীকার না করেন, তাঁহাকে কিছু আর বলিবার নাই। যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ করি আর একটি বিষয় স্থির করিতে চেষ্টা করুন। দক্ষিণ কেন্দ্র হইতে কিরূপে এই জলোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল।

আমরা এই পত্রিকার কেবল ১১ ও ১২ সংখ্যা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতে সম্পূর্ণ বৎসরের সূচিপত্র সংলগ্ন থাকায় গত বারমাসে কি কি বিষয় লিখিত হইয়াছিল তাহা জানিতে পারিয়াছি। বিষয়গুলি অধিকাংশই সাহিত্যসম্বন্ধে। সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিষয় লিখিবার সময় অদ্যাপি বাঙ্গালায় হয় নাই, অন্য বিষয়ের পাঠক বাঙ্গালায় নাই।

কয়েক মাস পূর্ব্বে একবার অন্যপ্রসঙ্গ বঙ্গদর্শনে লিখিত হইয়াছিল। "কল্পনা যে কৃতকার্য্য হইবে তাহার আর সন্দেহ দেখিতেছি না।" কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তাহা ভুল, গ্রাহকেরা টাকা দেন না; বোধ হয় কল্পনা কৃতকার্য্য হইবে না। কল্পনাপ্রকাশক নিবেদন হেডিং দিয়া লিখিয়াছেন—"ঈশ্বরানুগ্রহে কল্পনার প্রথমবৎসর সম্পূর্ণ হইল। * * দুঃখের বিষয় তথাপি বৎসরান্তে একটি করিয়া টাকা অনেকের নিকট আদায় হইল না। * * সকলেই যাহাতে অনায়াসে ইচ্ছা করিলেই বিনা কষ্টে দিতে পারেন এইরূপ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খরচ নির্ব্বাহার্থ যৎকিঞ্চিৎ মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল; তবুও ইহারই মধ্যে এই দুঃখের কান্না কাঁদিতে হইতেছে।"

তাহাই বলিতেছিলাম কল্পনা টিকিবে না; কল্পনার দোষ দিতেছি না, দোষ গ্রাহকের। বাঙ্গালি গ্রাহকের কলঙ্ক অতিশয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, "আমি টাকা না দিলে কি ক্ষতি, আর দশজনে ত দিবে, তাহা হইলেই পত্রিকা চলিবে।" বাঙ্গালিরা প্রায় সকলেই এইরূপ ভাবিয়া থাকেন। সকলেই এইরূপ ভাবিলে সর্ব্বনাশ। গল্প আছে যে একবার এক রাজসভায় গোয়ালাদের কথা উত্থাপন হয়, সভাসদ্ সকলেই একবাক্যে বলেন, "গোয়ালামাত্রেই বঞ্চক।" রাজা এ কথা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্বেতপ্রস্তরদ্বারা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী প্রস্তুত করিলেন। রাজ্যের সকল গোয়ালার প্রতি আদেশ করিলেন যে আগামী অমাবস্যার রাত্রে প্রত্যেকে এক এক কলস খাটি দুগ্ধ পুষ্করিণীতে ঢালিয়া যাইবে, কেহ কাহার সহিত একত্রে আসিতে পারিবে না, কি পথে কেহ কাহার সহিত আলাপ করিতে পারিবে না। গোয়ালারা পরস্পর ভাবিল, সকলেই ত খাটি দুগ্ধ দিবে, তবে আমি একা যদি কিছুই না দিই, পুষ্করিণী খালি থাকিবে না পূরণ হইবে। এই ভাবিয়া সকলেই বাটী বসিয়া রহিল, কেহই দুগ্ধ ঢালিল না। বাঙ্গালি গ্রাহক প্রায়ই সেইরূপ। সকলেই ভাবেন আমি ফাকি দিলে কি ক্ষতি? মূল কথা বাঙ্গালির এখনও নিজের নিকট নিজের সম্ভ্রম হয় নাই, এখনও ফাকি দিতে পারিলে নিজে বাহবা লওয়া আছে; সুতরাং নিজের নিকট লজ্জা হয় না।

তাহাই বলি, যাঁহারা নিজে টাকা ব্যয় করিতে অসম্মত তাঁহারা যেন পত্রিকা প্রকাশ না করেন। বাঙ্গালায় তাহা "দিল্লিকা লাড্ডু, যো খায়া ও পস্তায়া, যো না খায়া ও বি পস্তায়া।"

বঙ্গদর্শন।

৮৭ সংখ্যা।

অভিজ্ঞান শকুন্তল।

৭। ইহার গল্প।

অভিজ্ঞানশকুন্তল যে রকমে সমালোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে নাটক কাহাকে বলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমপ্রস্তাবে যে নাটকত্বের কথা বলিয়াছি তাহা নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে রকম সম্পর্ক থাকা উচিত তাহাকে নাটকের আকার-গত নাটকত্ব বলে। এই সম্পর্কের নাম একত্ব বা সাম্য-ভাব। যে মানসিক শক্তি অথবা প্রবৃত্তি সকল অবস্থাতে নিজ প্রকৃতি রক্ষা করে তাহাই নাটকে চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটকের নায়ক যে সকল কার্য্য করেন সে সমস্ত কার্য্যেরই একটি নির্দ্দিষ্টভাব অথবা প্রকৃতি থাকে। এবং সেই কারণ বশতঃ নাটকের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে একটি একতাসম্বন্ধ অথবা সাম্যভাব লক্ষিত হয়। তাহাই নাটকের আকার-গত নাটকত্ব। এই একতা রক্ষা অথবা সাম্যভাব প্রদর্শনই নাটককারের কার্য্য। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রভূত ক্ষমতার প্রয়োজন। মনে কর কোন একটি বিশেষ চরিত্র নাটকে চিত্রিত করিতে হইবে। অর্থাৎ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট-চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত জীবনে অর্থাৎ জগতের বৈচিত্রপূর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে কখন কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে তাহাই দেখাইতে হইবে। সমস্যাটির গুরুত্ব এবং কঠিনতা বুঝিয়া দেখ। সংসার একটি ঘোর দুর্ভেদ্য রহস্য। তথায় কিছুরই

স্থিরতা নাই, সকলই অনিশ্চিত। আজ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী কাল তিনি পথের ভিখারী। এই মুহূর্ত্তে যিনি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্ত পরমুহূর্ত্তে তিনি বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত। প্রতিদণ্ডে প্রতি মুহূর্ত্তে মনুষ্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন অবস্থাতে কোন একটি নির্দ্দিষ্টচরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার সেই চরিত্রের গুণে যেমন যেমন কার্য্য করিলে তাঁহার চরিত্রের সার্থকতা হয় নাটককার তাঁহাকে সেই রকম কার্য্য করান। অর্থাৎ তাঁহার যে রকম চরিত্র তাহাতে যে অবস্থায় তাঁহার যে রকম কার্য্য করা, কথা কওয়া, বা ভাব প্রকাশ করা সম্ভব এবং সঙ্গত, নাটককার তাঁহাকে তাহাই করান। নাটকের পাত্রের প্রত্যেক কার্য্যে এবং প্রত্যেক কথাতে তাঁহার চরিত্র প্রদর্শিত হওয়া অবশ্যক। তিনি নানাবিধ অবস্থায় নানাপ্রকার কার্য্য করিবেন এবং নানাপ্রকার কথা কহিবেন। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত নাটকের পাত্র হন, তবে তাঁহার প্রতি কার্য্য তাঁহারই কার্য্য এবং তাঁহার প্রতি কথা তাঁহারই কথা বলিয়া পাঠকের বুঝিতে পারা চাই। বুঝিতে পারা চাই যে তিনি যে অবস্থায় পতিত সে অবস্থায় তিনি যে কার্য্য করিতেছেন, যে কথা কহিতেছেন সে কার্য্য এবং সে কথা তিনি যে চরিত্রবিশিষ্ট সেই চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তির ভিন্ন অপর কাহারো হইতে পারে না। অর্থাৎ কোন একটি জ্যামিতি-সূত্র হইতে যেমন অপরাপর জ্যামিতি-সূত্র অবশ্য নিঃসৃত হয়, তেমনি নাটকের পাত্রের সমস্ত কার্য্য এবং সমস্ত কথা তাহার চরিত্র হইতে অবশ্য-নিঃসৃত বলিয়া উপলব্ধি হওয়া চাই। এবং প্রকৃত নাটকে তাহাই হইয়া থাকে। হ্যামলেটের কথা হ্যামলেটের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; ইয়াগোর কথা ইয়াগোর ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না; দুষ্মন্তের কথা দুষ্মন্তের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। শার্ঙ্গরবের কথা শার্ঙ্গরবের ভিন্ন আর কাহারো কথা বলিয়া বোধ হয় না। এই কারণেই নাটকের আকারগত বা প্রত্যক্ষ নাটকত্ব। অধিকন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রকৃত নাটককার সামান্য চরিত্র চিত্রিত করেন না। যে চরিত্র চিত্রিত করিলে মনুষ্যজাতির শিক্ষালাভ হইতে পারে তিনি সেই চরিত্রই চিত্রিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চরিত্র শুধু গুরুত্ব গুণবিশিষ্ট হইলেই হয় না। একজন উন্নত-চরিত্র-ব্যক্তিকে বসিয়া থাকিতে অথবা ভোজন করিতে অথবা পুস্তক পাঠ করিতে দেখিলে কোন শিক্ষালাভ হয় না। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে বিপদ্‌জনক অবস্থায় কার্য্য করিতে দেখিলে শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। সেই নিমিত্তই নাটককার কোন গুরুত্ব-গুণবিশিষ্ট চরিত্রকে কোন অসামান্য অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ছবি

তুলিয়া দেন। সে ছবি তদ্রূপ চরিত্র-বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতিকার্য্যে এবং প্রতি কথায় আঁকা থাকে। কত ক্ষমতা থাকিলে তবে সে রকম ছবি তুলিতে পারা যায়? আমাদের মধ্যে একথা সকলে বুঝেন না বলিয়া, প্রতিবৎসর বাঙ্গালা ভাষায় রাশি রাশি পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত হয়। প্রথম প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ অথবা আকারগত নাটকত্বের বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহা কেবল অভিজ্ঞানশকুন্তলের সম্বন্ধে বলিয়াছি—তাহা কেবল নাটকের শ্রেণীবিশেষ সম্বন্ধেই খাটে। এখন ঐ নাটকত্ব বিষয়ে যাহা বলিলাম তাহা নাটকমাত্রেই প্রযোজ্য। এই নাটকত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত প্রথম প্রস্তাবে অভিজ্ঞানশকুন্তল হইতে কতকগুলি প্রমাণ বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া দিয়াছি। কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রতিশব্দে এই নাটকত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠক ইচ্ছা করিলেই তাহা দেখিতে পারেন। দেখিলে নিশ্চয়ই চমৎকৃত হইবেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব ভালরূপে দেখাইতে পারিলেই ভাল নাটক হয় না। অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব ভাল হইলেই তবে ভাল নাটক হয়। অভিজ্ঞান শকুন্তলের অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। যে চরিত্রনিঃসৃত কার্য্যপ্রণালী নাটকে চিত্রিত হয়, সে চরিত্র যত গভীর, দৃঢ়মূল এবং ব্যাপক হয় ততই তাহার নাটকের চরিত্র বলিয়া উৎকর্ষ এবং সার্থকতা হয়। দুষ্মন্তের চরিত্র লইয়া অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক। সে চরিত্রের কত দৃঢ়তা, গভীরতা এবং ব্যাপকতা তাহা বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে সে চরিত্রের অর্থও যা সমস্ত মনুষ্যসমাজের অর্থও তা। অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞান শকুন্তল একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক।

কিন্তু আকারগত এবং চরিত্রগত নাটকত্ব ছাড়া অভিজ্ঞানশকুন্তলে আর একরকম নাটকত্ব আছে। তাহা পঞ্চম প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। দুষ্মন্তের প্রেমের ইতিহাসের অর্থ এই যে জগৎ যে দুইটি উপাদানের সমষ্টি, অর্থাৎ জড়ত্ব এবং সূক্ষ্মতা অথবা প্রকৃতি এবং পুরুষ, সে দুইটি উপাদান পরস্পর স্বাধীন এবং তাহাদের সংযোগ বা মিলন নিয়মাধীন না হইলে বিষম অনিষ্টের কারণ হয়। এই মহাতত্ত্ব দর্শনশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে অভিজ্ঞানশকুন্তলে প্রথমত একটি প্রত্যক্ষ বা আকারগত নাটকত্ব আছে; সে নাটকত্ব ব্যক্তিবিশেষসম্বন্ধ। দ্বিতীয়তঃ একটি অপ্রত্যক্ষ বা চরিত্রগত নাটকত্ব আছে, সে নাটকত্ব মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মনুষ্যসমাজ ব্যাপিয়া আছে। তৃতীয়ত একটি দার্শনিক বা জাগতিক (cosmic) নাটকত্ব আছে;

সে নাটকত্ব মনুষ্যবিশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এত গম্ভীর এবং ব্যাপক নাটকত্ব অতি অল্প নাটকেই আছে। যে কয়খানা নাটকে আছে বোধ হয় তাহাদের সংখ্যা দুই কি তিন খানার বেশী হইবে না। অভিজ্ঞানশকুন্তল সেই দুই তিন খানার মধ্যে একখানা। গেটের 'ফাউষ্ট' আর একখানা। সেক্সপীয়রের 'রোমিও এবং জুলিয়েট' আর একখানা বটে, কিন্তু অভিজ্ঞানশকুন্তল এবং 'ফাউষ্ট' অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট।

এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের যথার্থ প্রকৃতি বুঝা গেল, ইহার প্রকৃত গুণ কি তাহা বুঝা গেল। অতএব এখন বলা যাইতে পারে যে গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য নয়। অনেকে তাহাই মনে করেন বটে, কিন্তু সেটি ভ্রম। যাঁহারা নাটককারকে গল্পলেখক বলিয়া বুঝেন তাঁহাদের মনে করা উচিত যে, অভিজ্ঞান শকুন্তলের গল্প মহাভারত হইতে গৃহীত এবং সেক্সপীয়রের প্রায় সকল নাটকগুলি প্রচলিত গল্প লইয়া রচিত। কিন্তু গল্পরচনা নাটককারের কার্য্য না হইলেও নাটকের গল্প একটি স্বতন্ত্র জিনিস। নাটকের উদ্দেশ্য বিবেচনায় নাটককারগৃহীত গল্প কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে সকল প্রচলিত গল্প লইয়া সেক্সপীয়র নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। অভিজ্ঞান শকুন্তলে কালিদাসও তাহাই করিয়াছেন। মহাভারতে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এই। দুষ্মন্ত একদা মৃগয়ায় গিয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে মহর্ষি তথায় নাই, কেবল শকুন্তলা আছেন। শকুন্তলাকে দেখিয়া লালসায় অধীর হইয়া শকুন্তলার জাতিকুল নির্ণয় করণানন্তর এক রকম বলপূর্ব্বক তৃপ্তিসাধন করিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কণ্ব আসিয়া এই গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনুমোদন করিয়া শকুন্তলার একটি পুত্রসন্তান হইলে পর তাঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট পাঠাইয়া দেন। তখন দুষ্মন্ত ভাণ করিতে লাগিলেন যে, তিনি শকুন্তলাকে কখন দেখেন নাই এবং বিবাহও করেন নাই। শকুন্তলা অপমানিতা সাধ্বীর ন্যায় দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিলেন। সেই সময়ে দৈববাণী হইল যে শকুন্তলা দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে "আমি জানি যে শকুন্তলা আমার পত্নী এবং এই পুত্রটি আমারই পুত্র, কিন্তু সহসা গ্রহণ করিলে পাছে লোকে আমাকে দোষী বিবেচনা করে এবং এই পুত্রটি কলঙ্কী হয় এই ভয়ে শকুন্তলার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিলাম।" এ গল্পে দুষ্মন্তের চরিত্রে কোন মাহাত্ম্য লক্ষিত হয় না, তিনি কেবল একজন কামুক পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান। এ রকম গল্প নাটকের গল্প

হইতে পারে না। সেইজন্য কালিদাস এই গল্পটিকে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। কালিদাসের প্রধান উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক জগতের এবং জড়জগতের স্বাধীনতা চিত্রিত করা এবং কি উপায়ে ঐ দুই জগতের মধ্যে শান্তি এবং সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করা। অতএব মহাভারতের গল্পটি পরিবর্ত্তন না করিয়া লইলে তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না, কেন না সে গল্পে কেবল ঐন্দ্রিয়িক বা জড়জগতের কার্য্য বর্ণিত আছে। কালিদাসের দুইটি শক্তির প্রয়োজন—মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িক শক্তি। অতএব যাহাতে দুইটি শক্তির কার্য্যই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইতে পারে তিনি এমনি করিয়া মহাভারতের গল্পটিকে গড়িয়া লইলেন। তিনি দুষ্মন্তকে দুইটি ভিন্ন আকারে প্রদর্শন করিলেন। এক আকারে দুষ্মন্ত ইন্দ্রিয়ের শাসনে পরাভূত, বিলাসবাসনায় বিহ্বলমতি, সম্পূর্ণরূপে আত্মভাবমুগ্ধ। আর এক আকারে দুষ্মন্ত ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, শ্রমশীল, বিলাসবিদ্বেষী, আত্মভাবশূন্য, পরদুঃখকাতর, পরসুখান্বেষী, আত্মেতরভাবের পূর্ণায়ত প্রতিমূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তি যে প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, তাহা কি চমৎকার! মহাভারতের উপাখ্যানে ঐন্দ্রিয়িক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। কালিদাস সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া দুষ্মন্তের কামমুগ্ধাকৃতি চিত্রিত করিলেন। কিন্তু মহাভারতের উপাখ্যানে মানসিক শক্তির কার্য্য বর্ণিত হয় নাই। সেইজন্য মহাকবি শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান, রাক্ষসগণকর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ, রাজমাতাপ্রেরিত সম্বাদ, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা, এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্য কল্পনা করিলেন। এই সকল ঘটনায় দুষ্মন্তের সৎপ্রবৃত্তি এবং মানসিক শক্তি কি আশ্চর্য্যরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে বুঝাইয়াছি। এখন আর একটি কথা বলা আবশ্যক। শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যে এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় দুষ্মন্তের মোহবিজয়ী মানসিকশক্তির চমৎকার চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক আশ্রমাক্রমণ এবং ইন্দ্রলোকে দৈত্যদিগের দৌরাত্ম্যকল্পনা মহাকবির প্রতিভার চরমকীর্ত্তি। দুষ্মন্ত ঐন্দ্রিয়িক লালসায় জর্জ্জরিতদেহ, পার্থিবমোহে মধুকলসমগ্ন মধুকরাপেক্ষাও মুগ্ধ, পার্থিবভাবে জড়জগতাপেক্ষাও জড়তাময়। কিন্তু নিমেষমধ্যে দুষ্মন্ত বীরভাবে উন্মত্ত, উন্নত হৃদয়াবেগে যেন পৃথিবীর ঊর্দ্ধদেশে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া যেন দিব্যালোকে সন্তরণ করিতেছেন, যেস্থানে মাটীর সহিত মাটী হইয়া বসিয়াছিলেন, সে স্থান তুচ্ছ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার ঠিকানা নাই, সত্যই যেন একটা জগৎ অনন্তদূরে ফেলিয়া রাখিয়া আর একটা সর্ব্বরকমে ভিন্ন জগতে প্রবেশ করিয়া-

ছেন। যে দুই ঘটনায় এই আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্ট হয়, সে দুই ঘটনা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের উপাখ্যানের অংশ নয়। সে উপাখ্যান হইতে সেই দুই ঘটনার উৎপত্তি হয় নাই এবং হইতেও পারে না। কিন্তু সেই জন্যই আমরা সেই দুই ঘটনার এত চমৎকারিত্ব দেখিতেছি। অভিজ্ঞানশকুন্তল আধ্যাত্মিক প্রণালীর নাটক। সে নাটকে বর্ণিত সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে উপাখ্যানমূলক অথবা বাহ্যগ্রন্থি কখনই থাকিতে পারে না। দুইটা ভিন্ন জগতের কথায় সমস্ত ঘটনা একসূত্রে গ্রথিত হওয়া অসম্ভব। এই নিমিত্ত যে দুই ঘটনার কথা বলিতেছি, সেই দুই ঘটনার এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা প্রভৃতি অপরাপর মানসিক শক্তিপ্রকাশক ঘটনার প্রকৃত গ্রন্থি দুষ্মন্তের মনে। সেই মনের সহিত তাহাদের সামঞ্জস্যেই তাহাদের সার্থকতা এবং নাটকের মধ্যে স্থান। কালিদাস, তোমার কাব্যের আধ্যাত্মিক গভীরতার পরিমাণ কে করিবে! দেব! তুমি শুধু ভারতের কালিদাস নও; তুমি জগতের কালিদাস। লোকে না বুঝিয়া সেক্সপীয়রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে, 'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।'

জড়জগতের শক্তি এবং মানসিকজগতের শক্তি এই দুই শক্তি পরস্পর স্বাধীন। যেখানে একটি শক্তি প্রবল, সেখানে অন্য শক্তিটিও প্রবল হইতে পারে। শুধু তাও নয়। জগতে জড়জগতের শক্তি মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল। সেই নিমিত্ত মহাভারতে বর্ণিত দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয়প্রণালী পরিবর্ত্তন না করিয়া মহাকবি অসীমমানসিকশক্তিসম্পন্ন দুষ্মন্তকে রিপুর শাসনে জ্ঞানভ্রষ্ট করিয়া চিত্রিত করিলেন। কিন্তু জড়জগৎ এবং মানসিক জগৎ পরস্পর স্বাধীন হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করা অর্থাৎ জড়জগৎকে মানসিক জগতের অধীন করা মনুষ্যজীবনের প্রধান অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য, এবং অবশ্যকরণীয় কার্য্য। কেন না, মনুষ্যজীবনে জড়জগতের শক্তি মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইলে জীবন যন্ত্রণাময় হয় এবং মনুষ্যসমাজ নিয়মশূন্য হইয়া বিশৃঙ্খলতাপ্রাপ্ত হয়। দুষ্মন্তের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি তাঁহার মানসিকশক্তি অপেক্ষা প্রবল হইল। এবং সেই নিমিত্ত যে শাপ এবং শাপোদ্ভূত ঘটনাবলী মহাভারতের আখ্যায়িকায় নাই মহাকবি তাহা কল্পনা করিলেন। এই কল্পনার গুণে মহাভারতের অসম্পূর্ণ আখ্যায়িকা সংসারক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র হইয়া উঠিল।

মহাভারতের উপাখ্যানে একটি দৈববাণীর কথা আছে। দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া শকুন্তলা যখন ক্রোধভরে পৌরবসভা হইতে চলিয়া যাইতেছেন তখন দৈববাণী হইল যে, তিনি দুষ্মন্তের পরিণীতা ভার্য্যা। সেই দৈববাণী শুনিয়া সকলে বুঝিল যে, শকুন্তলা যথার্থই

দুষ্মন্তের পত্নী এবং দুষ্মন্তও তখন লোকাপবাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিলেন। কালিদাসের উপাখ্যানে সে দৈববাণী নাই। কেন না যেখানে দুর্ব্বাসার শাপ সেখানে সে দৈববাণী থাকিতে পারে না এবং থাকিলে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার বিহিত যন্ত্রণাভোগ হয় না। অতএব কালিদাস সে দৈববাণীর কথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য রকমে তাঁহার নায়ক এবং নায়িকার মিলন সজ্ঘটন করিলেন। অঙ্গুরীয় পুনঃপ্রাপ্তিদ্বারা দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পরিণয় প্রমাণীকৃত হইল এবং দুষ্মন্তও সেই অঙ্গুরীয় দেখিয়া বিষম যন্ত্রণাভোগকরতঃ তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। পরে সেই যন্ত্রণাবিহ্বল অবস্থায় দুষ্মন্ত তাঁহার গভীর আভ্যন্তরভাবের এবং অসাধারণ মোহবিজয়ীশক্তির একটি আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদানকরতঃ তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির উৎকৃষ্টতা সাব্যস্ত করিলে পর পুরস্কারস্বরূপ রমণীরত্ন শকুন্তলাকে পুনর্লাভ করিলেন।

কালিদাস মহাভারতের উপাখ্যান কি প্রণালীতে পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন তাহা বুঝাইলাম। পরিবর্ত্তনানন্তর উপাখ্যানটি কি রকম ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। কালিদাসের উপাখ্যানের প্রধান প্রধান ঘটনা এই:—প্রথম, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অবতারণা; দ্বিতীয়, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রণয়সঞ্চার এবং ঐন্দ্রিয়িক মিলন; তৃতীয়, দুর্ব্বাসার শাপ, এবং দুষ্মন্তকর্ত্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান; চতুর্থ, অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনানন্তর দুষ্মন্তের যন্ত্রণাভোগ; পঞ্চম, দুষ্মন্তের দেবলোকে দেবশত্রুদমন; ষষ্ঠ, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পুনর্ম্মিলন। যখন দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা প্রথম আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত, তখন উভয়কেই আমরা বিকাসোন্মুখ মুকুলের মতন দেখিতে পাই। উভয়েই যেন একটি বিশেষ অবস্থার দিকে যাইতেছেন, যেন একটি বিশেষ অবস্থায় আসিয়া পড়িলেন পড়িলেন, যেন প্রণয়ানুরাগে মুগ্ধ হইলেন হইলেন, যেন উষা ভাঙ্গিয়া দিবালোক প্রকাশ হয় হয়। দেখিতে দেখিতে মুকুল যেমন ফুটিয়া পড়ে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার সেই অস্ফুটরাগও তেমনি পূর্ণগৌরবে প্রদীপ্ত হইল—যেন উষার অস্ফুট রাগ মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরূপে রাগিয়া উঠিয়া দিগ্‌দিগন্ত অগ্নিময় করিয়া তুলিয়াছে—দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা সেই বিষম অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়া তৃণনির্ম্মিত পুত্তলির ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছেন, যেন তাঁহাদের চেতনা নাই, জ্ঞান নাই, সাহস নাই, শক্তি নাই—যেন তাঁহারা জড়জগতের জড়তামাত্র। সহসা এক ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন। কোথায় হইতে যেন এক অসীম তেজঃসম্পন্ন জ্ঞানময় অনন্তপুরুষ আসিয়া সেই অগ্নিরাশি নিবাইয়া দিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন প্রলয়তিমিরে ডুবিয়া গেল, সেই মহাপ্রলয়ে

শকুন্তলা কোথায় তাহার ঠিকানা নাই, দুষ্মন্ত প্রলয়যন্ত্রণার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় প্রলয়াধীন। অকস্মাৎ এক মহাবাক্য শ্রুত হইল। দুষ্মন্ত প্রলয়ভেদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হাসিয়া উঠিল, স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইল, অপূর্ব্ব প্রভায় প্রভাসিত হইল। সেই অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডে, সেই স্বর্গীয় আলোকে, সেই হেমকূটশিখরস্থিত বৈকুণ্ঠসদৃশ পুণ্যাশ্রমে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পতিপত্নীভাবে দণ্ডায়মান—উভয়েই পাণ্ডুবর্ণ, উভয়েই শীর্ণদেহ, উভয়েই বিমর্ষ, যেন অতি নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময়-পরমাত্মাস্থিত দুইখানি পবিত্র চেতনাখণ্ড! কি দেখিয়াছিলাম, আবার কি দেখিতেছি! বসন্তের রাগগর্ভ মুকুল শরতের ম্রিয়মাণ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। রাগময় জড়তা চিন্ময় ভাবে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই অদ্ভুত নাটকের রঙ্গভূমি। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাকবির মহাস্বপ্নের আকার। পৃথিবী হইতে স্বর্গ—এই মহাদর্শকের মহাদৃষ্টির পরিমাণ। গেটে সত্যই বলিয়াছেন—

"Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, enraptured feasted, fed?
Would thou the earth and heaven itself in one sole name combine?
I name thee, O Sakoontala! and all at once is said."

এই জড়তাময় পৃথিবী এবং এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ!—যিনি এই জড়তাময় পৃথিবী চরণে দলিত করিতে পারেন, এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গ তাঁহারই, তিনিই এই দিব্যালোকপূর্ণ স্বর্গের নির্ম্মাণকর্ত্তা। যিনি এই জড়তাময় পৃথিবীর প্রতি আত্মাময় পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন, তিনিই এই পৃথিবীতে স্বর্গস্থাপন করেন। প্রকৃতি এবং পুরুষ পরস্পর স্বাধীন। কিন্তু যিনি প্রকৃতিকে পুরুষের শাসনাধীন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত পুরুষ। দুষ্মন্ত প্রকৃত পুরুষ বলিয়াই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিলেন। মহাকবি তাঁহার বিশাল চিত্রপটে এই আশ্চর্য্য পরিণতি আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। সে চিত্রের বিস্তার—পৃথিবী হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। সে চিত্রে গ্রীক নাটকের আকারগত সৌন্দর্য্য, জর্ম্মাণনাটকের প্রণালীগত আধ্যাত্মিকতা, এবং ইংরেজীনাটকের কার্য্যগত জীবন্তভাব পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। সেই সৌন্দর্য্যপূর্ণ ভাবগম্ভীর গূঢ়রহস্যাত্মক মহাপটের নাম অভিজ্ঞানশকুন্তল।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের গল্প মহাভারতের গল্প অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট তাহা দেখা হইল। দুই গল্পের মূল এক, কিন্তু পরিণতি বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার গুণেই নাটকের গল্পটির উৎকর্ষ। এই বিভি-

ন্নতা সম্পাদনই নাটককারের কার্য্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলে সেই কার্য্য কি আশ্চর্য্য প্রতিভা সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়! মনুষ্যমাত্রই যেন জীবনরূপ মহানাটকে সেই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন।

আনন্দ মঠ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ চলিয়া গেলে পর শান্তি নিমাইয়ের দাওয়ার উপর গিয়া বসিল। নিমাই মেয়ে কোলে করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। শান্তির চোখে আর জল নাই; শান্তি চোখ মুছিয়াছে, মুখ প্রফুল্ল করিয়াছে, একটু একটু হাঁসিতেছে। কিছু গম্ভীর, কিছু চিন্তাযুক্ত, অন্যমনা। নিমাই বুঝিয়া বলিল

"তবু তো দেখা হলো।"

শান্তি কিছু উত্তর করিল না, চুপ করিয়া রহিল। নিমাই দেখিল শান্তি মনের কথা কিছু বলিবে না। শান্তি মনের কথা বলিতে ভাল বাসে না তাহা নিমাই জানিত। সুতরাং নিমাই চেষ্টা করিয়া অন্য কথা পাড়িল—বলিল

"দেখ দেখি বউ কেমন মেয়েটী।"

শান্তি বলিল

"মেয়ে কোথা পেলি—তোর মেয়ে হলো কবে লো।"

নিমা। "মরণ আর কি—তুমি যমের বাড়ী যাও—এযে দাদার মেয়ে।"

নিমাই শান্তিকে জ্বালাইবার জন্য এ কথাটা বলে নাই। "দাদার মেয়ে" অর্থাৎ দাদার কাছে যে মেয়েটী পাইয়াছি। শান্তি তাহা বুঝিল না; মনে করিল, শান্তি বুঝি সূচ ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব শান্তি উত্তর করিল,

"আমি মেয়ের বাপের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই—মার কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছি।"

নিমাই উচিত শাস্তি পাইয়া অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল।

"কার মেয়ে কি জানি ভাই, দাদা কোথা থেকে কুড়িয়ে মুড়িয়ে এনেছে, তা জিজ্ঞাসা করবার তো অবসর হলো না! তা এখন মন্বন্তরের দিন, কত লোক ছেলে পিলে পথে ঘাটে ফেলিয়া দিয়া যাইতেছে; আমাদের কাছেই কত মেয়ে ছেলে বেচিতে আনিয়াছিল—তা পরের মেয়ে ছেলে কে আবার নেয়?" (আবার সেই চক্ষে সেইরূপ জল আসিল—নিমি চক্ষের জল মুছিয়া আবার বলিতে লাগিল)

"মেয়েটী দিব্য সুন্দর, নাদুস নুদুস চাঁদপানা দেখে দাদার কাছে চেয়ে নিয়েছি।"

তার পর শান্তি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিমাইয়ের সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন

করিল। পরে নিমাইয়ের স্বামী বাড়ী ফিরিয়া আসিল দেখিয়া শান্তি উঠিয়া আপনার কুটীরে গেল। কুটীরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া উননের ভিতর হইতে কতকগুলি ছাই বাহির করিয়া তুলিয়া রাখিল। অবশিষ্ট ছাইয়ের উপর, নিজের জন্য যে ভাত রান্না ছিল, তাহা ফেলিয়া দিল। তার পরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আপনা আপনি বলিল, "এতদিন যাহা মনে করেছিলাম, আজ তাহা করিব। যে আশায় এত দিন করি নাই তাহা সফল হইয়াছে। সফল কি নিষ্ফল—নিষ্ফল! এ জীবনই নিষ্ফল! যাহা সঙ্কল্প করিয়াছি তাহা করিব। এক বারেও যে প্রায়শ্চিত্ত, শত বায়েও তাই।"

এই ভাবিয়া শান্তি ভাত গুলি উননে ফেলিয়া দিল। বন হইতে গাছের ফল পাড়িয়া আনিল। অন্নের পরিবর্ত্তে তাহাই ভোজন করিল। তার পর তাহার যে ঢাকাই শাড়ীর উপর নিমাইমণির চোট তাহা বাহির করিয়া তাহার পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিল। বস্ত্রের যেটুকু অবশিষ্ট রহিল গেরিমাটীতে তাহা বেশ করিয়া রঙ করিল। বস্ত্র রঙ করিতে, শুকাইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা হইলে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অতি চমৎকার ব্যাপারে শান্তি ব্যাপৃত হইল। মাথার রুক্ষ আগুল্ফলম্বিত কেশদামের কিয়দংশ কাঁচি দিয়া কাটিয়া পৃথক করিয়া রাখিল। অবশিষ্ট যাহা মাথায় রহিল তাহা বিনাইয়া বিনাইয়া জটা তৈয়ারি করিল। রুক্ষকেশ অপূর্ব্ব বিন্যাসবিশিষ্ট জটাভারে পরিণত হইল। তারপর সেই গৈরিক বসন খানি অর্দ্ধেক ছিঁড়িয়া ধড়া করিয়া চারু অঙ্গে শান্তি পরিধান করিল। অবশিষ্ট অর্দ্ধেকে হৃদয় আচ্ছাদিত করিল। কিন্তু কিছুইতো ঢাকিল না। সে হৃদয়ের অপূর্ব্ব গঠন-শোভা বস্ত্রের উপর হইতে সম্পূর্ণ অনুমেয় রহিল। ঘরে এক খানি ক্ষুদ্র দর্পণ ছিল, বহুকালের পর শান্তি সেখানি বাহির করিল; বাহির করিয়া দর্পণে আপনার বেশ আপনি দেখিল। দেখিয়া বলিল "হায়! কি করিয়া কি করি।" তখন দর্পণ ফেলিয়া দিয়া, যে চুলগুলি কাটা পড়িয়াছিল তাহা লইয়া শ্মশ্রু গুম্ফ রচিত করিল। চাঁদমুখ খানি নবীন দাড়ি গোঁপে শোভা পাইতে লাগিল। তার পর ঘরের ভিতর হইতে এক বৃহৎ হরিণচর্ম্ম বাহির করিয়া কণ্ঠের উপর গ্রন্থি দিয়া কণ্ঠ হইতে জানু পর্য্যন্ত শরীর আবৃত করিল। যদি কোন কবি সে রূপ দেখিত, তাহা হইলে এই নবীন "কৃষ্ণত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানাকে" দেখিয়া এবার মন্মথের বিনাশ দূরে থাকুক, পুনরুজ্জীবনের শঙ্কা করিত। এইরূপে সজ্জিত হইয়া সেই নূতন সন্ন্যাসী গৃহমধ্যে ধীরে ধীরে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। নিরীক্ষণ করিয়া কেহ কোথায় নাই নিশ্চিত বুঝিয়া, অতি গোপনে সংরক্ষিত একটী পেটিকা খুলিল। খুলিয়া তাহা হইতে একটী মোট বাহির করিল। মোট খুলিয়া তাহার ভিতর যাহা ছিল তাহা মাটীর উপরে সাজাইল। কতকগুলি ফুল

টের পুঁথি। ভাবিল "এগুলি কি করি, সঙ্গে লইয়া গিয়া কি হইবে? এত বা বহিব কি প্রকারে? রাখিয়া গিয়াই বা কি হইবে? রাখাই বা আর প্রয়োজন কি— দেখিয়াছি জ্ঞানেতে আর সুখ নাই, ও ভষ্মরাশিমাত্র—ও ভষ্ম ভষ্মই হোক।"— এই বলিয়া শান্তি সেই গ্রন্থগুলি একে একে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। কাব্য, সাহিত্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, আর কি কি তাহা এখন বলিতে পারি না, পুড়িয়া ভষ্মাবশিষ্ট হইল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইলে শান্তি সেই সন্ন্যাসী বেশে দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অন্ধকারে একাকিনী গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীগণ সেই নিশীথ কানন মধ্যে অপূর্ব্ব গীতধ্বনি শ্রবণ করিল।

গীত।*

"দড় বড়ি ঘোড় চড়ি কোথা তুমি যাও রে।"†
সমরে চলিনু আমি হামে না ফিরাও রে।
হরি হরি হরি হরি বলি রণ রঙ্গে,
ঝাঁপ দিব প্রাণ আজি সমর তরঙ্গে,
তুমি কার, কে তোমার, কেন এসো সঙ্গে,
রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে॥"

২

"পায়ে ধরি প্রাণনাথ আমাছেড়ে যেও না।"
"ওই শুন বাজে ঘন রণজয় বাজনা।
নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা,
উড়িল আমার মন, ঘরে আর রবনা,
রমণীতে নাহি সাধ রণজয় গাওরে।"

*রাগিণী বাগীশ্বরী বাহার—তাল আড়া।
†এই গীতের " " চিহ্নিত উক্তির উত্তর " " চিহ্নিত পরবর্ত্তী কয় চরণ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আনন্দ মঠের ভিতর নিভৃত কক্ষে বসিয়া ভগ্নোৎসাহ সন্তান নায়ক তিন জন কথোপকথন করিতেছিলেন। জীবানন্দ সত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! দেবতা আমাদিগের প্রতি এমন অপ্রসন্ন কেন? কি দোষে আমরা মুসলমানের নিকট পরাভূত হইলাম।"

সত্যানন্দ বলিলেন, "দেবতা অপ্রসন্ন নহেন। যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়েই আছে। সে দিন আমরা জয়ী হইয়াছিলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি। শেষ জয়ই জয়। আমার নিশ্চিত ভরসা আছে, যে যিনি এতদিন আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বনমালী আবার পুনর্ব্বার দয়া করিবেন। তাঁহার পাদ স্পর্শ করিয়া যে মহাব্রতে আমরা ব্রতী হইয়াছি, অবশ্য সে ব্রত আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। বিমুখ হইলে আমরা অনন্ত নরক ভোগ করিব। আমাদের ভাবী মঙ্গলের বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন দৈবানুগ্রহ ভিন্ন কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, তেমনি পুরুষকারও চাই। আমরা যে পরাভূত হইলাম, তাহার কারণ এই, যে আমরা নিরস্ত্র। গোলাগুলি বন্দুক কামানের কাছে লাটি সোঁটা বল্লমে কি হইবে।

অতএব আমাদিগের পুরুষকারের লাঘব ছিল বলিয়াই এই পরাভব হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য, যাহাতে আমাদিগেরও ঐরূপ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।”

জীব। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্য। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

জীব। কিপ্রকারে তাহার সংগ্রহ করিব আজ্ঞা করুন।

সত্য। সংগ্রহের জন্য আমি অদ্য রাত্রে তীর্থযাত্রা করিব। যতদিন না ফিরিয়া আসি, তত দিন তোমরা কোন গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপণ করিও না। কিন্তু সন্তানদিগের একতা রক্ষা করিও। তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইও, এবং মার রণ জয়ের জন্য অর্থ ভাণ্ডার পূর্ণ করিও। এই ভার তোমাদিগের দুই জনের উপর রহিল।

ভবানন্দ বলিল, “তীর্থযাত্রা করিয়া এ সকল সংগ্রহ করিবেন কিপ্রকারে? গোলাগুলী বন্দুক কামান কিনিয়া পাঠাইতে বড় গোলমাল হইবে। আর এত পাইবেন বা কোথা, বেচিবে বা কে, আনিবে বা কে?”

সত্য। কিনিয়া আনিয়া আমরা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারিব না। আমি কারিগর পাঠাইয়া দিব, এইখানে প্রস্তুত করিতে হইবে।

জীব। সে কি এই আনন্দ মঠে?

সত্য। তাও কি হয়। ইহার উপর আমি বহুদিন হইতে চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর অদ্য তাহার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা বলিতেছিলে, ভগবান প্রতিকূল, আমি দেখিতেছি তিনি অনুকূল।

ভব। কোথায় কারখানা হইবে।

সত্য। পদচিহ্নে।

জীব। সে কি? সেখানে কি প্রকারে হইবে?

সত্য। নহিলে কি জন্য আমি মহেন্দ্র সিংহকে এ মহাব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য এত আকিঞ্চন করিয়াছি?

ভব। মহেন্দ্র কি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন?

সত্য। ব্রত গ্রহণ করে নাই, করিবে। আজ রাত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিব।

জীব। কই, মহেন্দ্র সিংহকে ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য কি আকিঞ্চন হইয়াছে, তাহা আমরা দেখি না। তাহার স্ত্রী কন্যার কি অবস্থা হইয়াছে? কোথায় তাহাদিগকে রাখিল? আমি আজ একটি কন্যা নদী তীরে পাইয়া, আমার ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। সেই কন্যার নিকট একটী সুন্দরী স্ত্রীলোক মরিয়া পড়িয়াছিল। সে তো মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা নয়? আমার তাই বোধ হইয়াছিল।

সত্য। সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা।

ভবানন্দ চমকিয়া উঠিলেন। তখন তিনি বুঝিলেন যে, যে স্ত্রীলোককে তিনি ঔষধ-বলে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন সেই মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণী। কিন্তু এক্ষণে কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

জীবানন্দ বলিল, "মহেন্দ্রের স্ত্রী মরিল কিসে ?"

সত্য । বিষ পান করিয়া ।

জীব. । কেন সে বিষ খাইল ?

সত্য । ভগবান্ তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন ।

ভব । সে স্বপ্নাদেশ কি, সন্তানের কার্য্যোদ্ধারের জন্যই হইয়াছিল ?

সত্য । মহেন্দ্রের কাছে সেইরূপই শুনিলাম । এক্ষণে সায়াহ্নকাল উপস্থিত, আমি সায়ংকৃত্যাদি সমাপনে চলিলাম । তৎপরে নূতন সন্তানদিগকে দীক্ষিত করিতে প্রবৃত্ত হইব ।

ভব । সন্তানদিগকে ? কেন মহেন্দ্র ব্যতীত আর কেহ আপনার নিজ শিষ্য হইবার স্পর্দ্ধা রাখে না কি ?

সত্য । হাঁ, আর একটী নূতন লোক । পূর্ব্বে আমি তাহাকে কখন দেখি নাই । আজ নূতন আমার কাছে আসিয়াছে । সে অতি তরুণ বয়স্ক যুবা পুরুষ । আমি তাহার আকারেঙ্গিতে ও কথা বার্ত্তায় অতিশয় প্রীত হইয়াছি । খাঁটী সোনা বলিয়া তাহাকে বোধ হইয়াছে । তাহাকে সন্তানের কার্য্যশিক্ষা করাইবার ভার, জীবানন্দের প্রতি রহিল । কেননা জীবানন্দ, লোকের চিত্তাকর্ষণে বড় সুদক্ষ । আমি চলিলাম, তোমাদের প্রতি আমার একটী উপদেশ বাকি আছে । অতিশয় মনঃসংযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর ।

তখন উভয়ে যুক্ত-কর হইয়া নিবেদন করিল, আজ্ঞা করুন ।

সত্যানন্দ বলিলেন "তোমরা দুই জনে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাক, অথবা আমি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে কর, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি না আসিলে করিও না । আমি আসিলে, প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে ।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । ভবানন্দ এবং জীবানন্দ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিল ।

ভবানন্দ বলিল "তোমার উপর নাকি ?"

জীব । বোধ হয় । ভগিনীর বাড়ীতে মহেন্দ্রের কন্যা রাখিতে গিয়াছিলাম ।

ভব । তাতে দোষ কি, সেটা তো নিষিদ্ধ নহে । ব্রাহ্মণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছ কি ?

জীব । বোধ হয় গুরুদেব তাই মনে করেন ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সায়াহ্নকৃত্য সমাপনান্তে মহেন্দ্রকে ডাকিয়া সত্যানন্দ আদেশ করিলেন,

"তোমার কন্যা জীবিত আছে ।"

মহে । কোথায় মহারাজ ?

সত্য । তুমি আমাকে মহারাজ বলিতেছ কেন ?

মহে । সকলেই বলে, তাই । মঠের অধিকারীদিগকে রাজা সম্বোধন করিতে হয় । আমার কন্যা কোথায় মহারাজ !

সত্য । তা শুনিবার আগে, একটা

কথার স্বরূপ উত্তর দাও। তুমি সন্তান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে?

মহে। তাহা নিশ্চিত করিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি।

সত্য। তবে কন্যা কোথায় শুনিতে চাহিও না।

মহে। কেন মহারাজ!

সত্য। যে এ ব্রত গ্রহণ করে, তাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বজন বর্গ কাহারও সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে হয় না। স্ত্রী, পুত্র, কন্যার মুখ দেখিলেও প্রায়শ্চিত্ত আছে। যত দিন না সন্তানের মানসসিদ্ধ হয়, তত দিন, তুমি কন্যার মুখ দেখিতে পাইবে না। অতএব যদি সন্তানধর্ম্ম গ্রহণ তোমার স্থির হইয়া থাকে, তবে কন্যার সন্ধান জানিয়া কি করিবে? দেখিতে ত যাইবে না।

মহে। এ কঠিন নিয়ম কেন প্রভু?

সত্য। সন্তানের কাজ অতি কঠিন কাজ। যে সর্ব্বত্যাগী, সে ভিন্ন অপর কেহ এ কাজের উপযুক্ত নহে। মায়া-রজ্জুতে যাহার চিত্ত বদ্ধ থাকে, লকে বাঁধা ঘুঁড়ির মত সে কখন মাটি ছাড়িয়া স্বর্গে উঠিতে পারে না।

মহে। মহারাজ, কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। যে স্ত্রী পুত্রের মুখদর্শন করে, সে কি কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী নহে?

সত্য। পুত্র কলত্রের মুখ দেখিলেই আমরা দেবতার কাজ ভুলিয়া যাই। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম এই যে, যে দিন প্রয়োজন হইবে, সেই দিন সন্তানকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তোমার কন্যার মুখ মনে পড়িলে তুমি কি তাহাকে রাখিয়া মরিতে পারিবে?

মহে। তাহাকে না দেখিলেই কি কন্যাকে ভুলিব?

সত্য। না ভুলিতে পার, এ ব্রত গ্রহণ করিও না।

মহে। সন্তান মাত্রেই কি এইরূপ পুত্র কলত্রকে বিস্মৃত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছে? তাহা হইলে সন্তানেরা সংখ্যায় অতি অল্প।

সত্য। সন্তান দ্বিবিধ, দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যাহারা অদীক্ষিত, তাহারা সংসারী বা ভিখারী। তাহারা কেবল যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, লুটের ভাগ বা অন্য পুরস্কার পাইয়া চলিয়া যায়। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা সর্ব্বত্যাগী। তাহারাই সম্প্রদায়ের কর্ত্তা। তোমাকে অদীক্ষিত সন্তান হইতে অনুরোধ করি না। যুদ্ধের জন্য লাঠী সড়কীওয়ালা অনেক আছে। দীক্ষিত না হইলে তুমি সম্প্রদায়ের কোন গুরুতর কার্য্যের অধিকারী হইবে না।

মহে। দীক্ষা কি? দীক্ষিত হইতে হইবে কেন? আমি ত ইতি পূর্ব্বেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি।

সত্য। সে মন্ত্র ত্যাগ করিতে হইবে। আমার নিকট পুনর্ব্বার মন্ত্র লইতে হইবে।

মহে। মন্ত্র ত্যাগ করিব কি প্রকারে?

সত্য। আমি সে পদ্ধতি বলিয়াদিতেছি।

মহে। নূতন মন্ত্র লইতে হইবে কেন?

সত্য। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

মহে। ইহা বুঝিতে পারি না। সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।

সত্য। সে চৈতন্য দেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেননা, বিষ্ণুই সংসারের পালন কর্ত্তা। দশবার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা, পৃথিবীর উদ্ধার-কর্ত্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে—উহা অর্দ্ধেক ধর্ম্ম মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান্ কেবল প্রেমময় নহেন— তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্য দেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব— কিন্তু উভয়েই অর্দ্ধেক বৈষ্ণব। কথাটা বুঝিলে?

মহে। না। এ যে কেমন নূতন নূতন কথা শুনিতেছি। কাশিম বাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথা সকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেই রকম্ কথা।

সত্য। যে রকম কথায় আমাদিগের চতুর্দ্দশ পুরুষ বুঝিয়া আসিতেছে, সেই রকম কথায় আমি তোমায় বুঝাইতেছি। ঈশ্বর ত্রিগুণাত্মক, তাহা শুনিয়াছ?

মহে। হাঁ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ।

সত্য। ভাল। এই তিনটি গুণের পৃথক পৃথক উপাসনা। সত্ত্ব গুণ হইতে তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি; তাহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজো গুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি।* আর তমো গুণ হইতে ভগবান শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রক্ চন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্ব্বসাধারণে তাহা করে। এখন বুঝিলে?

মহে। বুঝিলাম। সন্তানেরা তবে উপাসক সম্প্রদায় মাত্র?

সত্য। তাই। আমরা রাজ্য চাহি-না— কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।

---

* এ মত কেবল একা সত্যানন্দের নহে। ইউরোপের Knights Templar প্রভৃতি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা এখানে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। সত্যানন্দের যে মত মহম্মদের অনুচরবর্গেরও সেই মত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যানন্দ কথাবার্ত্তা সমাপনান্তে মহেন্দ্রের সহিত সেই মঠস্থ দেবালয়াভ্যন্তরে, যেখানে সেই অপূর্ব্ব শোভাময় প্রকাণ্ডাকার চতুর্ভুজমূর্ত্তি বিরাজিত, তথায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে তখন অপূর্ব্ব শোভা। রজত, স্বর্ণ ও রত্নে রঞ্জিত বহুবিধ প্রদীপে, মন্দির আলোকিত হইয়াছে। রাশি রাশি পুষ্প স্তূপাকারে শোভা করিয়া, মন্দির আমোদিত করিতেছিল। মন্দিরে আর এক জন উপবেশন করিয়া মৃদু মৃদু "হরে মুরারে" শব্দ করিতেছিল। সত্যানন্দ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র সে গাত্রোত্থান করিয়া প্রণাম করিল। ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, "আমাকে অনুগ্রহ করুন।"

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "তোমরা যথাবিধ স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত?"

উত্তর। আছি।

সত্য। তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর। সন্তানধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। যত দিন না মাতার উদ্ধার হয়, তত দিন গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। মাতা পিতা ত্যাগ করিবে?

উভ। করিব।

সত্য। ভ্রাতা ভগিনী?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। দারা সুত?

উভ। ত্যাগ করিব।

সত্য। আত্মীয় স্বজন? দাস দাসী?

উভ। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্য। ধন—সম্পদ—ভোগ?

উভ। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভ। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয়করিব।

সত্য। ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিবে না? যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভ। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্ম্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভ। করিব?

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না।

উভ। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গা হয়?

উভ। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জানি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল "আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

সত্য। উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ

করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহা ব্রতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভ। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্য। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারি স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি বিনাশহেতু, যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বজয়ী, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বনিয়ন্তা, যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জ্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন, তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভ। তথাস্তু।

সত্য। তোমরা গাও "বন্দে মাতরং।"

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দির মধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা সমাপনান্তে সত্যানন্দ, মহেন্দ্রকে অতি নিভৃত স্থানে লইয়া গেলেন। উভয়ে উপবেশন করিলে সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন,

"দেখ বৎস! তুমি যে এই মহাব্রত গ্রহণ করিলে, ইহাতে ভগবান আমাদের প্রতি অনুকূল বিবেচনা করি। তোমার দ্বারা মার সুমহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে। তুমি যত্নে আমার আদেশ শ্রবণ কর। তোমাকে জীবানন্দ, ভবানন্দের সঙ্গে বনে বনে ফিরিয়া যুদ্ধ করিতে বলি না। তুমি পদচিহ্নে ফিরিয়া যাও। স্বধামে থাকিয়াই তোমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র শুনিয়া বিস্মিত ও বিমর্ষ হইলেন। কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন, "এক্ষণে আমাদিগের আশ্রয় নাই, এমন স্থান নাই যে প্রবল সেনা আসিয়া আমাদিগকে অবরোধ করিলে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে থাকি। আমাদিগের গড় নাই। তোমার অট্টালিকা আছে, তোমার গ্রাম তোমার অধিকার। আমার ইচ্ছা সেই খানে একটী গড় প্রস্তুত করি। পরিখা প্রাচীরের দ্বারা পদচিহ্ন বেষ্টিত করিয়া মাঝে মাঝে তাহাতে ঘাঁটি বসাইয়া দিলে, আর বাঁধের উপর কামান বসাইয়া দিলে, উত্তম গড় প্রস্তুত হইতে পারিবে। তুমি গৃহে গিয়া বাস কর, ক্রমে ক্রমে দুই হাজার সন্তান সেখানে গিয়া উপস্থিত হইবে। তাহাদিগের দ্বারা গড়, ঘাঁটি বাঁধ এই সকল তৈয়ার করিতে থাকিবে। তুমি সেখানে উত্তম লৌহ নির্ম্মিত এক ঘর প্রস্তুত করাইবে। সেখানে সন্তানদিগের অর্থের ভাণ্ডার হইবে। সুবর্ণে পূর্ণ সিন্দুক সকল তোমার কাছে একে একে প্রেরণ করিব। তুমি সেই সকল অর্থের দ্বারা এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। আর আমি নানা স্থান

হইতে কৃতকর্ম্মা শিল্পী সকল আনাই-তেছি। শিল্পী সকল আসিলে তুমি পদ-চিহ্নে কারখানা স্থাপন করিবে। সেখানে কামান, গোলা, বারুদ, বন্দুক প্রস্তুত করাইবে। এই জন্য তোমাকে গৃহে যাইতে বলিতেছি।

মহেন্দ্র স্বীকৃত হইল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র সত্যানন্দের পাদবন্দনা করিয়া বিদায় হইলে, তাহার সঙ্গে যে দ্বিতীয় শিষ্য, সেই দিন দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তিনি আসিয়া সত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন। সত্যানন্দ আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃষ্ণাজিনের উপর বসিতে অনুমতি করিলেন। পরে অন্যান্য মিষ্ট কথার পর বলিলেন, কেমন কৃষ্ণে তোমার গাঢ় ভক্তি আছে কি না?

শিষ্য বলিল, কি প্রকারে বলিব। আমি যাহাকে ভক্তি মনে করি, হয় ত সে ভণ্ডামি, নয় ত আত্ম-প্রতারণা।

সত্যানন্দ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাল বিবেচনা করিয়াছ। যাহাতে ভক্তি দিন দিন প্রগাঢ় হয়, সেই অনুষ্ঠান করিও। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার যত্ন সফল হইবে। কেন না তুমি অতি নবীন-বয়াঃ। বৎস, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব, তাহা এ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই।"

নূতন সন্তান বলিল, আপনার যাহা অভিরুচি, আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাস।

সত্য। তোমার নবীন বয়স দেখিয়া তোমায় নবীনানন্দ বলিতে ইচ্ছা করে—অতএব এই নাম তুমি গ্রহণ কর। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার পূর্ব্বে কি নাম ছিল? যদি বলিতে কোন বাধা থাকে, তথাপি বলিও। আমার কাছে বলিলে কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না। সন্তান-ধর্ম্মের মর্ম্ম এই—যে যাহা অবাচ্য, তাহাও গুরুর নিকট বলিতে হয়। বলিলে কোন ক্ষতি হয় না।

শিষ্য। আমার নাম শান্তিরাম দেবশর্ম্মা।

সত্য। তোমার নাম শান্তিমণি পাপিষ্ঠা। এই বলিয়া সত্যানন্দ, শিষ্যের কাল কুচ্ কুচে দেড় হাত লম্বা দাড়ি বাম হাতে জড়াইয়া ধরিয়া এক টান দিলেন। জাল দাড়ি খসিয়া পড়িল।

সত্যানন্দ বলিলেন,

"ছি মা! আমার সঙ্গে প্রতারণা—আর যদি আমাকেই ঠকাবে, ত এ বয়সে দেড় হাত দাড়ি কেন? আর দাড়ি খাঁট করিলেও কণ্ঠের স্বর—ও চখের চাহনি, এ বুড়োর কাছে কি লুকাতে পার? যদি এমন নির্ব্বোধই হইতাম, তবে কি এত বড় কাজে হাত দিতাম?"

শান্তি পোড়ার মুখী, তখন দুই হাতে দুই চোক ঢাকা দিয়া, কিছু ক্ষণ অধোবদনে বসিল। পরক্ষণেই হাত নামাইয়া বুড়োর মুখের উপর বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, বলিল "প্রভু, দোষই বা কি করিয়াছি। স্ত্রী-বাহুতে কি কখন বল থাকে না?"

সত্য। গোষ্পদে যেমন জল।

শান্তি। সন্তানদিগের বাহুবল কি আপনি কখন পরীক্ষা করিয়া থাকেন?

সত্য। থাকি।

এই বলিয়া সত্যানন্দ, এক ইস্পাতের ধনুক, আর লোহার কতকটা তার আনিয়া দিলেন, বলিলেন যে এই ইস্পাতের ধনুকে এই লোহার তারের গুণ দিতে হয়। গুণের পরিমাণ দুই হাত। গুণ দিতে দিতে ধনুক উঠিয়া পড়ে, যে গুণ দেয়, তাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়। যে গুণ দিতে পারে, সেই প্রকৃত বলবান্।

শান্তি ধনুক ও তার উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিল "সকল সন্তান কি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

সত্য। না, ইহাদ্বারা তাহাদিগের বল বুঝিয়াছি মাত্র।

শান্তি। কেহ কি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই।

সত্য। দুই জন মাত্র।

শান্তি। জিজ্ঞাসা করিব কি, কে কে?

সত্য। নিষেধ কিছু নাই। এক জন আমি।

শান্তি। দ্বিতীয়?

সত্য। জীবানন্দ।

শান্তি ধনুক লইল, তার লইল, অবহেলে তাহাতে গুণ দিয়া, সত্যানন্দের চরণতলে ফেলিয়া দিল।

সত্যানন্দ বিস্মিত, ভীত এবং স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "একি? তুমি দেবী না মানবী?"

শান্তি করযোড়ে বলিল, আমি সামান্যা মানবী। কিন্তু আমি ব্রহ্মচারিণী।

সত্য। তাই বা কিসে? তুমি ভৈরবী নও, বৈষ্ণবী নও, তবে কি বালবিধবা? না বালবিধবারও এত বল হয় না, কেননা তাহারা একাহারী।

শান্তি। আমি সধবা।

সত্য। তোমার স্বামী নিরুদ্দিষ্ট।

শান্তি। উদ্দিষ্ট। তাঁহার উদ্দেশেই আসিয়াছি।

সহসা মেঘভাঙ্গা রৌদ্রের ন্যায় স্মৃতি সত্যানন্দের চিত্তকে প্রভাসিত করিল। তিনি বলিলেন, "মনে পড়িয়াছে, জীবানন্দের স্ত্রীর নাম শান্তি। তুমি কি জীবানন্দের ব্রাহ্মণী?"

এবার জটাভারে নবীনানন্দ মুখ ঢাকিল। যেন কতকগুলা হাতীর শুঁড়, রাজীবরাজির উপর পড়িল। সত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন "কেন এ পাপাচার করিতে আসিলে?"

শান্তি সহসা জটাভার পৃষ্ঠে বিক্ষিপ্ত করিয়া উন্নত মুখে বলিল,

"পাপাচরণ কি প্রভু? পত্নী স্বামীর অনুসরণ করে, সে কি পাপাচরণ? সন্তানধর্ম্মশাস্ত্র, যদি একে পাপাচরণ বলে, তবে সন্তান ধর্ম্ম অধর্ম্ম। আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিনি ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত, আমি তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়াছি।

শান্তির তেজস্বিনী বাণী শুনিয়া, উন্নত গ্রীবা, স্ফীত বক্ষ, কম্পিত অধর এবং

উজ্জ্বল অথচ অশ্রুপ্লুত চক্ষু দেখিয়া সত্যানন্দ প্রীত হইলেন। বলিলেন

"তুমি সাধ্বী। কিন্তু দেখ মা—পত্নী কেবল গৃহ-ধর্ম্মেই সহধর্ম্মিণী—বীর-ধর্ম্মে রমণী কি ?

শান্তি। কোন্ মহাবীর অপত্নীক হইয়া, বীর হইয়াছেন ? রাম সীতা নহিলে কি বীর হইতেন ? অর্জ্জুনের কতগুলি বিবাহ গণনা কর দেখি ? ভীমের যত বল ততগুলি পত্নী। কত বলিব ? আপনাকে বলিতেই বা কেন হইবে ?

সত্য। কথা সত্য, কিন্তু রণ-ক্ষেত্রে কোন্ বীর জায়া লইয়া আইসে ?

শান্তি। অর্জ্জুন যখন যাদবীসেনার সহিত অন্তরীক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল ? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত ?

সত্য। তা হউক, সামান্য মনুষ্য দিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্য্যবিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই, যে রমণীজাতির সঙ্গে, একা সনে উপবেশন করিবে না। জীবানন্দ আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি আমার ডান হাত ভাঙ্গিয়া দিতে আসিয়াছ ?

শান্তি। আমি আপনার দক্ষিণ হস্তে বল বাড়াইতে আসিয়াছি। আমি ব্রহ্মচারিণী, প্রভুর কাছে ব্রহ্মচারিণীই থাকিব। আমি কেবল ধর্ম্মাচরণের জন্য আসিয়াছি; স্বামী সন্দর্শনের জন্য নয়। বিরহ-যন্ত্রণায় আমি কাতরা নই। স্বামীর ধর্ম্মচ্যুতির ভয়ে আমি কাতরা। বৃষ্টির অভাবে মহান্ মহীরুহও শুষ্ক হয়, আমি মহান্ মহীরুহ তলে বৃষ্টি করিব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্য। সে কি ! মহান্ মহীরুহের অনাবৃষ্টির ভয় ! জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ?

শান্তি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা আবার ঘটিতে পারে।

সত্য। কি ঘটিয়াছে ? জীবানন্দের ধর্ম্মচ্যুতি ঘটিয়াছে ? হিমালয় গহ্বরে ডুবিয়াছে ?

শান্তি। কেবল সহধর্ম্মিণী-সাহায্যের অভাবে।

সত্য। কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

শান্তি। কাল মধ্যাহ্নে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে।

এবার সেই পলিত কেশ ব্রহ্মচারী চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতে বসিল। সত্যানন্দকে আর কেহ কখন কাঁদিতে দেখে নাই।

শান্তি বলিল "প্রভু, আপনার চক্ষে জল কেন ?

সত্য। প্রায়শ্চিত্ত কি জান ?

শান্তি। জানি, আত্মহত্যা।

সত্য। তাই কাঁদিতেছি। জীবানন্দের শোকে কাঁদিতেছি।

শান্তি। আমিও তাই আসিয়াছি; যাহাতে জীবানন্দ না মরে, সেই জন্য আসিয়াছি।

সত্য। বৎসে, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ

হউক। তোমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। তুমি সন্তান মধ্যে পরিগণিত হইলে। আমি এতক্ষণ তোমার মর্ম্ম বুঝি নাই, তাই তিরস্কার করিতেছিলাম? আমি কি বুঝিব? বনচারী ব্রহ্মচারী বৈ ত নই। স্ত্রীলোকের তুল্য হইব কি প্রকারে। জীবানন্দ মরিবে, আমিও রাখিতে পারিবনা, তুমিও রাখিতে পারিবে না। আমার এ মহাব্রতের পণ প্রিয়জনের প্রাণ। জীবানন্দ আমার প্রাণাধিক প্রিয়, কিন্তু দেখ দক্ষিণ হস্ত গেলে দেবতার কার্য্য করিতে পারিব না। যত দিন পার, জীবানন্দকে পৃথিবীতে রাখিও। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ব্রহ্মচর্য্যা রাখিও। তুমি আমার প্রিয় শিষ্য হইলে। সন্তান মাত্রই আমার আনন্দ। এই জন্য সন্তানেরা সকলে আনন্দ নাম ধারণ করে। এ আনন্দমঠ। তুমিও আনন্দ নাম ধারণ কর। তোমার নাম নবীনানন্দই রহিল।

শান্তি বলিলেন, "আনন্দমঠে আমি থাকিতে পাইব কি?"

সত্য। আজ আর কোথা যাইবে?

শান্তি। তার পর?

সত্য। মা ভবানীর মত তোমার ও ললাটে আগুণ আছে, সন্তান সম্প্রদায় কেন দাহ করিবে? এই বলিয়া পরে আশীর্ব্বাদ করিয়া সত্যানন্দ শান্তিকে বিদায় করিলেন।

শান্তি মনে মনে বলিল "র বেটা বুড়ো! আমার ললাটে আগুণ! আমি পোড়া কপালি না, তোর মা পোড়া কপালি!" বস্তুতঃ সত্যানন্দের সে অভিপ্রায় নহে—চক্ষের বিদ্যুতের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন, কিন্তু তা কি বলা যায়?

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রি শান্তি মঠে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। অতএব ঘর খুঁজিতে লাগিলেন। অনেক ঘর খালি পড়িয়া আছে। গোবর্দ্ধন নামে এক জন পরিচারক, সেও ক্ষুদ্র দরের সন্তান, প্রদীপ হাতে করিয়া ঘর দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। কোনটাই শান্তির পছন্দ হইল না। হতাশ হইয়া গোবর্দ্ধন ফিরিয়া সত্যানন্দের কাছে শান্তিকে লইয়া চলিল। শান্তি বলিল

"ভাই সন্তান, এই দিকে যে কয়টা ঘর রহিল, এতো দেখা হইল না?"

গোবর্দ্ধন বলিল, "ও সব খুব ভাল ঘর বটে, কিন্তু ও সকলে লোক আছে।"

শান্তি। কারা আছে?

গোব। বড় বড় সেনাপতি আছে।

শান্তি। বড় বড় সেনাপতি কে?

গোব। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, জ্ঞানানন্দ। আনন্দমঠ আনন্দময়।

শান্তি। ঘর গুলো দেখি চল না।

গোবর্দ্ধন শান্তিকে প্রথমে ধীরানন্দের ঘরে লইয়া গেল। ধীরানন্দ মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পড়িতেছিলেন। অভিমন্যু কি প্রকার সপ্তরথীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই মন নিবিষ্ট—তিনি

কথা কহিলেন না। শান্তি সেখান হইতে বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল।

পরে ভবানন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। ভবানন্দ তখন ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া, একখানা মুখ ভাবিতেছিলেন। কাহার মুখ, তাহা জানি না, কিন্তু মুখ খানা বড় সুন্দর, কৃষ্ণ কুঞ্চিত সুগন্ধি অলকারাশি আকর্ণপ্রসারি ভ্রূযুগের উপর পড়িয়া আছে। মধ্যে অনিন্দ্য ত্রিকোণ ললাট দেশে মৃত্যুর করাল কাল ছায়া গাহমান হইয়াছে। যেন সেখানে মৃত্যু ও মৃত্যুঞ্জয় দ্বন্দ্ব করিতছে। নয়ন মুদিত, ভ্রূযুগ স্থির, ওষ্ঠ নীল, গণ্ড পাণ্ডুর, নাসা শীতল, বক্ষ উন্নত, বায়ু বসন বিক্ষিপ্ত করিতেছে। তার পর যেমন করিয়া, শরন্মেঘ-বিলুপ্ত চন্দ্রমা ক্রমে ক্রমে মেঘদল উদ্ভাসিত করিয়া,আপনার সৌন্দর্য্য বিকাশিত করে, যেমন করিয়া প্রভাতসূর্য্য তরঙ্গাকৃত মেঘমালাকে ক্রমে ক্রমে সুবর্ণীকৃত করিয়া আপনি প্রদীপ্ত হয়, দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করে, স্থল জল কীট পতঙ্গ প্রফুল্ল করে, তেমনি সেই শব-দেহে জীবনের মোহ সঞ্চার হইতেছিল। আহা কি শোভা! ভবানন্দ তাই ভাবিতেছিল, সেও কথা কহিল না। কল্যাণীররূপে তাহার হৃদয় কাতর হইয়াছিল; শান্তির রূপের উপর সে দৃষ্টিপাত করিল না।

শান্তি তখন গৃহান্তরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, এটা কার ঘর?

গোবর্দ্ধন বলিল "জীবানন্দ ঠাকুরের।"

শান্তি। সে আবার কে, কৈ কেউতো এখানে নেই।

গোব। কোথায় গিয়াছেন, এখনি আস্‌বেন।

শান্তি। এই ঘরটী সকলের ভাল।

গোব। তা এই ঘরটা ত হবে না।

শান্তি। কেন?

গোব। জীবানন্দ ঠাকুর এখানে থাকেন।

শান্তি। তিনি না হয় আর একটা ঘর খুঁজে নিন্।

গোব। তাকি হয়? যিনি এ ঘরে আছেন, তিনি কর্ত্তা বল্লেই হয়, যা করেন, তাই হয়।

শান্তি। আচ্ছা তুমি যাও, আমি স্থান না পাই, গাছ তলায় থাকিব।

এই বলিয়া গোবর্দ্ধনকে বিদায় দিয়া শান্তি সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া জীবানন্দের অধিকৃত কৃষ্ণাজিন বিস্তারণ পূর্ব্বক, তদুপরি শয়ন করিল।

কিছুক্ষণ পরে জীবানন্দঠাকুর প্রত্যাগত হইলেন। হরিণ চর্ম্মের উপর একটা মানুষ শুইয়া আছে, ক্ষীণ প্রদীপালোকে অতটা ঠাওর হইল না। জীবানন্দ তাহারই উপর উপবেশন করিতে গেলেন। উপবেশন করিতে গিয়া শান্তির হাঁটুর উপর বসিলেন। হাঁটু অকস্মাৎ উচু হইয়া জীবানন্দকে ফেলিয়া দিল।

জীবানন্দের একটু লাগিল। জীবানন্দ উঠিয়া একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,"কে হে তুমি বেল্লিক?"

শান্তি। আমি বেল্লিক না, তুমি বেল্লিক। মানুষের হাঁটুর উপর কি বস্‌বার জায়গা?

জীব। তা কে জানে যে তুমি আমার ঘরে চুরি করিয়া এসে শুইয়া আছ?

শান্তি। তোমার ঘর কিসের?

জীব। কার ঘর?

শান্তি। আমার ঘর।

জীব। মন্দ নয়, কে হে তুমি?

শান্তি। তোমার বনাই।

জীব। তুমি আমার হও না হও, আমি তোমার বোধ হইতেছে। তোমার গলার সঙ্গে আমার ব্রাহ্মণীর গলার একটু সাদৃশ্য আছে।

শান্তি। বহু দিন তোমার ব্রাহ্মণীর সঙ্গে আমার একাত্মতা ভাব ছিল, সেই জন্য বোধ হয় গলার আওয়াজ এক রকম হয়ে গেছে।

জীব। তোর যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌তে পাই? মঠের ভিতর না হতো তো এক ঘুষোয় দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিতুম।

শান্তি। দাঁত ভেঙ্গেছে অনেক সম্বন্ধী। কাল রাজনগরে কটা দাঁত ভেঙ্গেছিলে, হিসাব দাও দেখি। বড়াইয়ে কাজ নেই, আমি এখানে ঘুমুই। তোমরা সন্তানের দল, লেজ গুটিয়ে, বামুন্‌ঠাকুরুণদের আঁচলের ভিতর সুকোওগে।

এখন জীবানন্দ ঠাকুর কিছু ফাঁপরে পড়িলেন। মঠের ভিতর বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে মারামারি করা সত্যানন্দের নিষেধ। কিন্তু এরও বড় মুখের দৌড়, তুষা না দিলেও নয়। রাগে সর্ব্বাঙ্গ শরীর জ্বলিতে লাগিল। অথচ গলার আওয়াজটা মধ্যে মধ্যে বড় মিঠে লাগিতেছে, যেন কি মনে হয়, যেন কে স্বর্গের দ্বার খুলিয়া ডাকিতেছে, আর বলিতেছে এলেই ঠ্যাঙে লাটী মার্‌বো। জীবানন্দের উঠিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না, বসিতেও ইচ্ছা করিতেছিল না। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন,

"মহাশয় এ ঘর আমার, চিরকাল ভোগ দখল করিতেছি, আপনি বাহিরে যান।"

শান্তি। এ ঘর আমার, অর্দ্ধ দণ্ড ভোগ দখল করিতেছি। আপনি বাহিরে যান।

জীব। মঠের ভিতর মারামারি করিতে নাই বলিয়াই লাথি মারিয়া তোমায় নরককুণ্ডে ফেলিয়া দিই নাই, কিন্তু এখনি মহারাজের অনুমতি আনিয়া তোমায় তাড়াইয়া দিতে পারি।

শান্তি। আমি মহারাজের অনুমতি আনিয়াই তোমায় তাড়াইয়া দিতেছি। তুমি দূর হও।

জীব। তাহা হইলে এ ঘর তোমার। মহারাজকে কেবল জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি; আগে বল তোমার নাম কি?

শান্তি। আমার নাম নবীনানন্দ গোস্বামী, তোমার নাম কি?

জীব। আমার নাম জীবানন্দ গোস্বামী।

শান্তি। তুমিই জীবানন্দ গোস্বামী! তাই এমন?

জীব। তাই কেমন?

শান্তি। লোকে বলে, আমি কি কর্‌বো।

জীব। লোকে কি বলে?

শান্তি। তা আমার বলতে ভয়ই কি? লোকে বলে বড় জীবানন্দ ঠাকুর গণ্ডমূর্খ।

জীব। গণ্ডমূর্খ, আর কি বলে?

শান্তি। মোটা বুদ্ধি।

জীব। আর কি বলে?

শান্তি। যুদ্ধে কাপুরুষ।

জীবানন্দের সর্ব্ব শরীর রাগে গর গর করিতে লাগিল, বলিলেন, "আর কিছু আছে?"

শান্তি। আছে অনেক কথা—নিমাই ব'লে আপনার একটি ভগিনী আছে।

জীব। তুমি বড় বেল্লিক হে—

শান্তি। তুমি ভল্লূক হে।

জীব। তুমি উল্লূক, অর্ব্বাচীন, নাস্তিক, বিধর্ম্মী, ভণ্ড, পামর!

শান্তি। তুমি—যলায়বায়াবোচীচঃ—তুমি স্তশ্চুভিঃ শ্চুশাৎ—তুমি ষ্টুভিঃ ষ্টু-ব্যদাস্তটোঃ।

জীব। বের শালা এখান থেকে—তোর দাড়ি ছিঁড়িব।

শান্তি তখন গণিল প্রমাদ! দাড়ি ধরিলেই মুস্কিল। পরচুলো খসিয়া পড়িবে। শান্তি সহসা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়নে তৎপর হইল।

জীবানন্দ পিছু পিছু ছুটিল। মনে মনে ইচ্ছা, শালা মঠের বাহিরে গেলে দুই ঘা দিব। শান্তি যাই হউক স্ত্রীলোক—দৌড়ধাপে অনভ্যস্ত। জীবানন্দ এ সকল কাজে সুশিক্ষিত। শীঘ্র গিয়া শান্তিকে ধরিল। এবং তাহাকে ভূতলে ফেলিয়া প্রহার করিবে বলিয়া তাহাকে কায়দা করিয়া জাপটাইয়া ধরিতে গেল। কিন্তু স্পর্শ মাত্রেই জীবানন্দ চমকিয়া শান্তিকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু শান্তি বাহু দ্বারা জীবানন্দের গলা জড়াইয়া ধরিল।

জীবানন্দ বলিল, "এ কি! তুমি যে স্ত্রীলোক! ছাড়! ছাড়! ছাড়!" কিন্তু শান্তি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "ওগো, তোমরা দেখ গো! একজন গোঁসাই জোর করিয়া স্ত্রীলোকের স্বতীত্ব নষ্ট করিতেছে।"

জীবানন্দ তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! অমন কথা মুখে এনোনা। ছাড়! ছাড়! আমার ঘাট হয়েছে, ছাড়!"

শান্তি ছাড়ে না; আরও চেঁচায়; শান্তির কাছে জোর করিয়া ছাড়ানও সহজ নয়। জীবানন্দ যোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিল "তোমার পায়ে পড়ি, ছাড়!" শেষ স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদে অরণ্য পরিপূরিত হইয়া গেল।

এ দিগে মঠের গোঁসাইরা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া, অনেকে ধুহুচির ভিতর প্রদীপ জ্বালিয়া লাঠি সোঁটা লইয়া বাহির হইলেন। দেখিয়া জীবানন্দ থর থর কাঁপিতে লাগিল। শান্তি বলিল, "অত কাঁপিতেছ কেন?"

তুমি ত বড় ভীত পুরুষ! আবার লোকে তোমাকে বুলে মহ'বীর?

গোঁসাইরা আলো লইয়া নিকটবর্ত্তী হইল দেখিয়া জীবানন্দ সকাতরে বলিলেন, "আমি অতিশয় কাপুরুষ, তুমি আমায় ছাড়, আমি পলাই।"

শান্তি। "জোর করিয়া ছাড়াও না।"

জীবানন্দ লজ্জায় স্বীকার করিতে পারিলেন না যে তিনি স্ত্রীলোকের জোরে পারিতেছেন না। বলিলেন,

"তুমি বড় পাপিষ্ঠা।"

শান্তি তখন মুচকি হাসিয়া, বিলোল কটাক্ষ ক্ষেপণ করিয়া বলিল,

"প্রাণাধিক! আমি তোমার প্রতি অতিশয় আসক্ত। তোমার দাসী হইব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি, আমায় গ্রহণ করিবে, স্বীকার কর, ছাড়িয়া দিতেছি।"

জীব। "দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর হ পাপিষ্ঠা! দূর পাপিষ্ঠা! অমন কথা আমাকে কাণে শুনিতে নাই।

শান্তি। আমি পাপিষ্ঠা, তাতে সন্দেহ নাই; নহিলে স্ত্রীজাতি হইয়া পুরুষের কাছে প্রেম ভিক্ষা চাইতে যাইব কেন—আমার কথাটি রাখিবে? ছাড়িয়া দিতেছি।

জীব। ছি! ছি! ছি! আমি ব্রহ্মচারী—আমাকে অমন কথা বলিতে নাই—তুমি আমার—

শান্তি সভয়ে বলিল "চুপ কর! চুপ কর! চুপ কর! আমি শান্তি।"

এই বলিয়া শান্তি জীবানন্দকে ছাড়িয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইল। পরে যোড়হাত করিয়া বলিল, "প্রভু! অপরাধ নিও না। কিন্তু ছি! পুরুষমানুষের ভালবাসার ভাণ্ করাকে ধিক্! আমাকে চিনিতেই পারিলে না।"

তখন জীবানন্দের মনে সকল কথা প্রস্ফুট হইল। শান্তি নহিলে এ কার্য্য আর কার? শান্তি নহিলে এ রঙ্গ আর কে জানে? শান্তি নহিলে কার বাহুতে এত বল? তখন আনন্দিত হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া জীবানন্দ কি বলিতে যাইতেছিলেন—কিন্তু অবকাশ পাইলেন না, গোঁসাইয়েরা আসিয়া পড়িয়াছিল। ধীরানন্দ আগে আগে। ধীরানন্দ এই সময়ে জীবানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলমাল কিসের?"

জীবানন্দ ফাঁপরে পড়িলেন, কি উত্তর দিবেন? শান্তি সেই সময়ে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিল,

"কেমন বলিয়া দিই—তুমি আমায় ধরিয়াছিলে?"

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া শান্তি, ধীরানন্দের কথার উত্তর দিল—বলিল,

"গোলমাল—একটা স্ত্রীলোকে চেঁচাইতেছিল, "আমার সতীত্ব নষ্ট করিল! আমার সতীত্ব নষ্ট করিল' বলিয়া চেঁচাইতেছিল। কিন্তু কই? জীবানন্দঠাকুর এত খুঁজিলেন, আমি এত খুঁজিলাম, দেখিতে পাইলাম না। এই বনটার ভিতর আপনারা একবার দেখুন দেখি—ওদিকে শব্দ শুনিয়াছিলাম।"

গোঁসাইদিগকে শান্তি অরণ্যের নিবিড় অংশ দেখাইয়া দিল। জীবানন্দ শান্তিকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৈষ্ণবদিগকে এত দুঃখ দিয়া তোমার কি ফল? ও বনে গেলে কি ওরা ফিরিবে? সাপেই খাক্, কি বাঘেই খাক্।"

শান্তি। যখন বৈষ্ণব স্ত্রীলোকের নাম শুনেছে, তখন কি একটু কষ্ট না পেলে ফিরিবে না। তা না হয় ফিরাইতেছি।

এই বলিয়া শান্তি গোঁসাইজিদের ডাকিয়া বলিলেন, "আপনারা একটু সতর্ক থাকিবেন। কি জানি ভৌতিক মায়াও হইতে পারে।"

শুনিয়া একজন গোঁসাই বলিল, "তাই সম্ভব। নহিলে স্ত্রীলোক কোথা হইতে আসিবে।"

গোঁসাইয়েরা সকলেই এই মতে মত দিল। ভৌতিক মায়া স্থির করিয়া সকলেই মঠে ফিরিল। জীবানন্দ বলিল "এসো, আমরা এইখানে বসি—এ ব্যাপার টা আমাকে বুঝাইয়া বল—তুমি এখানে কেন—কি প্রকারে আসিলে—এ বেশই বা কেন? এত রঙ্গই বা কোথায় শিখিলে?

শান্তি বলিল "আমি কেন আসিলাম? —তোমার জন্য আসিয়াছি। কি প্রকারে আসিলাম?—হাঁটিয়া। এ বেশ কেন? আমার শক। আর এত রঙ্গ শিখিলাম কোথায়? একটি পুরুষমানুষের কাছে। সব তোমায় ভাঙ্গিয়া বলিব। কিন্তু এখানে বনে বসিব কেন? চল তোমার কুঞ্জে যাই।

জীব। আমার কুঞ্জ কোথায়?

শান্তি। মঠে।

জীব। সেখানে স্ত্রীলোক যাইতে আসিতে নিষেধ।

শান্তি। আমি কি স্ত্রীলোক?

জীব। আমি মহারাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিব না।

শান্তি। আমার প্রতি মহারাজের অনুমতি আছে। কুঞ্জেই চল, সব বলিতেছি। বিশেষ ঘরের ভিতর না গেলে আমার দাড়ি খুলিব না। দাড়ি না খুলিলে তুমি এ পোড়ার মুখ চিনিতে পারিবে না। ছি! পুরুষ এমন!"

ভূমিষ্ঠ শিশুর প্রতি।

এস রে মানব শিশু, এস ধরাতলে;
নয় মাস অন্ধকারে করেছ নিবাস,
আলোকের স্পর্শে কেন করহ ক্রন্দন?
দেখেছ কি সম্মুখেতে মায়ারূপ জাল?
পাইয়াছ পিতৃমাতৃ উভয়-মূরতি।
ভাবিছ, সে হেতু পাবে তাদের দুর্গতি?
মুদ্রিত নয়নে কিবা করিছ কল্পনা!
জেনেছ কি এ জগতে দুখের সাগরে,
তরঙ্গে আকুল হয়ে সাঁতারিতে হবে?
—মাতার মায়ায় ভুলি সংসারের ভ্রম,

ডুবিবে মাতার সনে আশার সাগরে?
বালির ভিত্তিতে মাতা নির্ম্মাণিবে গৃহ,
ঘটনার স্রোতে তাহা পড়িবে ভূতলে।
তুমিও ভাবিবে সুত, "জগতের মাঝে,
শ্রেষ্ঠ জীবরূপে আমি লভেছি জনম,
জগতের শুভ-তরে ধরেছি জীবন,
উঠাইব জগতেরে নিজ বীর্য্যবলে—
দুখ হরি, সুখময় করিব সংসার?"
হায়, মানবের সুত, কেন এত ভ্রম,
নৈরাশে লভিতে কর বক্ষেতে ধারণ।
মানুষ জন্মেছে হয়ে ঘটনার দাস,
ঘটনায় শুভাশুভ নির্ভরিবে তার।
কার্য্যক্ষেত্রে উত্তরিয়া বুঝিবে সকলি,
দেখিবে তোমার বীর্য্য হবে তেজোহীন।
(দেখিবে)শিষ্টকে দলিছে দুষ্ট নির্যাতন করি
নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখ, দম্ভ, অহঙ্কার,
চরিতার্থ করিবারে। স্বকার্য্য সাধিতে,
সাজিয়া নিঃস্বার্থপর স্বার্থপরগণ,
বন্ধুতার ছলে, শিশো, প্রতারিছে সবে।
(ভেবেছ)—
"অজ্ঞান-তিমির হরি,শুভ্রজ্ঞান-জ্যোতিঃ
বিতরিবে যথা তথা ; নাশি নীচ সুখ,
সৃজিবে তাহার স্থলে সুখ নিরমল ;
রাখিবে না ভেদ কভু নির্ধন ধনীতে,
অর্থের সমান ভাগ, শিখাবে জগতে ;
—শিখাবে যথার্থ যাহা অর্থ ব্যবহার।
দৃষ্টান্ত দেখাবে তুমি ভ্রাতৃ মানুষেরে,
দেখিতে কিরূপে হয় সর্ব্বে সমভাবে ;
অনাথের অশ্রুজল করিবে মোচন ;
নিপীড়িত-দুখভার করিবে বহন ;
মনুষ্য-আনন কভু হইতে মলিন
দিবে না ; চুম্বিয়া তায় বসাবে হৃদয়ে
প্রফুল্ল করিবে তারে আশার কুহকে।"
এত যদি আশা তব মানবের সুত,
হতভাগ্য, হায়, কেন লভিলে জনম,
জান না কি পৃথিবীর অখণ্ড নিয়ম?
বালুকা-কণার মত তুমিও তাহাতে,
ক্রীড়িত হইছ, তব আশা-সুখ লয়ে।
নিষ্ঠুর প্রকৃতি কভু দেখিবে না চেয়ে,
কি আশায় হৃদি তব সর্ব্বদা ফুলিছে।
দুখের পীড়ন শুধু দেখে চারিদিকে,
স্তম্ভিত হইবে তুমি, কভু না পারিবে,
জীবন অর্পিলে তাহা করিতে মোচন,
উদ্যমে কেবল, সুত, নিস্তেজিবে বল।
ভেবে দেখ কবে তুমি পেরেছ ফিরাতে,
কিম্বা অবরোধিবারে ঘটনার স্রোত।
মানব বিজ্ঞান চর্চ্চি দেখে সব বটে,
কিন্তু বল কার তাহে ঘটিয়াছে সুত,
হৃদয়ের শান্তি, কিম্বা পুরিয়াছে আশা?
মানুষের সৃষ্টি হতে, ঘূর্ণমান সদা,
সুখ-দুখরূপ চক্র পরিবর্ত্তশীল।
সংসারের অংশ হয়ে বল দেখি তবে,
কেমনে এড়াবে তুমি সে দুখের ভোগ?
মানিলাম, শ্রেষ্ঠ তুমি সংসারের মাঝে,
বল দেখি সে শ্রেষ্ঠতা দিয়াছে কি ফল?
কেবল জেনেছ তাহে দুখময় ধরা ;
—করিয়াছে তাহে, উচ্চ হৃদয় তোমার
অনুভব, হায় শিশো, তীব্রতার সহ,
সে দুখের ভার। যদি বল অকাতরে,
সহিবে সে সব ক্লেশ তব জ্ঞান-বলে,
আসিতে দিবে না চক্ষে কণা মাত্র জল,
নিঃশব্দে সহিবে ব্যথা—সহয়ে যেমন,

রোগের যন্ত্রণা রোগী, যবে চিকিৎসক
আরোগ্য ভরসা ছাড়ে। বল কি করিলে,
সাধিলে কি কায তবে জগতে আসিয়া ?
ধর্ম্ম-শাস্ত্র বটে উচ্চে বলিবে তোমারে,
রহ রহ রহ সুত, পাইবে সান্ত্বনা ?"—
হবে সুখী পরকালে এ দেহ ত্যজিলে ?"
কিন্তু হায়, যদি তাহে করহ বিশ্বাস,
দূরিবে তোমার দুখ ক্ষণেকের তরে।
যথা অহিফেণ দূরে রোগের যাতনা
ক্ষণ-নিদ্রা আনি। বল, প্রমাণ-বিহীন
কল্পিত যে আশা, সে কি তিষ্ঠিবারে পারে—
যবে সাংসারিক দুখে শোণিত শুকায়,
করে হৃদয়েরে শূন্য, মনেরে নিস্তেজ ?
—তখন ফুটিবে তব সুজ্ঞানের আঁখি,
শিহরি দেখিবে যবে প্রকৃতির রীতি,
তখন বলিবে তুমি—"প্রকাণ্ড জগতে
কণামাত্র বটে আমি।"—তবে কেন আশা ?
জীবনেরে ছেড়ে দাও সংসারের স্রোতে।

সাবেক "মনুষ্যত্ব" ও হালের "সাইন করা।"

ইংরাজের সহবাসে বাঙ্গালী যে কত কি হারাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। বাঙ্গালীর কথকতা উঠিয়া গিয়াছে। কবি, পাঁচালী, যাত্রা; একেবারে নাই বলিলেই হয়। যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা স্বভাবের নির্ভীকতা, সত্যনিষ্ঠতা, ধর্ম্মপরতা প্রভৃতি বলে সমাজে এক প্রকার অগ্রণী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। যে সকল সামাজিক কার্য্যে ও বাৎসরিক পর্ব্বাহে সমস্ত দেশীয় লোক আনন্দে উন্মত্ত হইত, তাহা কমিয়া আসিতেছে। যে সন্তোষ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করিত, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মীয়ের, কুটুম্বের ও প্রতিবেশীর বিপদে সম্পদে লোকে যেমন বুক দিয়া পড়িত, এক্ষণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না।

এখন সবাই আপন লইয়া ব্যস্ত, কেহ কাহারও আপদ বিপদে মনোযোগ দেয় না। কিছুতেই যেন লোকের তৃপ্তি হয় না। দেশীয় সমাজ-বন্ধন ক্রমে শিথিল হইয়া আসিয়াছে। গ্রাম বা নগরবাসীদিগের মধ্যে যে একটু বাঁধাবাঁধি সম্পর্ক ছিল, সকলেই পরস্পরের কার্য্যে যেমন পরস্পরের মুখাপেক্ষা করিত, এক্ষণে আর সেটী দেখা যায় না। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, ইংরাজ রাজপুরুষ, হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হইয়াছেন। সকলেই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করেন। পুরাণ পারিবারিক, গ্রামিক, নাগরিক, সামাজিক বন্ধন খুলিয়া মানুষ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিতেছে। তাহাদের জাতীয় চরিত্র, এমন কি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও যেন পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য মনুষ্যত্ব ছিল। মনুষ্যত্ব কথাটী বলিলে যত ভাব ব্যক্ত হয়, এত কি আর

একটী কথায় ব্যক্ত হইতে পারে? মনুষ্যত্ব বলিলে লোক-লৌকিকতা, আত্মীয়-কুটুম্বিতা ব্রাহ্মণসজ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা, গরিব দুঃখীর প্রতি দয়া নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান, বিপন্নের বিপদ উদ্ধার, অনাথের সহায়তা, ব্যথিতের ব্যথানিবারণ, দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন, নিরন্নকে অন্নদান, বিবস্ত্রকে বস্ত্রদান, অপরাধির অপরাধ-মার্জ্জনা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, সর্ব্বদা ক্রিয়া-কলাপ করা ক্রিয়াকলাপে লোকের অভ্যর্থনা, লোকের বাড়ী যাওয়া আসা, প্রভৃতি যত কিছু মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, সরল, উদার কার্য্য আছে, এক মনুষ্যত্ব শব্দে সকলই বুঝায়। মনুষ্যত্ব বলিলে, মনুষ্য সমূহের সর্ব্বাঙ্গীন হিতসাধন বুঝায়। মনুষ্য যত কেন ছোটই হউক না, যে যথার্থ মনুষ্য হইবে, তাহার যথার্থ মনুষ্যত্ব থাকিবে, সে তাদৃশ নীচ মনুষ্যেরও ব্যথা, যত কেন অল্প হউক না, সে ব্যথাও ব্যথী হইবে।

কিন্তু আজি কালি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য আর মনুষ্যত্ব নাই। আজি কালি যে লোক পরের দুঃখে দুঃখী হয়, পরের ব্যথায় যাহার হৃদয় গলিয়া যায়, তাহাকে লোকে আহাম্মক বলে। যে প্রতিবেশী-দিগের কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকে, লোকের বিপদ দেখিলে বুক্ দিয়া পড়ে, লোক তাহাকে "হম্‌বগ্" (Humbug ও Weak-minded) বলে। আজ কালি মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আজি কালি লোকে কেবল "সাইন" করিতে চেষ্টা করে। "সাইন" শব্দটী বাঙ্গালায় তর্জ্জমা হইতে পারে না। বাঙ্গালীর অভিধানে এরূপ উৎকট স্বার্থ-পরতা-সার-সংগ্রহ-দ্যোতক কথা থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে যত প্রকার স্বার্থ-পরতা আছে, বোধ হয়, তাহাদিগের শেষ সীমা "সাইন" করা। আত্মীয় স্বজন দেখিব না, জ্ঞাতি বন্ধুর মুখপানে চাহিব না, প্রতি-বেশী দীন দুঃখী দরিদ্র প্রভৃতির প্রতি দৃক্‌পাত করিব না। কেবল দেখিব আমি কিসে বড় হইতে পারি, কিসে আমার গাড়ী, জুড়ী, বড় বাড়ী প্রভৃতি হয়। কিসে লোকের কাছে অধিক পরিমাণে বাহবা লওয়া যায় (লোকের কাছে বলিতে গেলে কালা বাঙ্গালীর কাছে নয়। শুদ্ধ লাল মুখের কাছে বুঝায়) কিসে সাহেবদিগের কাছে সম্মান বাড়ে, কিসে নামের পাশে ৭।৮ টা ইংরাজি অক্ষর যুড়িতে পারা যায়, আমাদের জীবনে শুদ্ধ এই মাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাহারা আপন জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিয়া যাইতে পারে, লোকে তাহাকেই বড়লোক বলে। আমি দেখিতেছি এখন-কার বড়লোক ও প্রাচীন বাঙ্গালার বড়-লোকে কত তফাৎ।

এখনকার বড়লোক কাহার সহিত মিশেন না, প্রায়ই একাকী থাকেন। সঙ্গে থাকিবার মধ্যে স্ত্রী ও পুত্র; যাহারা খুব্ "সাইন" করিয়া উঠিয়াছেন তাহারা স্ত্রী পুত্রেরও সঙ্গ ভাল বাসেন না। পার্শ্বের বাড়ীতে কে থাকে, কখনই খবর

লয়েন না। ভাই, ভগিনীপতি, খুড়া জ্যেঠা কে কোথায় থাকেন, তাহা জানেনও না। তাঁহার কেবল চিন্তা, যাহারা তাঁহা অপেক্ষা বড়, কিসে সেই সকল লোকের সঙ্গে মিশিতে পারেন। নর লোকের প্রায়ই মুখ দেখেন না। যাহারা তাঁহা অপেক্ষা কোন অংশে ছোট, তাহারা একেবারে অগ্রাহ্যের মধ্যে গণ্য। এই সকল বড়লোকের দিবানিশি অন্তরের আশা এই যে, সাহেবলোকে কিসে বড় বলে। এই রূপ বড়লোক যদি আশানুরূপ বাহবা না পাইলেন, তাহা হইলে তিনি ইংরাজরাজের এবং তৎকর্ত্তৃক অনুগৃহীত স্বদেশীয়বর্গের প্রতি উৎকট বিদ্বেষভাবকে হৃদয়ে লালন পালন করিতে লাগিলেন। লাভ এই হইল যে, তাঁহার নিজের মনে সুখ রহিল না। এবং যে কেহ কার্য্যোপলক্ষে (অন্য- উপলক্ষে তাঁহার নিকট কাহার যাইবার হুকুম নাই) তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহে, তাহারই মনে ঐ প্রকার বিদ্বেষ ভাবরূপ সংক্রামক রোগ চালনা করিয়া দেয়। নিজে তো অসুখী আছেন অন্যকেও অসুখী করিয়া দেন।

আর সেকালের বড়লোকই বা কি রূপ ছিল? যেখানে এক জন বড় লোক থাকিতেন, সে পরগণা তাঁহার চরিত্রগুণে আলোকিত থাকিত। বাক্যে হউক, কার্য্যে হউক, অর্থের দ্বারা হউক, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব প্রতিবেশীদিগের উপকার সাধনেই তাঁহারা সকল সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন। যাহারা উপকার প্রত্যাশী নহেন, তাঁহাদেরও বিপদে সম্পদে যাওয়া আসা কায কর্ম্মে কথাবার্ত্তায় সাহায্য করিতেন। ইহাতে সম্পদের সময় আনন্দ দ্বিগুণতর হইত। এবং বিপদের সময় কষ্ট অর্দ্ধেক দূর হইত। সেরূপ বড়লোক প্রাতঃকালে উঠিয়াই বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গ্রামস্থ ভদ্রলোকগণ একে একে তথায় উপস্থিত হইলেন। পরস্পর মিষ্টালাপে সময় কাটিতে লাগিল। ইহারই মধ্যে পাঁচুর জামাইয়ের চাকরী, তর্করত্ন মহাশয়ের পুত্রের বিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনীয় কথা হইয়া গেল। হরে চাঁড়ালের ব্যাম হইয়াছে তাহার শিশু পুত্রটী কাঁদিয়া আসিয়া বাবুকে সমাচার দিল। তখন সকলেই আহা! হরে চাঁড়াল, দিব্য লোক ছিল বলিয়া নানা প্রকারে তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বাবু বলিলেন একবার দেখে আসিলে হয় না?

তখন সমস্ত গ্রামস্থ লোক হরে চাঁড়ালের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং যাহার মনে যাহা ভাল বিবেচনা হইল, সেই মত ঔষধ ব্যবস্থা করিতে লাগিল। কবিরাজ মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, অমনি পুঁটলী খুলিয়া ঔষধ দিলেন। দুঃখীলোক অনুপান ও পথ্য কোথায় পাইবে, কর্ত্তার বাড়ী হইতেই তাহার ব্যবস্থা হইল। হরে চাঁড়াল সারিয়া উঠিল। বল দেখি, হরে চাঁড়াল দেশের লোকের প্রতি কত কৃতজ্ঞ

হইবে। হরে চাঁড়ালের বাড়ী হইতে আসিতে আসিতে পরাণ মণ্ডল ধরিল, বাবু! আমার বাগানে একবার পদার্পণ করিয়া যান। পরাণও নানা কারণে বাবুর নিকটে বাধ্য আছে। বাবু একবার তাহার বাগানে পদার্পণ করিলে সে কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাইবে। বাবু পরাণের বাগানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরাণের বাগান, পুকুর, গাছ-পালা কেমন সুন্দর হইয়াছে। বাবুর একবার মনে হইল এই পরাণ এক সময়ে খাইতে পাইত না! মনে একটু খুসী হইয়া কহিলেন, "বাঃ পরাণ! তোর যে দিব্য বাগান হইয়াছে"। পরাণ তখন আহ্লাদে আটখানা হইয়া গলায় কাপড় দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বাবুকে কহিল, "বাবু, সে আপনারই প্রসাদ"। বাবু, "দূর বেটা" বলিয়া সেখান হইতে সত্বর-পদে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। রাস্তায় একটী গলির মোড়ে রামনাথ বসুর বিধবা স্ত্রী মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেও বাবুর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী, তাহার আর কেহ নাই; কষ্টে দিনপাত করিয়া থাকে; কিন্তু থাকিবার ঘরটী সারায় তাহার এমন সঙ্গতি নাই। ঘরটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর মেরামত না হইলে শীঘ্রই আশ্রয়হীন হইতে হইবে। বাবু শুনিলেন, মৃত রামনাথের জন্য বিস্তর দুঃখ আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন, তাহার বিধবা স্ত্রীকে বলিলেন, মা তুমি এক সময়ে আমার কাছে যাইও. আমি ইহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব। বাবু বাড়ী আসিলেন, তাঁহার অনুচরবর্গ ক্রমে ক্রমে একে একে বিদায় হইয়া গেল। তখন বাবু স্নানাহারের জন্য বাড়ীর ভিতর গেলেন। সেখানে ভাই,ভাইপো,ভাগিনেয়, ভাইঝি-জামাই, নাতি প্রভৃতির আহারাদির দেখা শুনা করিলেন। তাহার পর অতিথি কেহ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সকলের আহারাদির পর আপনি আহার করিলেন। একটু বিশ্রামের পর অভ্যাগত অতিথিদিগের সহিত কিয়ৎক্ষণ নানা দেশীয় কথাবার্ত্তায় অতীত হইলে, আবার গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া জুটিল। তখন গ্রামের কে কেমন আছে, কাহার কেমন অবস্থা, এই সকল বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, তখন বাবু যথাসাধ্য লোকের কষ্ট নিরাকরণের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। সেকালের বাবুরা ছেলে দেখিলেই কোলে করিয়া লইতেন, কড়ানিয়া শতকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কাহাকেও "তুমি কি দিয়া ভাত খাইয়াছ," কাহাকেও বা "কে তোমায় অধিক ভাল বাসে," ইত্যাদি মিষ্টালাপে খুসী করিয়া দিতেন। কাহাকেও বা দোলাই কিনিয়া দিব বলিয়া খুসী করিতেন। সে দৌড়িয়া গিয়া তাহার মার কাছে গিয়া বলিত, মা! বাবু আমায় দোলাই কিনিয়া দিবেন বলিয়াছেন। দেশের মধ্যে কেহ কোন নূতন বিদ্যা, নূতন শিল্প, শিখিলে, কেহ গুণী হইলে তাহাকে উৎসাহ দেওয়া, তাহাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করা বাবুর নিত্যকর্ম্মের মধ্যে।

যেমন এক জায়গায় একটী ফুল ফুটিলে তাঁহার সৌরভে চারিদিক আমোদিত হয়, সেইরূপ কোন জায়গায় এক জন বড়লোক হইলে তাঁহার দ্বারা চারিদিগের লোক উপকৃত হইত। আমাদের নূতন সমাজে এখন আর সে রকম ফুল ফুটে না। সেরূপ বড়লোক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজের সঙ্গে থাকিয়া, ইংরাজিভাষা শিখিয়া আমরা বড়ই আত্মম্ভরী ও অসামাজিক হইয়া পড়িয়াছি। (Live for others), এইটী আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালীরা যত বুঝিত, এত বুঝি অন্য কোন দেশের লোক বুঝে না। এখনকার ইয়ং বেঙ্গলেরা (Live for others), করিবার জন্য সভা সমাজ এসোসিয়েসন, জলসা, ক্লব, সোসাইটী, মিটিং ইত্যাদি করিয়া থাকেন। একটু ভাবিয়া দেখিতে গেলে এই গুলির তলায়ও (সাইন) করিবার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নাই। অনেকে এই উপায়ে পরহিত করিতে গিয়া গুরুতর আত্মহিত করিয়া বসেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল লোকে সভাদি স্থাপন করিতে যায়, তাহারা আপনাপন ইষ্ট সিদ্ধি হইলেই সভার প্রতি হতাদর হইয়া পড়েন। সময়ে সময়ে দেখিতে পাই, লোকে ১০।১৫ বৎসর পরহিতে কাটাইয়া অতি সামান্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে পথ পরিত্যাগ করেন। সভা বা এসোসিয়েসনের পরহিত ফাঁপা জিনিস, ভিতরে তাহার সার নাই। খালি হাঁড়ীর মত বাজাইলে খুব শব্দ হয় বটে; কিন্তু কার্য্য তাহাতে কিছু হয় না। কারণ এখনকার যে সকল লোকে সভা করেন, তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্যই সাইন্ করা। সুতরাং তাহারা সভাগুলিকে এমনি করিয়া তৈয়ার করেন যে উহাতে শব্দ অধিক হয়। পৃথিবীর লোক জানিতে পারে যে অমুক অমুক খুব সাইন করিতেছে।

বাঙ্গালীরা ইংরাজ সহবাসে যত কিছু হারাইয়াছেন, মনুষ্যত্বই তাহাদের মধ্যে প্রধান, মনুষ্যত্বের অভাবে সমস্তই সারশূন্য হইয়া উঠিতেছে। গিল্‌টী অধিক চলিতেছে, যত সার কম, ততই অধিক চক্‌চক্যে হইতেছে। যে সমাজে যথার্থ মনুষ্যত্ব বিশিষ্ট লোকের আদর নাই এবং গিল্‌টী লোকের আদর অধিক, সে সমাজের অবস্থা বাস্তবিকই অতি শোচনীয়। আমাদের এখানে সমাজের অবস্থা সুতরাং বড়ই মন্দ। কিন্তু সে মনুষ্যত্ব কি আর দেখিতে পাইব? আবার কি বাঙ্গালীর মনে মনুষ্যত্ব করিবার বাঞ্ছা প্রবল হইবে? এ ছার সাইন করার বাঞ্ছা তিরোহিত হইবে? ভরসা ত দেখি না, সমাজেরও যে বড় মঙ্গল হইবে তাহারও ভরসা নাই।

রত্নরহস্য।

মাণিক্য।

আমরা "রত্ন রহস্য" নামক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে মুক্তা রত্নের উপর লেখনী সঞ্চালন করি। তাহার কারণ এই যে 'রত্ন' শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও প্রস্তর-জাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুতেই 'রত্ন' শব্দ প্রকৃষ্ট সংযোগ বিশিষ্ট হওয়ায় এবং মুক্তাও প্রস্তরকল্প শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া শাস্ত্রকারেরা মুক্তাকেও রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমরাও রত্ন-রহস্য প্রবন্ধে অগ্রে তাহারই গুণ দোষাদি বর্ণনা করিয়াছি। রত্ন নামধেয় প্রস্তর সকলের মধ্যে প্রধানতম রত্ন নয়টী (৯)। তাহা প্রস্তাবারম্ভের প্রথমে বলা হইয়াছে। পুনরায় পাঠকগণের স্মরণ জন্য উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

"মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য্য
গোমেদা বজ্র বিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং
নীলঞ্চেতি যথাক্রমাৎ॥"

রত্নের মধ্যে এই নয়টী প্রধান; এতভিন্ন বহুতর উপরত্ন আছে। আমাদের প্রতিজ্ঞা এই, যে, অগ্রে প্রধানতম নয়টী রত্নের বিষয় বর্ণনা করিব। পশ্চাৎ অন্যান্য রত্নের কথা লিখিব। সেই প্রতিজ্ঞা ও উপরোক্ত কবিতার ক্রম অনুসারে অগ্রে মুক্তারত্ন সম্বন্ধে যে কিছু বক্তব্য তৎসমুদায় বলা হইয়াছে। এক্ষণে মাণিক্য নামক রত্নের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

"এক মাণিক সাত রাজার ধন" এই নারী-প্রবাদ একবারে সত্য মনে করিবেন না। পূর্ব্বকালের অনেক রাজা (এক্ষণেও বটে) কেবল শস্য ও পশু-সম্পত্তি লইয়াই রাজাভিমান চরিতার্থ করিতেন। মণি মাণিক্য যে তাঁহাদের নিকট দুর্লভ ছিল, তাহা বলা বাহুল্য; অধিকন্তু সুবর্ণও তাঁহাদের নিকট দুর্লভ বস্তু ছিল বলিয়া অনুমান হয়, সুতরাং এক মাণিক্য সেরূপ সাত রাজার ধন হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি?

১৮০২ খৃষ্টাব্দে কৌণ্ট বুরনন রুবি, সেফায়ার, প্রভৃতি নাম দ্বারা মাণিক্যর শ্রেণী বদ্ধ করেন। এক্ষণে মাণিক্য শ্যাম দেশ, ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রেজিল, বোরনিও, সুমাত্রা, ফ্রান্স, প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রহ্ম দেশের মাণিক্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কথিত আছে ব্রহ্মদেশের রাজার নিকট পারাবতের অণ্ডের ন্যায় এক খানি বৃহৎ মাণিক্য আছে। টাবরনিয়ার লিখিয়াছেন, যে তিনি দীল্লীশ্বর মোগল সম্রাটের

সিংহাসনোপরি ১০৮ খণ্ড বৃহৎ মাণিক্য সুশোভিত দেখিয়াছেন। তাহার প্রত্যেক খণ্ডের ১০০ হইতে ২০০ শত রক্তিকা পর্য্যন্ত পরিমাণ হইবেক। মার্কপলো কহেন, সিংহলেশ্বরের একখানি বৃহৎ মাণিক্য ছিল। কবলাই খাঁ এই বহুমূল্য প্রস্তর খণ্ডের জন্য সিংহলাধিপতিকে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি এই প্রস্তর বিক্রয় করেন নাই। টাবরনিয়ার তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, বিশাপুরের রাজার একখানি উৎকৃষ্ট ৫০ রক্তিকা পরিমাণের মাণিক্য ছিল। এক্ষণে এতাদৃশ বৃহৎ মাণিক্য ভূমণ্ডলস্থ রাজ-ভাণ্ডারে দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। লুই নেপোলিয়ানের রাজমুকুটে কয়েকখানি উত্তম মাণিক্য ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনে আমাদিগের মহারাজ্ঞী এম্প্রেশ মহোদয়ার দুই খানি মাণিক্য যাহা প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহা প্রশংসার যোগ্য। রুশিয়ার রাজভাণ্ডারে একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট মাণিক্য আছে। উহা সুইডেনের নৃপতি তৃতীয় গষ্টেভস্ উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাভিন্ন অষ্ট্রীয়ার রাজমুকুটে কয়েকখানি বহু মূল্য মাণিক্য আছে।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত লেখকেরা বহুমূল্য মাণিক্যের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। থিওফ্রেসটস্ এবং প্লিনি প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার ন্যায় দীধিতি-বিকাশক মাণিক্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গ্রীকগণ বৃহৎ মাণিক্যের উপর যে সকল সুদৃশ্য প্রতিকৃতি খোদিত করিতেন, তাহা কএকখান এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

মাণিক্য এক প্রকার প্রস্তর। রত্নশাস্ত্রে তাহার এতগুলি নাম আছে। যথা— "মাণিক্য" ১, "শোণরত্ন" ২, "রত্নরাজ" ৩, "রবিরত্ন" ৪, "শৃঙ্গারী" ৫, "রঙ্গ মাণিক্য" ৬, "তরুণ" ৭, "রাগযুক্" ৮, "পদ্মরাগ" ৯, "রত্ন" ১০, "শোণোপল" ১১, "সৌগন্ধিক" ১২, "লোহিতক" ১৩, "কুরুবিন্দ" ১৪।

রত্নশাস্ত্রোক্ত এই সকল নামের মধ্যে ২।৪।৬।৭।৮।৯।১১।১৩ নাম বর্ণ ঘটিত। বিশেষ ১১ অর্থাৎ শোণোপল নামটীতে উহার বর্ণ ও স্বরূপ স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। শোণোপল অর্থাৎ রক্তবর্ণ প্রস্তর। "রক্তবর্ণ প্রস্তরই মাণিক" এই কথা বলিলাম বলিয়া সে সে রাঙ্গা পাথর মাণিক নহে। রত্নশাস্ত্রে ইহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ও পরীক্ষাদি বর্ণিত আছে। সেই লক্ষণাদিযুক্ত প্রস্তর বিশেষই মাণিক্য। রত্নশাস্ত্রে মাণিক্য নামক রত্নের যেরূপ লক্ষণাদি বর্ণন দৃষ্ট হয়, তদনুসারে বোধ হয়, আধুনিক "পান্না" নামক প্রস্তর বিশেষকেই পূর্ব্বকালের সংস্কৃতবেত্তারা "মাণিক্য" নামে অভিহিত করিতেন। তাহা হইলে পান্না ও মাণিক একই পদার্থ; তবে মাণিক্য নামটী সংস্কৃত নাম, এবং পান্না নামটী পারসিক নাম, ইহাই সুসিদ্ধান্ত।

পুরাণাদি শাস্ত্রে রত্নোৎপত্তির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে তাহার অন্তত্ত্ব আমাদের বোধগম্য হয় না। বল নামে

এক অসুর, তাহার বিশুদ্ধ সত্বাক্রান্ত অবয়ব সকল রত্নোৎপত্তির কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক প্রকার প্রলাপকল্প গল্প আছে। এই প্রলাপকল্প গল্পের দ্বারা আমরা রত্নোৎপত্তির মূল ভাব গ্রহণ করিতে অসমর্থ,তবে রত্নশাস্ত্রে যে দুই একটী কথার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তদনুসারে অতি সামান্যাকারে রত্নোৎপত্তির বীজ ও ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়। রত্নশাস্ত্রে তিন প্রকার মতের আভাস পাওয়া যায়। যথা—

"মহোদধৌ সরিতি বা
পর্ব্বতে কাননেঽপিবা।
তত্তদাকারতাং যাতং
স্থানমাধেয় গৌরবাৎ।"

[যুক্তিকল্পতরুঃ।

"কেচিদ্বদন্তিভুবঃ স্বভাবাৎ
বৈকৃতাচ্চান্যানোষাঞ্চভূতানাম্।
প্রাদুর্ভবন্তি রত্নানি——"

[জ্যোতিষম্।

সমুদ্রেই হউক, নদীতেই হউক, পর্ব্বতেই হউক, কিংবা অরণ্যে (অরণ্যস্থ সর্পাদি জন্তুতে) হউক, স্থান অর্থাৎ তত্তৎ স্থানীয় বস্তু বিশেষ আধেয় অর্থাৎ আগন্তুক কিংবা আকাশিক (জলাদি) বস্তুর শক্তিতে সেই সেই রত্নের আকার প্রাপ্ত হয়।

কেহ বলেন, পৃথিবীর স্বভাব বলেই রত্ন সকল প্রাদুর্ভূত হয়; অপরে বলেন, ভূত সকল অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু ও তেজ, এই সকল পরস্পর পরস্পর কর্ত্তৃক অনুবিদ্ধ হইয়া পৃথক পৃথক বিকার ভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই রত্ন সকল উৎপন্ন হয়। যাহা হউক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতটী আংশিক ভাল বটে।

যে কোন রত্ন হউক, অগ্রে আকার, তৎপরে বর্ণ, তৎপরে গুণ ও দোষ, পরে ফলাফল, পশ্চাৎ জাতি বিজাতি পরীক্ষা, মূল্যাবধারণ করিতে হয়, যথা—

"আকারবর্ণৌ প্রথমং গুণদোষৌ
তৎফলং পরীক্ষাচ।
মূল্যঞ্চ রত্ন কুশলৈর্বিজ্ঞেয়ং
সর্ব্ব শাস্ত্রানাম্।"

[গরুড় পুরাণ।

অতএব, আমরা মাণিক্য সম্বন্ধেও উক্ত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অগ্রে আকার, পরে বর্ণ ও গুণ দোষাদির কথা বলিব।

আকার।

এস্থলে আকার ও লক্ষণ একই কথা। অতএব রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে লক্ষণ শব্দের উল্লেখে যে সকল আকারগত চিহ্নের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে উদ্ধৃত হইল। যথা—

"স্নিগ্ধং গুরু গাত্রযুতং দীপ্তং
স্বচ্ছং সমাঙ্গঞ্চ সুরঙ্গদঞ্চ।
ইতি জাত্য মাণিক্যং
কল্যাণং ধারণাৎ কুরুতে।"

স্নিগ্ধ—অর্থাৎ স্নেহ-গুণযুক্ত (টলটলে) গুরু-গাত্রযুত—অর্থাৎ দৃশ্যে ও ওজনে ভারি (অন্যান্য সাধারণ কাঁচা পাথর অপেক্ষা ইহা সমধিক ভারি)। দীপ্ত—দীপ্তিমান। স্বচ্ছ—সুন্দর নির্ম্মল। সমাঙ্গ—গঠন সমান। সুরঙ্গদ—সুন্দর রাগ

অর্থাৎ রঞ্জনকারী (এই শক্তির বিষয় পরে ব্যক্ত হইবে)।

"বিরূপং রাগ বিমলং
লঘু মাণিক্যং নধারয়েদ্ধীমান্।"

যাহার রূপ বিকৃত, রাগ অর্থাৎ রক্ততা বিকৃত বা মলিন, আকার ও ওজনে লঘু, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ মাণিক্য ধারণ করিবেন না। অর্থাৎ এরূপ মাণিক্য উৎকৃষ্ট নহে।

"মাণিক্যং কষ ঘর্ষণেঽপ্যবিকলং
রাগেন জাত্যং জগুঃ।"

[রাজনির্ঘণ্টঃ।

কষ, অর্থাৎ কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথরে ঘর্ষণ করিলে যে মাণিক্য ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না এবং ঘৃষ্ট স্থানের রাগ অর্থাৎ রক্তিমা নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্য মাণিক, ইহা রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন।

জাত্য মাণিক্য কি? তাহা পরে বর্ণন করা যাইবেক। এক্ষণে দুই চারিটী গুণ দোষের কথা বলা যাউক।

বস্তু মাত্রেরই দুই শ্রেণীর গুণ আছে। এক রাসায়নিক গুণ, দ্বিতীয় শোভাগত গুণ। রাসায়নিক গুণ সকল বৈদ্যশাস্ত্রে পরিগৃহীত হইয়াছে, সে সকল সংগ্রহ করা এ প্রস্তাবে অপ্রয়োজন। রত্নশাস্ত্রে যে শোভাগত গুণের উল্লেখ আছে তাহাই সংগ্রহ করা যাউক।

গুণ।

"গুরুত্বং স্নিগ্ধতাচৈব
বৈমল্য মতি রক্ততা।"

[যুক্তি কল্পতরু।

গুরুত্ব অর্থাৎ ওজনে ভারি। স্নিগ্ধতা অর্থাৎ স্নেহাক্তের ভাব। বৈমল্য অর্থাৎ নির্ম্মলের ভাব। অতিরক্ততা অর্থাৎ অসাধারণ রক্ত বর্ণের ভাব। এই রক্ত বর্ণের ভাবটী ছায়া-নির্ণয় ব্যতীত বোধগম্য হইতে পারে না। পদ্মরাগ বা মাণিক্য মণির ছায়া কি? তাহা পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইবে। ফল, উপরোক্ত গুণ থাকিলেই তাহা উৎকৃষ্ট মাণিক্য হইবে।

এই গুণ কয়েকটী মতান্তরে অতি স্পষ্ট রূপে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"বর্ণাধিকং গুরুত্বঞ্চ
স্নিগ্ধতাচ তথাচ্ছতা।
অর্চ্চিষ্মত্তা মহত্তাচ
মণীনাং গুণ সংগ্রহঃ।"

[কল্পদ্রুমধৃত বচন।

বর্ণের আধিক্য অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণযুক্ততা। গুরুত্ব—ভারগত আধিক্য। স্নিগ্ধতা—স্নেহ ম্রক্ষিতের ন্যায় দৃশ্য অর্থাৎ লাবণ্যযুক্ত। অচ্ছতা—নৈর্ম্মল্য। অর্চ্চিষ্মত্তা—তেজ বা দীপ্তিমত্তা। মহত্তা—বৃহত্তের ভাব। (অর্থাৎ যে মণি যত বড় সে ততই উৎকৃষ্ট। এই জন্য মহত্তা একটী প্রধান গুণ)। ইহাই মণি সকলের গুণের সংগ্রহ। অর্থাৎ এই সকল গুণ মণিমাত্রেরই থাকা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ গুণ সকল প্রসঙ্গ ক্রমে ব্যক্ত হইবেক।

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত জাত্য মাণিক্য শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।

মণিমাত্রেরই জাতি আছে। তাহা

গুণ অনুসারেই অবধারিত হয়। কি কি গুণে জাতি ও কি কি গুণ অভাবে বিজাতি, তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"মাণিক্যং কষ ঘর্ষণেঽপ্য
বিফলং রাগেণ জাত্যংজগুঃ।"
[রাজ নির্ঘণ্টঃ।

ইহার অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যুক্তি-কল্পতরু বলেন,—

"অপ্রনশ্যতি সন্দেহে
শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্ত শোভাবান্
পরিমাণং নমুঞ্চতি।
স জ্ঞেয়ঃ শুদ্ধ জাতিস্ত
জ্ঞেয়াশ্চান্যে বিজাতয়ঃ।
স্বজাতকং সম্মুখেন
বিলিখেৎ বা পরস্পরম্।
বজ্রং বা কুরুবিন্দংবা
বিমুচ্যান্যোন্যকেন চেৎ।
ন শক্যং লেখনং কর্ত্তুং
পদ্মরাগেন্দ্র নীলয়োঃ।"
"যঃ শ্যামিকাং পুষ্যতি পদ্মরাগো
যোবা তুষানামিব চূর্ণ মধ্যঃ।
স্নেহ প্রদিগ্ধো ন চ য়ো বিভাতি
যোবা প্রমৃজ্যঃ প্রভাহাতি দীপ্তিম্।
আক্রান্ত মূর্দ্ধা চ তথাঙ্গুলিভ্যাং
যঃ কালিকাং পার্শ্বগতাং বিভর্ত্তি।"
ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাত্য মণি কি বিজাত মণি সন্দেহ নাশ না হইলে কষ-শিলায় ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভার আধিক্য জন্মে এবং পরিমাণ নষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহা বিশুদ্ধ জাতি; তদ্ভিন্ন বিজাতি। এই এক প্রকার পরীক্ষা। দ্বিতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, হীরক হউক, বা মাণিক্য হউক, স্বজাতীয় দুইটী মণি মুখোমুখি করিয়া ঘর্ষণ করিবেক, অথবা একের দ্বারা অন্যকে বিলেখিত অর্থাৎ আঁচোড়ন করিবেক। জাত্য হইলে কেহ কাহারও গাত্রে বিলেখন করিতে সমর্থ হইবেক না। তৃতীয় প্রকার পরীক্ষা এই যে, যে পদ্মরাগ মণি শ্যামিকার পুষ্টি করে, যে মণি তুষবৎ চূর্ণমধ্য, এবং যাহাকে স্নেহাক্ত দেখায় না, মার্জ্জন করিলে যাহার দীপ্তি ন্যূন হয়, অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা যাহার মস্তক অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বে কালিকা অর্থাৎ কাল ছবি প্রকাশ পায়, তাহা জাত্য মণি নহে, তাহা নিশ্চিত বিজাত। জাত্য মণিতে ঐ সকল ঘটনা হয় না। শব্দকল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থের অন্য এক প্রমাণে চতুর্থ প্রকার পরীক্ষার কথাও আছে। যথা—

"তুল্য প্রমানস্যতু তুল্যজাতে
র্যোবা গুরুত্বেন ভাবস্রতুল্যঃ।"

এক জাতীয় দুইটী মণি যদি আকার প্রমাণে অর্থাৎ দেখিতে তুল্য হয়, আর যদি তাহা গুরুত্বে তুল্য না হয়, তাহা হইলে যেটী লঘু, সেটী বিজাত। এতদ্দ্বারা এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, তুল্যাকার অন্য মণির সঙ্গে ওজন করিয়া দেখাও এক প্রকার জাত্য পরীক্ষা।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মাণিক্যরত্ন রক্তচ্ছবি-বিশিষ্ট। মাণিক্য মাত্রেই রক্ত বর্ণ বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। রক্তবর্ণতারও প্রভেদ আছে। সেই প্রভেদ অনুসারে নাম-ভেদ ও মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। উপরে যে জাতি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐ সকল জাতি গুণ যদি বিভিন্ন বর্ণের মাণিক্যেও সমঞ্জস্য লাভ করে, তাহা হইলেই তাহাকে মাণিক বলা যাইবেক, নচেৎ তাহা অন্য এক প্রকার প্রস্তর মাত্র।

কোন কোন মতে এই রত্ন রক্তবর্ণ ব্যতীত অন্য বর্ণও হইয়া থাকে। সেই বর্ণ অনুসারে মাণিক্য চারি প্রকার জাতি বলিয়া গণ্য হয়। যথা—

"তদ্রক্তং যদি পদ্মরাগ মথতৎ
পীতাভি রক্তং দ্বিধা।
জানীয়াৎ কুরু বিন্দকং যদরুণং-
স্যাদেষু সৌগন্ধিকম্।
তন্নীলং যদি নীল গন্ধিক-মিতি
জ্ঞেয়ং চতুর্ধা বুধৈঃ।"

[রাজ নির্ঘণ্টঃ।

অর্থ এই, যে, সেই মাণিক্য যদি রক্ত বর্ণ হয় তবে তাহার "পদ্মরাগ" নাম দেওয়া যায়। আর যদি তাহা পীতাভ কি অতি রক্ত হয়, তবে তাহা দুই প্রকার স্থির করিবে। যাহা অতি রক্ত, তাহা "কুরুবিন্দক" এবং যাহা পীতাভ, তাহা "সৌগন্ধিক"। যদি তাহা নীলাভ হয়, তবে তাহা "নীলগন্ধিক" বলিয়া জানিতে হইবেক।

দোষ।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্য রত্নের যে সকল দোষনিচয় বর্ণন করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে তাহাও উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

" মাণিক্যস্য সমাখ্যাতা
অষ্টৌ দোষা মনীশ্বরেঃ।
দ্বিচ্ছায়ঞ্চ দ্বিরূপঞ্চ সম্ভেদঃ
কর্করাস্তথা।
গুণাশ্চত্বার আখ্যাতাশ্ছায়াঃ
ষোড়শ কীর্ত্তিতাঃ।"

রত্ন পরীক্ষক মুনিগণ মাণিক্যরত্নের আটটী দোষ (মহৎ দোষ) স্থির করিয়া গিয়াছেন। দুইটী ছায়াগত দোষ, দুইটী রূপগত দোষ, সম্ভেদ দোষ এবং কর্কর দোষ। এইরূপ চারিটী গুণ ও ১৬ ষোল প্রকার ছায়ার কথাও বলিয়াছেন। ছায়া কি? এবং তাহা ১৬ ষোল প্রকারই বা কেন? ইহা পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবেক। "দ্বিচ্ছায়" "দ্বিরূপ" "সম্ভেদ" ও "কর্কর"—এই দোষচতুষ্টয় বিবৃত্ত করা যাউক।

"ছায়া দ্বিতয় সম্বন্ধাৎদ্বিচ্ছায়ং বন্ধুনাশনম্।"
"দ্বিরূপং দ্বিপদং তেনমাণিক্যেন পরাভবঃ।"
"সম্ভেদো ভিন্ন মিত্যুক্তংশস্ত্রঘাত বিধায়কম্।"
"কর্করাং কর্করা যুক্তং পশুবন্ধ বিনাশকৃৎ।"

[যুক্তি কল্পতরু।

যে মাণিক্যে দুই প্রকার ছায়ার সংযোগ থাকে, তাহা দ্বিচ্ছায় দোষগ্রস্থ। দ্বিচ্ছায় মাণিক ধারণ করিলে বন্ধু বিনাশ হয়। যাহার উভয়দিকে পদ তাহা দ্বিরূপ দোষযুক্ত। (পদ কি? তাহা স্বতন্ত্র স্থানে

ব্যক্ত হইবেক) এই দ্বিরূপ মাণিক্য ধারণে পরাভব হয়। ভিন্ন অর্থাৎ ভাঙ্গা হইলে সম্ভেদ বলে। সম্ভেদ মাণিক্য ধারণে অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। কর্করা অর্থাৎ কাঁকর সংযোগ থাকিলে তাহা কর্কর দোষে দুষ্ট বলা যায়। এই কর্কর মাণিক্য ধারণ করিলে নানা প্রকার দুঃখ ঘটনা হয়।

ক্রমশঃ

শ্রীরামদাস সেন॥

পালামৌ।

তৃতীয় অংশ।

পূর্ব্বে একবার "লাতেহার" নামক পাহাড়ের উল্লেখ করিয়াছিলাম। সেই পাহাড়ের কথা আবার লিখিতে বসিয়াছি বলিয়া আমার আহ্লাদ হইতেছে। পুরাতন কথা বলিতে বড় সুখ, আবার বিশেষ সুখ এই যে আমি শ্রোতা পাইয়াছি। তিন চারিটি নিরীহ ভদ্রলোক, বোধ হয় তাঁহাদের বয়স হইয়া আসিতেছে, পুরাতন কথা বলিতে শীঘ্র আরম্ভ করিবেন এমন উমেদ রাখেন, বঙ্গদর্শনে আমার লিখিত পালামৌ-পর্য্যটন পড়িয়াছেন, আবার ভাল বলিয়াছেন। প্রশংসা অতিরিক্ত, তুমি প্রশংসা কর আর না কর, বৃদ্ধ বসিয়া তোমায় পুরাতন কথা শুনাবে, তুমি শুন বা না শুন সে তোমায় শুনাবে, পুরাতন কথা এই রূপে থেকে যায়, সমাজের পুঁজি বাড়ে। আমার গল্পে কাহারও পুঁজি বাড়িবে না, কেন না আমার নিজের পুঁজি নাই। তথাপি গল্প করি, তোমরা শুনিয়া আমায় চির-বাধিত কর।

নিত্য অপরাহ্নে আমি লাতেহার পাহাড়ের ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তাঁবুতে শত কার্য্য থাকিলেও আমি তাহা ফেলিয়া যাইতাম। চারিটা বাজিলে আমি অস্থির হইতাম; কেন তাহা কখন ভাবিতাম না; পাহাড়ে কিছুই নূতন নাই; কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কোন গল্প হইবে না, তথাপি কেন আমায় সেখানে যাইতে হইত জানি না। এখন দেখি এ বেগ আমার একার নহে। যে সময় উঠানে ছায়া পড়ে, নিত্য সে সময় কুলবধূর মন মাতিয়া উঠে, জল আনিতে যাইবে; জল আছে বলিলেও তাহারা জল ফেলিয়া জল আনিতে যাইবে; জলে যে যাইতে পাইল না সে অভাগিনী, সে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে ছায়া পড়ি-

তেছে, আকাশে ছায়া পড়িতেছে, পৃথিবীর রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না, তাহার কত দুঃখ। বোধ হয় আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জ্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।

এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জ্জন, কোথায়ও ছোট জঙ্গল নাই, সর্ব্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়া গাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে সেখানে একাকী থাকে। তাহারই মধ্যে একটীকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, তাহার নাম "কুমারী" রাখিয়াছিলাম। কখন তাহার ফল কি ফুল হয় নাই; কিন্তু তাহার ছায়া বড় শীতল ছিল। আমি সেই ছায়ায় বসিয়া "দুনিয়া" দেখিতাম। এই উচ্চ স্থানে বসিলে পাঁচ সাত ক্রোশ পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দূরে চারিদিকে পাহাড়ের পরিখা, যেন সেই খানে পৃথিবীর শেষ হইয়া গিয়াছে। সেই পরিখার নিম্নে গাঢ় ছায়া, অল্প অন্ধকার বলিলেও বলা যায়। তাহার পর জঙ্গল। জঙ্গল নামিয়া ক্রমে স্পষ্ট হইয়াছে। জঙ্গলের মধ্যে দুই একটী গ্রাম হইতে ধীরে ধীরে ধূম উঠিতেছে, কোন গ্রাম হইতে হয়ত বিষণ্ণ ভাবে মাদল বাজিতেছে, তাহার পরে আমার তাঁবু, যেন একটি শ্বেত কপোতী জঙ্গলের মধ্যে একাকী বসিয়া কি ভাবিতেছে। আমি অন্যমনস্কে এই সকল দেখিতাম, আর ভাবিতাম এই আমার "দুনিয়া।"

একদিন এই স্থানে সুখে বসিয়া চারিদিক দেখিতেছি, হঠাৎ একটি লতার প্রতি দৃষ্টি পড়িল; তাহার একটি ডালে অনেক দিনের পর চারি পাঁচটী ফুল ফুটিয়াছিল। লতা আহ্লাদে তাহা আর গোপন করিতে পারে নাই, যেন কাহারে দেখাইবার জন্য ডালটি বাড়াইয়া দিয়াছিল। একটী কালো কোলো বড় গোচের ভ্রমর তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; আর এক একবার সেই লতায় বসিতেছিল। লতা তাহাকে নারাজ, ভ্রমর বসিলেই অস্থির হইয়া মাথা নাড়িয়া উঠে। লতাকে এইরূপ সচেতনের ন্যায় রঙ্গ করিতে দেখিয়া আমি হাসিতেছিলাম এমত সময়ে আমার পশ্চাতে উচ্চারিত হইল,

"রাধে মন্যুং পরিহর হরিঃ
পাদ মূলে তরায়ং।"

আমি পশ্চাৎ ফিরিলাম, দেখিলাম কেহই নাই, চারিদিক চাহিলাম কোথায়ও কেহ নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতেছি এমত সময় আবার আর এক দিকে শব্দিত হইল,

"রাধে মন্যুং ইত্যাদি।"

আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, আমি সেই দিকে কতক সভয়ে, কতক কৌতূহল পরবশে গেলাম। সে দিকে গিয়া আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না কিয়ৎ

পরেই "কুমারীর" ডাল হইতে সেই শ্লোক আবার উচ্চারিত হইল, কিন্তু তখন শ্লোকের স্পষ্টতা আর পূর্ব্বমত বোধ হইল না, কেবল স্বর আর ছন্দ শুনা গেল, "কুমারীর" মূলে আসিয়া দেখি, হরিয়াল ঘুঘুর ন্যায় একটী পক্ষী আর একটীর নিকট মাথা নাড়িয়া এই ছন্দে আস্ফালন করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে, পক্ষিণী তাহাকে ডানা মারিয়া সরিয়া যাইতেছে, কখন কখন অন্য ডালে গিয়া বসিতেছে। এবার আমার ভ্রান্তি দূর হইল, আমি মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দের একটিমাত্র শ্লোক জানিতাম; ছন্দটী উচ্চারণ মাত্রেই শ্লোকটি আমার মনে আসিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেও তাহার কার্য্য হইয়াছিল, আমি তাহাই শুনিয়াছিলাম "রাধে মন্ন্যং।" কিন্তু পক্ষী বর্ণ উচ্চারণ করে নাই কেবল ছন্দ উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহা যাহাই হউক আমি অবাক হইয়া পক্ষীর মুখে সংস্কৃত ছন্দ শুনিতে লাগিলাম। প্রথমে মনে হইল যিনি "উদ্ধব দূত" লিখিয়াছেন, তিনি হয়ত এই জাতি পক্ষীর নিকট ছন্দ পাইয়াছিলেন? শ্লোকটির সঙ্গে এই "কুঞ্জকীরানুবাদের" বড় সুসঙ্গতি হইয়াছে। শ্লোকটী এই—

রাধে মন্ন্যং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং।
জাতং দৈবা দশদৃশ মিদং বায়মেকং ক্ষমস্ব॥
এতানাকর্ণয়সি ময়বন্ কুঞ্জকীরানুবাদা।
নেভিঃ ক্রৈর্ধ্যমবিরতং বঞ্চিতাঃ বঞ্চিতাঃস্ম

উদ্ধব মথুরা হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া রাধার কুঞ্জে উপস্থিত হইলে গোপীগণ আপনাদের দুঃখের কথা তাঁহার নিকট বলিতেছেন, এমত সময়ে কুঞ্জের একটা পক্ষী বৃক্ষশাখা হইতে বলিয়া উঠিল, "রাধে আর রাগ করিও না। চেয়ে দেখ, স্বয়ং হরি তোমার পদতলে। দৈবাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে একবার তাহা ক্ষমা কর।" গোপীরা এতবার এই কথা রাধিকাকে বলিয়াছে যে কুঞ্জ পক্ষীরা তাহা শিখিয়াছিল। যাহা শিখিয়াছিল অর্থ না বুঝিয়া পক্ষীরা তাহা সর্ব্বদাই বলিত। গোপীরা উদ্ধবকে বলিলেন, "শুন্‌লে—কুঞ্জের ঐ পাখি কি বলিল—শুন্‌লে? একে বিধাতা আমাদের বঞ্চনা করেছেন, আবার দেখ পোড়া পক্ষীও কত দগ্ধাচ্ছে।"

পক্ষী আবার বলিল "রাধে মুন্যং পরিহর হরিপাদমূলে তবায়ং" তাহাই বলিতেছিলাম বিহঙ্গচ্ছন্দে বিহঙ্গের উক্তি বড় সুন্দর হইয়াছিল।

ছন্দ কি গীত শিখাইলে অনেক পক্ষী তাহা শিখিতে পারে; কিন্তু ছন্দ যে কোন পক্ষীর স্বরে স্বভাবিক আছে তাহা আমি জানিতাম না, সুতরাং বন্য পক্ষীর মুখে ছন্দ শুনিয়া বড় চমৎকৃত হইয়াছিলাম। পক্ষীটীর সঙ্গে কতই বেড়াইলাম, কতবার এই ছন্দ শুনিলাম, শেষ সন্ধ্যা হইলে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে মনে হইল যদি এখানে কেহ ডারউইন সাহেবের ছাত্র থাকিতেন তিনি ভাবিতেন নিশ্চয়ই এ পক্ষীটী রাধাকুঞ্জের শিক্ষিত পক্ষীর বংশ, বৈজিক কারণে পূর্ব্ব পুরুষের অভ্যস্ত শ্লোক ইহার কণ্ঠে

আপনি আসিয়াছে। বৈষ্ণবদের উচিত এ বংশকে আপন আপন কুঞ্জে স্থান দেন। রাধাকুঞ্জের সকল গিয়াছে, সকল ফুরাইয়াছে, কেবল এই বংশ আছে। আমার ইচ্ছা আছে একটী হরিয়াল পালন করি, দেখি সে "রাধে মুন্যং পরিহর" বলে কি না বলে।

আর একদিনের কথা বলি; তাহা হইলেই লাতেহার পাহাড়ের কথা আমার শেষ হয়। যে রূপ নিত্য অপরাহ্নে এই পাহাড়ে যাইতাম সেই রূপ আর একদিন যাইতেছিলাম, পথে দেখি একটি যুবা বীরদর্পে পাহাড়ের দিকে যাইতেছে, পশ্চাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহাকে সাধিতে সাধিতে সঙ্গে যাইতেছে। আমি ভাবিলাম যখন স্ত্রীলোক সাধিতেছে তখন যুবার রাগ নিশ্চয় ভাতের উপর হইয়াছে; আমি বাঙ্গালী, সুতরাং এ ভিন্ন আর কি অনুভব করিব? এককালে এরূপ রাগ নিজেও কতবার করিয়াছি, তাহাই অন্যের বীরদর্প বুঝিতে পারি।

যখন আমি নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন স্ত্রীলোকেরা নিরস্ত হইয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল। বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করায় যুবা সদর্পে বলিল "আমি বাঘ মারিতে যাইতেছি, এই মাত্র আমার গরুকে বাঘে মারিয়াছে; আমি ব্রাহ্মণ সন্তান; সে বাঘ না মারিয়া কোন্ মুখে আর জল গ্রহণ করিব?" আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতীভ হইয়া বলিলাম "চল, আমি তোমার সঙ্গে যাইতেছি।" আমার অদৃষ্টদোষে বগলে বন্দুক, পায়ে বুট, পরিধানে কোট প্যাণ্টুলন, বাস তাঁবুতে, সুতরাং একথা না বলিলে ভাল দেখায় না, বিশেষতঃ অনেকে আমায় সাহেব বলিয়া জানে অতএব সাহেবি ধরণে চলিলাম কিন্তু নিঃশঙ্কোচ চিত্তে।* আমি স্বভাবতঃ বড় ভীত, তাহা বলিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূক সম্বন্ধে আমার কখন ভয় হয় নাই। বৃদ্ধ শিকারীরা কত দিন পাহাড়ে একাকী যাইতে আমায় নিশেধ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহা কখনও গ্রাহ্য করি নাই, নিত্য একাকী যাইতাম; বাঘ আসিবে, আমায় ধরিবে, আমায় খাইবে, এ সকল কথা কখনও আমার মনে আসিত না। কেন আসিত না তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি না। সৈনিক পুরুষদের মধ্যে অনেকে আপনার ছায়া দেখিয়া ভয় পায়, অথচ অম্লান বদনে রণ-ক্ষেত্রে গিয়া রণ করে। গুলি কি তরবার তাহার অঙ্গে প্রবিষ্ট হইবে একথা তাহাদের মনে আইসে না। যত দিন তাহাদের মনে একথা না আইসে, ততদিন লোকের নিকট তাহারা সাহসী; যে বিপদ না বুঝে, সেই সাহসিক। আদিম অবস্থায় সকল পুরুষই সাহসী ছিল, তাহাদের তখন ফলাফল জ্ঞান হয় নাই। জঙ্গলীদের মধ্যে অদ্যাপি দেখা যায় সকলেই সাহসী, ইউরোপীয় সভ্যদের অপেক্ষাও অনেক অংশে সাহসী; হেতু ফলাফল বোধ নাই। আমি তাহাই আমার সাহসের বিশেষ গৌরব করি না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সাহসের ভাগ কমিয়া আইসে; পেনাল

ক্রোড় যত ভাল হয় সাহস তত অন্তর্হিত হয়। এখন এ সকল রুচকচি যাক।

যুবার সঙ্গে কতকদূর গেলে সে আমায় বলিল, "বাঘটি আমি স্বহস্তে মারিব।" আমি হাসিয়া সম্মত হইলাম। যুবা আর কোন কথা না বলিয়া চলিল। তখন হইতে নিজের প্রতি আমার কিঞ্চিৎ ভালবাসার সঞ্চার হইল। "স্বহস্তে মারিব" এই কথায় বুঝাইয়াছিল, যে পরহস্তে বাঘ মরা সম্ভব; আমি সাহেববেশধারী, অবশ্য বাঘ মারিলে মারিতে পারি, যুবা এ কথা নিশ্চয় ভাবিয়াছিল, তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তাহার পর কতকদূর গিয়া উভয়ে পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। যুবা অগ্রে, আমি পশ্চাতে। যুবার স্কন্ধে টাঙ্গী, সে একবার তাহা স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার পর কতক দূর গিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিল আপনি জুতা খুলুন, শব্দ হইতেছে। আমি জুতা খুলিয়া খালি পায় চলিতে লাগিলাম, আবার কতকদূর গিয়া বলিল, "আপনি এইখানে দাঁড়ান আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া আসি।" আমি দাঁড়াইয়া থাকিলাম, যুবা চলিয়া গেল। প্রায় দণ্ডেক পরে যুবা আসিয়া অতি প্রফুল্ল বদনে বলিল, "হইয়াছে, সন্ধান পাইয়াছি, শীঘ্র আসুন বাঘ নিদ্রা যাইতেছে।" আমি সঙ্গে গিয়া দেখি, পাহাড়ের এক স্থানে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার ন্যায় একটী গর্ত্ত বা গুহা আছে, তাহার মধ্যস্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত একটি কুটির, চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান তাহার প্রাঙ্গণস্বরূপ। যুবা সেই গর্ত্তের নিকটে এক স্থানে দাঁড়াইয়া অতি সাবধানে ব্যাঘ্র দেখাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ব্যাঘ্র নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় চোখ বুজিয়া আছে, মুখের নিকট সুন্দর নখর সংযুক্ত একটী থাবা দর্পণের ন্যায় ধরিয়া নিদ্রা যাইতেছে। বোধ হয় নিদ্রার পূর্ব্বে থাবাটি একবার চাটিয়াছিল। যে দিকে ব্যাঘ্র নিদ্রিত ছিল, যুবা সেই দিকে চলিল। আমায় বলিল, "মাথা নত করিয়া আসুন, নতুবা প্রাঙ্গণে ছায়া পড়িবে" তদনুসারে আমি নত শিরে চলিলাম; শেষ একখানি বৃহৎ প্রস্তরে হাত দিয়া বলিল, "আসুন, এই খানি ঠেলিয়া তুলি," উভয়ে প্রস্তরখানিকে স্থানচ্যুত করিলাম। তাহার পর যুবা একা তাহা ঠেলিয়া গর্ত্তের প্রান্তে নিঃশব্দে লইয়া গেল, একবার ব্যাঘ্রের প্রতি চাহিল, তাহার পর প্রস্তর ঘোর রবে প্রাঙ্গণে পড়িল; শব্দে কি আঘাতে তাহা ঠিক জানিনা ব্যাঘ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তাহার পর পড়িয়া গেল। এ নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। পর দিবস বাহক স্কন্ধে ব্যাঘ্রটি আমার তাঁবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; কিন্তু তখন তিনি মহানিদ্রাচ্ছন্ন বলিয়া বিশেষ কোন প্রকার আলাপ হইল না।

প্র, না, ব,

বাঙ্গালায় কলের কাপড়।

যখন আগের যন্ত্র বাঙ্গালায় প্রথম আনীত হইল, আনন্দে ইতর লোকেরা গাইয়াছিল ;—

"কি কল বানালে সাহেব কোম্পানি ;
কলেতে ধূমা উঠে আপনি।"

তখন তাহারা জানিত না যে সেই কলে তাহাদের কোন অপকার হইবে ; এখনও অনেক ভদ্র বাঙ্গালী জানেন না যে কলের আবির্ভাবে বাঙ্গালার কোন অপকার হইয়াছে বা হইতেছে। মোটা-মুটি দেখিতে পাই কলের বলে দুই দিনের পথ দুই ঘন্টায় যাই, অপার নদী পার হই, সস্তা দরে কাপড় পরি ; সুতরাং আমরা কলের অপেক্ষা বাঙ্গালার মঙ্গল-দায়ী আর দেখি না।

স্বীকার করি, কল শুভপ্রদ। কিন্তু সে শুভ অনেক সময় আমাদের নিজের ; বঙ্গসমাজের নহে। আমাদের নিজের শুভ এবং সমাজের শুভ পরস্পর বিরোধী নহে সত্য, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহা হয়। চোরের দৃষ্টান্ত স্মরণ কর ; যে ব্যক্তি লক্ষ টাকা চুরি করিল, তাহার কত আহ্লাদ। কিন্তু সেই চুরির নিমিত্ত সমাজের কত রাগ, কত ক্ষতি-বোধ! তাহাকে ধরিয়া কারাবদ্ধ না করিলে সে রাগের শান্তি হয় না। এই স্থলে ব্যক্তি-বিশেষের এবং সমাজের শুভাশুভ পরস্পর বিরোধী। বিরোধী বলিয়াই নীতিশাস্ত্র ও পেনাল-কোডের প্রয়োজন হইয়াছে।

কলের কাপড় আমাদের আপন আপন পক্ষে বিশেষ ভাল। কিন্তু বঙ্গ সমাজের পক্ষে সেই রূপ কি না, তাহাই প্রথমে আলোচনা করিবার নিমিত্ত দুই একটি কথা স্মরণ করিয়া দিই।

বস্ত্রের বিষয়ে বাঙ্গালা এক সময় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইয়াছিল। ঢাকায় যেরূপ সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্র বয়ন হইত, তদ্রূপ আর কোন দেশে হইত না। পূর্ব্ব-কালে যখন রোমানেরা অতি সুবেশী হইয়া উঠেন, তখন ঢাকা হইতে তাঁহারা কার্পাস কাপড় লইয়া যাইতেন। আমা-দের দেশে সে সময় "পাট কাপড়," আর "কাপাস কাপড়," এই দুই জাতি বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। রোমানেরা কাপাস কাপড় লইয়া যাইতেন এবং তাঁহাদের দেশে কার্পাস কথাটি চলিত হইয়া গিয়াছিল। তাৎকালিক ইহুদিরাও বাঙ্গালার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন, তাঁহাদের অতি প্রাচীন গ্রন্থে কার্পাসের উল্লেখ আছে।

ঢাকায় যে সকল সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার মধ্যে "সবনাম" আর "আব রোওাঁ" অতি আশ্চর্য্য। 'সবনাম' সন্ধ্যার সময় ঘাসে বিস্তার করিয়া রাখিলে প্রাতে

আর তাহা বড় চেনা যায় না; যেন মাকড়সার জালে শিশির পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। সেইরূপ "আবরোঙা" জলে ফেলিলে আর বড় দেখা যায় না। জাহাঙ্গির বাদসার সময় এই সকল বস্ত্র এত সূক্ষ্ম প্রস্তুত হইত যে ৩০ হাত দীর্ঘ আর ২ হাত বহরের থান ওজনে ৫ ভরির অধিক হইত না, তাহার মূল্য ৪০০ টাকা ছিল। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র অদ্যাপি আর কোন দেশে হয় নাই।

বাঙ্গালায় ভূমি-কর্ষণ আর বস্ত্র-বয়ন, এই দুই প্রধান কার্য্য ছিল। অধিকাংশ লোকেই এই দুই কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। যেমন কস্মিন্‌কালে অন্যদেশ হইতে বাঙ্গালায় চাল আমদানির প্রয়োজন হইত না, সেই রূপ কস্মিন্‌কালে অন্য দেশ হইতে পরিধানের বস্ত্র আসিত না, এই খানেই প্রস্তুত হইত। সুতরাং সমুদয় বাঙ্গালীর বস্ত্র প্রস্তুত করিতে বহু লোক লিপ্ত থাকিতে হইত। কেবল তাঁতিদের দ্বারা এ কার্য্য সমাধা হইয়া উঠিত না, তাহারা মাত্র তাঁত বুনিত। তাহাদের নিমিত্ত সূতা সকল জাতিতেই কাটিয়া দিত, নতুবা অন্যদেশের "হাত তোলায়" থাকিতে হয়। স্ত্রীলোকেরা একার্য্যের ভার লইয়াছিল। তৎকালের স্ত্রীলোকেরা বঙ্গসমাজের অর্থবৃদ্ধি সম্বন্ধে বিশেষ সহায় ছিল; বাঙ্গালার যত ধান্য তাহা সমুদয় তাহারা ভানিয়া দিত; এবং আবাল বৃদ্ধা জুটিয়া সূতা কাটিয়া দিত। বোধ হয় প্রায় এক কোটি স্ত্রীলোক কেবল এই সূতা কাটা কার্য্যে লিপ্ত থাকিত। সূতা কাটা উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং এই এক কোটি স্ত্রীলোক এখন "বেকার।" তাহাদের উপার্জ্জন এখন কলে কাড়িয়া লইয়াছে।

তাহাদের সেই উপার্জ্জন যদি অন্য কোন প্রকারে পূরাণ হইত, তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাহা হয় নাই। তাহাই বলিতেছিলাম কলের সূতায় আমাদের নিজের ইষ্ট হইয়াছে, কেননা আমরা কাপড় সস্তা পাইতেছি। কিন্তু বঙ্গ সমাজের অনিষ্ট হইয়াছে, কেননা এক কোটি বঙ্গবাসী বৎসর বৎসর যে অর্থ উপার্জ্জন করিত, সে অর্থ এখন ইংলণ্ড দেশের মাঞ্চেষ্টার নগর লইতেছে।

যাঁহারা বিবেচনা করেন পূর্ব্বে যত লোক এ কার্য্যে লিপ্ত ছিল, এখনও তত লোকই লিপ্ত আছে, তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। চাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কি ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ, প্রায় ঘরে ঘরেই চর্কা ঘুরিত। প্রাচীন কালে একটি চলিত কথা ছিল যে "রাজার মা সোনার পাঁইজ কাটে।" এই প্রবাদ দ্বারা এই বুঝা যায় যে সূতা-কাটা বাঙ্গালার সকল অবস্থার লোকের সম্ভব ছিল। আরও দেখা যায় সূতা ও চর্কার জাতকথা এখনও সকল ঘরেই চলিত আছে। অদ্যাপি বলে "আপনার চর্কায় তেল দেও" অর্থ আপনার ভাবনা ভাব। "আর টানা পড়েন করিতে পারি না," অর্থাৎ অনবরত আর যাতা-

রাত করিতে পারি না। কেহ মৃদু-স্বরে অকারণ কাঁদিতেছে শুনিলে আমরা এখনও রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করি "কে সরু সুতা কাটিতেছে।" সূতা কাটার বড়ই প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া এসকল কথা অদ্যাপি ঘরে ঘরে থাকিয়া গিয়াছে। অধিক কি ! সুতা কাটা দেখিয়া তৎকালে বিবাহের পাত্রী মনোনীত হইত। "সবনাম" "আবরোঙা" প্রভৃতি তাহাদের সূতায় প্রস্তুত হইত। তাহারা "আসনা" সুতা কাটিত।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালায় মোট যত ধন প্রতিবৎসর বৃদ্ধি পাইত, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোক উপার্জ্জিত ধনাংশ পুরুষ উপার্জ্জিত ধনাংশ অপেক্ষা নিতান্ত কম ছিল না। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক এরূপ অংশে অর্থবৃদ্ধি আর কখন কোন দেশে হইয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু এখনকার কথা স্বতন্ত্র। অর্দ্ধেক স্ত্রীলোকে অর্থবৃদ্ধি সম্বন্ধে বৃথা হইয়া পড়িয়াছে। অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, এ বিষয়ে বাঙ্গালার বড়ই অবনতি হইয়াছে। ম্যানচেষ্টার আমাদের ঠকাইয়াছে, কলে আমাদের অর্দ্ধেক স্ত্রীলোকের হাত কাটিয়া দিয়াছে, কত লক্ষ তাঁতির প্রাণনাশ করিয়াছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে বাঙ্গালায় তাঁতিরা বহুসংখ্যক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখন বাঙ্গালার যেখানেই জ্বর পীড়া মরক আরম্ভ হউক, সর্ব্বাগ্রে সেখানকার তাঁতি পীড়িত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাঁতি মরে। দুর্ভিক্ষ হইলে, সর্ব্বাগ্রে তাঁতিকে উপবাস করিতে হয়। এই জন্য তাহাদের সংখ্যা অন্য জাতি অপেক্ষা কমিয়াছে। এ সকল ম্যানচেষ্টারের কীর্ত্তি। ম্যানচেষ্টারের উপর রাগ করিয়া বলিতেছি না। আপনার ধনবৃদ্ধির নিমিত্ত ম্যানচেষ্টার কল পাতিয়াছিল, অদৃষ্টক্রমে আমরা সেই কলে পড়িয়াছি, ম্যানচেষ্টারের কোন দোষ নাই।

বস্ত্র বয়নে যে দেশ সকল দেশের মস্তকোপরি ছিল, সেই দেশ এখন বিলাতের পদতলে। বস্ত্রের নিমিত্ত যাঁহাদের দ্বারে গ্রীক রোমানেরা আসিয়া দাঁড়াইত, তাহারা এখন ম্যানচেষ্টারের দ্বারে। অপরস্থা কিং ভবিষ্যতি।

উপায় আর বড় দেখা যায় না। যদি কখন ম্যানচেষ্টারের প্রেরিত বস্ত্রাদির উপর মাশুল বৃদ্ধি করা হয়, এ পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয় যে কলের কাপড় মহার্ঘ হইয়া উঠে, তাহা হইলে আবার বঙ্গলক্ষ্মী ম্যানচেষ্টারের মন্দির হইতে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন। কিন্তু সে ভরশা বৃথা। মাশুল বাড়িবে না, ম্যানচেষ্টারের কারিগরেরা বড়ই ধনবান। তাহাদের একাধিপত্য এখন অতুল।

আর এক উপায় আছে। বার্ডউড সাহেব সে উপায় বলিয়া দিয়াছেন। তিনি আপনার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে—

যে সকল বস্ত্র অলঙ্কার এদেশজাত নহে, তাহা যেন এদেশ

বাসীরা একবারে ব্যবহার না করেন।

গ্রন্থখানি ভারতের শিল্প সম্বন্ধে; বার্ডউড সাহেব তাহাতে আমাদের শিল্পের কতই প্রশংসা করিয়াছেন; আবার কতই আক্ষেপ করিয়াছেন যে এতকালের এরূপ চমৎকার শিল্প লোপ পাইতে বসিয়াছে।†

কাশ্মীরে আর পূর্ব্বমত শাল প্রস্তুত হয় না, বাঙ্গালায় আর সেরূপ বস্ত্র হয় না; ভারতের সকল দেশেই শিল্পের এইরূপ অবনতি হইয়াছে। এখন ইংরাজগণ আমাদের শিল্পী দাঁড়াইয়াছেন। এ বন্দবস্ত মন্দ নহে; তবে কিনা কৃষি আর শিল্পী এক স্থানে থাকিলেই ভাল হয়, সেই বন্দবস্ত পূর্ব্বে ছিল এখনও তাহাই আবশ্যক; রেলের দ্বারা তারের দ্বারা যখন পৃথিবীর সকল দেশ এক হইয়া যাইবে তখনকার কথা সতন্ত্র; সে বন্দবস্ত এত পূর্ব্বাহ্নে উপস্থিত করা ভাল নহে। আজ সাহেবেরা ভারত ছাড়া হইলে, কাল আমাদের দশা কি হইবে? সূতার নিমিত্ত কাপড়ের নিমিত্ত আমরা কোথায় যাইব? অন্নাভাবে তাঁতিরা প্রায় নির্ব্বংশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে সকলে সূতা কাটা ভুলিয়া গিয়াছে। আমাদের উপায় কি হইবে তাহা একবার ভাবনা করা ভাল।

দেশী কাপড় মহার্ঘ, এই জন্য সামান্য লোকেরা তাহা আর ব্যবহার না করিয়া ম্যানচেষ্টারের উদর পূরণ করে; কিন্তু যাঁহারা লালবাগানের ধুতি ব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন দেশী কাপড় সস্তা, দেশী কাপড় টেকসহি, অনেক দিন যায়। আমরা জানি পাবনা জেলার দোগাছিয়া গ্রাম হইতে একজন যোল টাকা মূল্যে একখানি ধুতি ক্রয় করিয়া আট বৎসর পর্য্যন্ত তাহা নিত্য ব্যবহার করিয়াছিলেন। এ অবস্থায় বিলাতি ধুতি অপেক্ষা দেশী ধুতি সস্তা। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখিলে বার্ডউড় সাহেবের পরামর্শ পালন করা কঠিন হইবে না। সে পরামর্শ নূতন নহে, আমাদের যুবারা এ কথার আন্দোলন অনেক দিন হইতে করিতেছেন। যদি তাঁহারা আর একটু মনযোগী হইয়া সাধারণ লোকের ভ্রম দূর করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে কতক কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তাহা হইলে ইংরেজি পারিলিয়ামেণ্টের পুরাতন একটি আইনের উত্তর দেওয়া হয়। ১৭০০ সালে যখন ইংরেজরা অর্থশাস্ত্র (political economy) একেবারে কিছুই বুঝিতেন না তখন তাঁহারা এক আইন করিয়াছিলেন যে এদেশী কোন কাপড় ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে পাইবে না, প্রবেশ করিলে তাহা কেহ ব্যবহার করিতে পারিবে না যদি

*"Indian native gentlemen and ladies should make it a point of culture never to wear any clothing or ornaments but of native manufacture and strictly native design.—" *The Industrial Arts of India*, by George C.M. Birdwood C. S. I., M. D. page 244.

কোন মহাজন বিদেশী কাপড় ইংলণ্ডে লইয়া যান তাহা হইলে সে মাল গুদামযাত করা যাইবে অথবা ফেরত পাঠান যাইবে *। তৎকালে ইংরেজরা ভাবিতেন যে বিদেশ-জাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ডরাজ্যে আসিলে স্বদেশ-জাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের ক্ষতি হইবে সুতরাং তৎসঙ্গে প্রজাদের অর্থাগম পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। এক্ষণে এ আপত্য তাঁহাদের আর নাই তাঁহারা এখন সকল দেশের দ্রব্যাদি অবাধে আসিতে দেন কেবল মাস্থল (custom duty) আপনাদের হাতে রাখিয়াছেন; কখন কখন তাহা চড়াইয়া বাঁধেন কখন বা নাবাইয়া দেন। তাহাতেই অনেকটা মতলব হাসিল হয়। কিন্তু আমাদের সেরূপে মতলব হাসিল হইবার নহে; ম্যাঞ্চেষ্টারের উপর মাস্থল বাড়িবে না, সুতরাং বার্ডউড সাহেবের পরামর্শ শুনা ভাল, শুনা আবশ্যক। আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের দ্রব্য কিনিব না, ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা যদি করি এবং তাহা রক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের আর গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বিষয়ের নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইবে না, কাঁদিতে হইবে না, মর্ম্মব্যথা পাইতে হইবে না; আপনার ইচ্ছার অধীন থাকিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞার অধীন থাকিয়া, স্বাধীনতার সুখ লাভ করিতে পারি। স্বাধীনতা আর কিছুই নহে; কে রাজা তাহা লইয়া স্বাধীনতা নহে। আমি যদি ম্যাঞ্চেষ্টারের অধীন না হই তবেই আমি একদিকে স্বাধীন।

---

* "That from and after the 29th day of September 1701, all wrought silks, Bengals, and stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of China, Persia, or the East Indies and all calicoes painted, dyed printed or stained there, which are or shall be imported into this kingdom, shall not be worn or otherwise used in Great Britain; and all goods imported after that day, shall be warehoused or exported again."

বঙ্গদর্শন।

৮৮ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

(বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।)

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল। বাঙ্গালার ছয় আনা রকম মনুষ্যকে, কত কোটী তা কে জানে, যমপুরে প্রেরণ করাইয়া সেই দুর্ব্বৎসর নিজে কালগ্রাসে পতিত হইল। ৭৭ সালে ঈশ্বর সুপ্রসন্ন হইলেন। সুবৃষ্টি হইল, পৃথিবী শস্যশালিনী হইল, যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা পেট ভরিয়া খাইল। অনেকে অনাহারে বা অল্পাহারে রুগ্ন হইয়া ছিল, পূর্ণ আহার একেবারে সহ্য করিতে পারিল না। অনেকে তাহাতেই মরিল। পৃথিবী শস্যশালিনী কিন্তু জনশূন্যা। গ্রামে গ্রামে খালি বাড়ী পড়িয়া, গবাদির বিশ্রামভূমি এবং প্রেতভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রামে গ্রামে শত শত উর্ব্বরা ভূমিখণ্ড সকল অকর্ষিত, অনুৎপাদক হইয়া পড়িয়া রহিল, অথবা জঙ্গলে পূরিয়া গেল। দেশ জঙ্গলময় হইল। যেখানে হাস্যময় শ্যামল শস্যরাশি বিরাজ করিত, যেখানে অসংখ্য গো মহিষাদি বিচরণ করিত, যে সকল উদ্যান গ্রাম্য যুবক যুবতীর প্রমোদ ভূমি ছিল, সে সকল ক্রমে ঘোরতর জঙ্গল হইতে লাগিল। এক বৎসর, দুই বৎসর, তিন বৎসর গেল, জঙ্গল বাড়িতে লাগিল। যেস্থান মনুষ্যের সুখের স্থান ছিল, সেখানে নরমাংসলোলুপ ব্যাঘ্র

আসিয়া হরিণাদির প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। যেখানে সুন্দরীর দল অলক্ত-রঞ্জিত চরণে চরণভূষণ ধ্বনিত করিতে করিতে, বয়স্যার সঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে করিতে, উচ্চ হাঁসি হাসিতে হাসিতে যাইত, সেই খানে ভল্লুকে বিবর প্রস্তুত করিয়া শাবকাদি লালন পালন করিতে লাগিল। যে খানে শিশু সকল নবীন বয়সে সন্ধ্যা কালের মল্লিকাকুসুম তুল্য উৎফুল্ল হইয়া হৃদয়তৃপ্তিকর হাস্য হাসিত, সেই খানে আজি যূথে যূথে বন্যহস্তী সকল মদমত্ত হইয়া বৃক্ষের কাণ্ড সকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল। যে খানে দুর্গোৎসব হইত সে খানে শৃগালের বিবর, দোলমঞ্চে পেচকের আশ্রয়, নাটমন্দিরে বিষধর সর্প সকল দিবসে ভেকের অন্বেষণ করে। বাঙ্গালায় শস্য জন্মে, খাইবার লোক নাই; বিক্রেয় জন্মে কিনিবার লোক নাই; চাসায় চাস করে টাকা পায় না, জমীদারের খাজনা দিতে পারে না; জমীদারেরা রাজার খাজনা দিতে পারে না, রাজা জমীদারী কাড়িয়া লওয়ায় জমীদার সম্প্রদায় হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া দরিদ্র হইতে লাগিল। বসুমতী সুপ্রসবিনী হইলেন তবু আর ধন জন্মে না। কাহারও ঘরে ধন নাই। যে যাহার পায় কাড়িয়া খায়। চোর ডাকাতেরা মাথা তুলিল, সাধু ভীত হইয়া ঘরের মধ্যে লুকাইল।

এ দিকে সন্তান সম্প্রদায় নিত্য সচন্দন তুলসী দলে বিষ্ণুপাদ-পদ্ম পূজা করে, যার ঘরে বন্দুক পিস্তল আছে কাড়িয়া আনে। ভবানন্দ বলিয়া দিয়াছিলেন "ভাই! যদি এক দিকে এক ঘর মণি মাণিক্য হীরক প্রবালাদি দেখ আর একদিকে একটা ভাঙ্গা বন্দুক দেখ, মণি মাণিক্য হীরক প্রবালাদি ছাড়িয়া ভাঙ্গা বন্দুকটী লইয়া আসিবে।"

তার পর, তাহারা গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইতে লাগিল, চর গ্রামে গিয়া যেখানে হিন্দু দেখে, বলে ভাই বিষ্ণু পূজা করবি? এই বলিয়া ২০।২৫ জন জড় করিয়া মুসলমানের গ্রামে আসিয়া পড়িয়া মুসলমানদের ঘরে আগুন দেয়। মুসলমানেরা প্রাণ রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়, সন্তানেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া নূতন বিষ্ণুভক্তদিগকে বিতরণ করে। লুঠের ভাগ পাইয়া গ্রাম্য লোকে প্রীত হইলে বিষ্ণুমন্দিরে আনিয়া বিগ্রহের পায় স্পর্শ করাইয়া তাহাদিগকে সন্তান করে। লোকে দেখিল সন্তানত্বে বিলক্ষণ লাভ আছে। বিশেষ মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তানসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দিনে দিনে শত শত, মাসে মাসে সহস্র সহস্র সন্তান আসিয়া ভবানন্দ জীবানন্দের পাদ পদ্মে প্রণাম করিয়া দলবদ্ধ হইয়া দিগদিগন্তরে মুসলমানকে শাসন করিতে বাহির হইতে লাগিল। যেখানে রাজপুরুষ পায়, ধরিয়া মার পিট করে, কখন কখন প্রাণবধ

করে, যেখানে সরকারী টাকা পায় লুটিয়া লইয়া ঘরে আনে, যেখানে মুসলমানের গ্রাম পাই দগ্ধ করিয়া ভস্মাবশেষ করে।

তখন নগরের মহারাজাধিরাজের চৈতন্য হইল। সন্তানদিগের শাসনার্থে তিনি ভূরি ভূরি সৈন্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন কিন্তু এখন সন্তানেরা দলবদ্ধ সস্ত্রযুক্ত এবং মহাদম্ভশালী। তাহাদিগের দর্পে সম্মুখে মুসলমান সৈন্য অগ্রসর হইতে পারে না। যদি অগ্রসর হয়, অমিত বলে সন্তানেরা তাহাদিগের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া হরিধ্বনি করিতে থাকে। যদি কখনও কোন সন্তানের দলকে যবন সৈনিকেরা পরাস্ত করে, তখনই আর এক দল সন্তান কোথা হইতে আসিয়া বিজেতাদিগের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া হরি হরি বলিতে বলিতে চলিয়া যায়। রাজা আসদউলজমান বড় বিভ্রাটে পড়িলেন। অনেকগুলি গোলা, কামান, হাতী, ঘোড়া, পাঠাইলেন, কিছুতেই সন্তানদিগের "জয় জগদীশ হরে" শব্দের নিবারণ নাই। আসদউলজমান দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত হই।

তখন তিনি কাতরে ইংরেজকে চিঠী লিখিলেন। লিখিলেন যে, কোন মতে আমি আর রাজস্ব সংগ্রহ করিতে পারি না বা পাঠাইতে পারি না; আপনারা রক্ষা করেন তবেই খাজনা আদায় করিব, নচেৎ আপনারা আসিয়া আদায় করুন। ইংরেজেরা পূর্ব্ব হইতে নিজে কতক২ খাজনা আদায় করিতে ছিলেন কিন্তু এখন তাঁহাদিগেরও যত্ন বিফল হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রথিতনামা ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার সিকল গড়িয়া তিনি মনে২ বিচার করিলেন, যে এই সিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহ বলিয়াছিলেন তথাস্তু। কিন্তু সে দিন এখনও দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারণ হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।

ওয়ারণ হেষ্টিংস প্রথমে ফৌজদারী সৈন্যের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু ফৌজদারী সিপাহীর এমনি অবস্থা হইয়াছিল যে তাহারা কোন বৃদ্ধ স্ত্রীলোকের মুখেও হরিনাম শুনিলে পলায়ন করিত। অতএব নিরুপায় দেখিয়া ওয়ারণ হেষ্টিংস কাপ্তেন টমাস নামক এক জন সুদক্ষ সৈনিককে অধিনায়ক করিয়া এক দল কোম্পানির সৈন্য বিদ্রোহ নিবারণ জন্য বীরভূম দেশে প্রেরণ করিলেন।

কাপ্তেন টমাস বীরভূমে পৌঁছিয়া বিদ্রোহ নিবারণের অতি উত্তম বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার সৈন্য ও জমীদারদিগের সৈন্য চাহিয়া লইয়া কোম্পানীর সুশিক্ষিত সদস্ত্রযুক্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ

দেশী বিদেশী সৈন্যের সঙ্গে মিলাইলেন। পরে সেই মিলিত সৈন্য দলে২ বিভক্ত করিয়া সে সকলের আধিপত্যে উপযুক্ত যোদ্ধৃবর্গকে নিযুক্ত করিলেন। পরে সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে দেশ ভাগ করিয়া দিলেন; বলিয়া দিলেন তুমি অমুক প্রদেশ জেলিয়ার মত জাল দিয়া ছাঁকিতে ছাঁকিতে যাইবে। যেখানে বিদ্রোহী দেখিবে পিপীলিকার মত তাহার প্রাণ সংহার করিবে। কোম্পানির সৈনিকেরা কেহ গাঁজা, কেহ রম মারিয়া বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া সন্তান বধে ধাবিত হইল। কিন্তু সন্তানেরা এখন অসংখ্য অজেয়, কাপ্তেন টমাসের সৈন্যদল চাসার কাস্তের নিকট শস্যের মত কর্ত্তিত হইতে লাগিল। হরি হরি ধ্বনিতে কাপ্তেন টমাসের কর্ণ বধির হইয়া গেল। এই রূপে ১১৮০ সাল বীরভূমে সন্তান নাম কীর্ত্তিত করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তখন কোম্পানির অনেক রেশমের কুঠী ছিল। শিবগ্রামে ঐরূপ এক কুঠী ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই কুঠীর ফ্যাকৃটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ ছিলেন। তখনকার কুঠী সকলের রক্ষার জন্য সুব্যবস্থা ছিল। ডনিওয়ার্থ সাহেব সেই জন্য কোন প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে পরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী কন্যাদিগকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ংও সন্তানদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। সেই প্রদেশে এই সময়ে কাপ্তেন টমাস সাহেব দুই চারি ব্যাটেলিয়ন ফৌজ লইয়া তশরিফ আনিয়াছিলেন। এখন জন কতক চোয়াড়, হাড়ি, ডোম, বাগদী, বুনো সন্তানদিগের উৎসাহ দেখিয়া পরদ্রব্যাপহরণে উৎসাহী হইয়াছিল। তাহারা কাপ্তেন টমাসের রসদ আক্রমণ করিল। কাপ্তেন টমাসের সৈন্তের জন্য গাড়ী গাড়ী বোঝাই হইয়া উত্তম ঘি, ময়দা, মুরগী, চাল যাইতেছিল—দেখিয়া ডোম বাগদীর দল লোভ সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহারা গিয়া গাড়ী আক্রমণ করিল, কিন্তু কাপ্তেন টমাসের সিপাহীদের হস্তস্থিত বন্দুকের দুই চারিটা গুতা খাইয়া ফিরিয়া আসিল। কাপ্তেন টমাস তৎক্ষণেই কলিকাতায় রিপোর্ট পাঠাইলেন যে আজ ১৫৭ জন সিপাহী লইয়া ১৪,৭০০ বিদ্রোহী পরাজয় করা গিয়াছে। বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ২১৫৩ জন মরিয়াছে আর ১২৩৩ জন আহত হইয়াছে। ৭ জন বন্দী হইয়াছে। কেবল শেষ কথাটাই সত্য।

কাপ্তেন টমাস, ব্লেনহিম বা রসবাকের মত দ্বিতীয়যুদ্ধ জয় করিয়াছি মনে করিয়া গোঁপ দাড়ী চুমরাইয়া নির্ভয়ে ইতস্তত বেড়াইতে লাগিলেন। এবং ডনিওয়ার্থ সাহেবকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন যে, আর কি এক্ষণে

বিদ্রোহ নিবারণ হইয়াছে, তুমি স্ত্রী পুত্রদিগকে কলিকাতা হইতে লইয়া আইস। ডনিওয়ার্থ সাহেব বলিলেন, "তা হইবে, আপনি দশদিন এখানে থাকুন, দেশ আর একটু স্থির হউক, স্ত্রী পুত্র লইয়া আসিব।" ডনিওয়ার্থ সাহেবের ঘরে পালা মটন মুরগী ছিল। পনীরও তাঁহার ঘরে অতি উত্তম ছিল। নানাবিধ বন্যপক্ষী তাঁহার টেবিলের শোভা সম্পাদন করিত। শ্মশ্রুমান বাবুর্চীটি দ্বিতীয় দ্রৌপদী। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে কাপ্তেন টমাস সেইখানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিগে ভবানন্দ মনে মনে গর গর করিতেছে, ভাবিতেছে কবে এই কাপ্তেন টমাস সাহেব বাহাদুরের মাথাটী কাটিয়া, দ্বিতীয় সম্বরারি বলিয়া উপাধি ধারণ করিবে। ইংরেজ যে ভারতবর্ষের উদ্ধারসাধন জন্য আসিয়াছিল, সন্তানেরা তাহা তখন বুঝে নাই। কি প্রকারে বুঝিবে? কাপ্তেন টমাসের সমসাময়িক ইংরেজরাও তাহা জানিতেন না। তখন কেবল বিধাতার মনে মনেই একথা ছিল। ভবানন্দ ভাবিতেছিল এ অসুরের বংশ একদিনে নিপাত করিব, সকলে জমা হউক, একটু অসতর্ক হউক, আমরা এখন একটু তফাত থাকি। সুতরাং তাহারা একটু তফাত রহিল। কাপ্তেন টমাস সাহেব নিষ্কণ্টক হইয়া সাঁওতাল কুমারীদিগের গুণগ্রহণে মনোযোগ দিলেন। তখনকার ভারতীয় ইংরেজেরা এখনকার ইংরেজদিগের ন্যায় পবিত্র চরিত্র ছিলেন না।

সাহেব বাহাদুর শীকার বড় ভাল বাসেন, মধ্যে২ শিবগ্রামের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে মৃগয়ায় বাহির হইতেন। একদিন ডনিওয়ার্থ সাহেবের সঙ্গে অশ্বারোহণে কতকগুলি শিকারী লইয়া কাপ্তেন টমাস শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। বলিতে কি, টমাস সাহেব অসমসাহসিক, বলবীর্য্যে ইংরেজ জাতির মধ্যেও অতুল্য। সেই নিবিড় অরণ্য ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুকাদিতে অতিশয় ভয়ানক। বহুদূর আসিয়া শিকারীরা আর যাইতে অস্বীকৃত হইল, বলিল ভিতরে আর পথ নাই, আমরা আর যাইতে পারিব না। ডনিওয়ার্থ সাহেবও সেই অরণ্য মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের গর্জ্জন অনেক দিন শুনিয়াছিলেন যে, তিনিও আর যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। তাঁহারা সকলে ফিরিতে চাহিলেন। কাপ্তেন টমাস বলিলেন "তোমরা ফেরো ফেরো, আমি ফিরিব না।" এই বলিয়া কাপ্তেন সাহেব নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বস্তুতঃ অরণ্য মধ্যে পথ ছিল না। অশ্ব প্রবেশ করিতে পারিল না কিন্তু সাহেব ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া কাঁধে বন্দুক লইয়া একা অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ব্যাঘ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ব্যাঘ্র দেখিলেন না। কি দেখিলেন? এক বৃহৎ বৃক্ষতলে প্রস্ফুটিত ফুল্লকুসুমযুক্ত

লতা গুল্মাদিতে বেষ্টিত হইয়া বসিয়া ও কে? বাঘ কি?—বাঘ তো নয়, এক নবীন সন্ন্যাসী, রূপে বন আলো করিয়াছে। প্রস্ফুটিত ফুল যেন সেই স্বর্গীয় বপুর সংসর্গে অধিকতর সুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। কাপ্তেন টমাস সাহেব বিস্মিত হইলেন, বিস্ময়ের পরেই তাঁহার ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন কতক দেখিয়াও ছিলেন, যে, বিদ্রোহীরা অনেক সময়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে বেড়ায়। কাপ্তেন সাহেব দেশীভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, বলিলেন, "তুমি কে"?

সন্ন্যাসী বলিল "আমি সন্ন্যাসী।"

কাপ্তেন বলিলেন "তুমি বিদ্রোহী।"

সন্ন্যাসী, "না হয় তাই হলেম।"

কাপ্তেন। "তবে তোমায় গুলি করিয়া মারিব"

সন্ন্যাসী। "মার"

কাপ্তেন একটু মনে সন্দেহ করিতেছিলেন যে, গুলি মারিবেন কি না, এমন সময় বিদ্যুৎবেগে সেই নবীন সন্ন্যাসী তাঁহার উপর পড়িয়া তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। সন্ন্যাসী বক্ষাবরণ চর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া দিল। একটানে দাড়ি, গোপ, জটা, খুলিয়া ফেলিল; কাপ্তেন টমাস সাহেব দেখিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি। সুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিল "সাহেব, আমি স্ত্রীলোক, কাহাকেও আঘাত করি না। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, হিন্দু মোছলমানে মারামারী হইতেছে তোমারা মাঝখানে কেন? আপনার ঘরে ফিরিয়া যাও।

সাহেব। তুমি কে।

শান্তি। দেখিতেছ সন্ন্যাসিনী। যাহাদের সঙ্গে লড়াই করিতে আসিয়াছ তাহাদেরই কাহারও স্ত্রী।

সাহেব। তুমি আমার ঘরে থাকিবে?

শান্তি। কি? তোমার উপপত্নী স্বরূপ?

সাহেব। স্ত্রীর মতই থাকিতে পার, তবে বিবাহ হইবে না।

শান্তি। আমারও একটা জিজ্ঞাসা আছে; আমাদের ঘরে একটা রূপী বাঁদর ছিল, সেটা সম্প্রতি মরে গেছে; কোটর খালি পড়ে আছে। কোমরে ছেকল দেবো, তুমি সেই কোটরে থাকবে? আমাদের বাগানে বেশ মর্ত্তমান কলা হয়।

সাহেব। তুমি ভাল মেয়ে মানুষ, তোমার সাহসে আমি খুসী হইয়াছে। তুমি আমার ঘরে চল। তোমার স্বামী যুদ্ধে মরিয়া যাইবে। তখন তোমার কি হইবে?

শান্তি। তবে তোমায় আমায় একটা কথা থাক। যুদ্ধ ত দুদিন চারিদিনে হবেই। যদি তুমি জেত তবে আমি তোমার উপপত্নী হইয়া থাকিব স্বীকার করিতেছি, যদি বাঁচিয়া থাকি। আর আমরা যদি জিতি, তবে তুমি আসিয়া, আমাদের সেই কোটরে বাঁদর সেজে কলা খাবে ত?

সাহেব। কলা খাইতে উত্তম জিনিষ। এখন আছে?"

শান্তি। নে তোর বন্দুক নে। এমন বুনো জেন্তের সঙ্গেও কেউ কথা কয়!

শান্তি বন্দুক ফেলিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি সাহেবকে ত্যাগ করিয়া হরিণীর ন্যায় ক্ষিপ্রচরণে বন মধ্যে কোথায় প্রবিষ্ট হইল। সাহেব কিছু পরে শুনিতে পাইলেন স্ত্রীকণ্ঠে গীত হইতেছে;—

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

আবার কোথায় শারঙ্গের মধুর নিক্কনে বাজিল তাই,

এ যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তাহার সঙ্গে পুরুষ কণ্ঠ মিলিয়া গীত হইল;—

এ যৌবন জলতরঙ্গে রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

তিন স্বরে এক হইয়া গানে বনের লতা সকল কাঁপাইয়া তুলিল। শান্তি গাইতে গাইতে চলিল।

" এই যৌবন জল তরঙ্গ রোধিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

জলেতে তুফান হয়েছে,
আমার নূতন তরী, ভাসল সুখে,
মাঝিতে হাল ধরেছে,
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ,
জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!"

সারঙ্গেও ঐ বাজিতেছিল,

জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে রাখিবেকে?
হরে মুরারে! হরে মুরারে!

যেখানে অতি নিবিড় বন, ভিতরে কি আছে বাহির হইতে একেবারে অদৃশ্য, শান্তি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেইখানে সেই শাখাপল্লব রাশির মধ্যে লুকাইত একটী ক্ষুদ্র কুটীর আছে। ডালের বাঁধন, পাতার ছাওয়া, কাঠের মেজে, তার উপরে মাটী ঢালা। তাহারই ভিতরে লতাদ্বার মোচন করিয়া শান্তি প্রবেশ করিল। সেখানে জীবানন্দ বসিয়া সারঙ্গ বাজাইতেছিলেন।

জীবানন্দ শান্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এত দিনের পর জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে কি?"

শান্তিও হাসিয়া উত্তর করিল। " নালা ডোবায় কি জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটে?

জীবানন্দ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, দেখ

শান্তি! একদিন আমার ব্রত ভঙ্গ হওয়ায় আমার প্রাণত উৎসর্গই হইয়াছে। যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে। এত দিন এ প্রায়শ্চিত্ত করিতাম, কেবল তোমার অনুরোধেই করি নাই। কিন্তু একটা ঘোরতর যুদ্ধের আর বিলম্ব নাই। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে, আমার সে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এ প্রাণ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। আমার মরিবার দিন পর্য্যন্তই কি—"

শান্তি বলিল "আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিনী, ধর্ম্মে সহায়। তুমি অতিশয় গুরুতর ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ। সেই ধর্ম্মের সহায়তার জন্যই আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। দুই জনে একত্রে সেই ধর্ম্মাচরণ করিব বলিয়া গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া বনে বাস করিতেছি। তোমার ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। ধর্ম্মপত্নী হইয়া, তোমার ধর্ম্মের বিঘ্ন করিব কেন? বিবাহ ইহকালের জন্য, এবং বিবাহ পর কালের জন্য। ইহকালের জন্য যে বিবাহ মনেকর তাহা আমাদের হয় নাই। আমাদের বিবাহ কেবল পরকালের জন্য। পরকালে দ্বিগুণ ফল ফলিবে। হায় প্রভু! তুমিই আমার গুরু, আমি কি তোমায় ধর্ম্ম শিখাইব? তুমি বীর, আমি কি তোমায় বীর ব্রত শিখাইব?

জীবানন্দ আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, "শিখাইলে ত। আমিও শিখিলাম। তুমিই স্ত্রীকুলে ধন্যা।"

শান্তি প্রফুল্লচিত্তে বলিতে লাগিল, আরও দেখ গোঁসাই, ইহকালেই কি আমাদের বিবাহ নিষ্ফল? তুমি আমায় ভাল বাস, আমি তোমায় ভাল বাসি, ইহা অপেক্ষা ইহকালে আর কি গুরুতর ফল আছে? বল "বন্দে মাতরং।" তখন দুইজনে গলা মিলাইয়া "বন্দে মাতরং" গাইল। গাইতে গাইতে দুই জনেই কাঁদিয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ গোস্বামী একদা রাজনগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রশস্ত রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া একটা অন্ধকার গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। গলির দুই পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকা শ্রেণী; সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নে এক একবার গলির ভিতর উঁকি মারেন মাত্র। তৎপরে অন্ধকারেরি অধিকার। গলির পাশের একটী দোতালা বাড়ীতে, ভবানন্দ ঠাকুর প্রবেশ করিলেন। নিম্নতলে একটী ঘরে, যেখানে অর্দ্ধবয়স্কা একটী স্ত্রীলোক পাক করিতে ছিল, সেই খানে গিয়া ভবানন্দ মহাপ্রভু দর্শন দিলেন। স্ত্রীলোকটী অর্দ্ধবয়স্কা, মোটা সোটা কালো কোলো, ঠেঁটি পরা, কপালে উল্কি, সীমন্ত প্রদেশে কেশদাম চূড়াকারে শোভা করিতেছে। ঠন্ ঠন্ করিয়া হাঁড়ির কানায় ভাতের কাটি বাজিতেছে,

কর কর করিয়া অলক দামের কেশ গুচ্ছ উড়িতেছে, গল গল করিয়া মাগী আপনা আপনি বকিতেছে, আর তার মুখ ভঙ্গীতে তাহার মাথার চুড়ার নানা-প্রকার টলুনি টালুনির বিকাশ হইতেছে। এমন সময় ভবানন্দ মহাপ্রভু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন;—

"ঠাকুরুণ দিদি প্রাতঃপ্রণাম!"

ঠাকুরুণ দিদি ভবানন্দকে দেখিয়া, শশ-ব্যস্তে বস্ত্রাদি সামলাইতে লাগিলেন। মস্তকের মোহন চূড়া খুলিয়া ফেলিবেন ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুবিধা হইল না, কেননা সকড়ি হাত! নিষেকমসৃণ সেই চিকুর জাল—হায় তাহাতে পূজার সময় একটী বকফুল পড়িয়াছিল!—বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিতে যত্ন করিলেন; বস্ত্রাঞ্চল ঢাকিতে সক্ষম হইল না, কেননা ঠাকুরুণটী একখানি পাঁচ হাত কাপড় পরিয়াছিলেন। সেই পাঁচ হাত কাপড় প্রথমে গুরু-ভার প্রশস্ত উদরপ্রদেশ বেষ্টন করিয়া আসিতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া পড়িয়া-ছিল, তার পরে দুঃসহ ভারগ্রস্ত হৃদয় মণ্ডলেরও কিছু আবরু পর্দ্দা রক্ষা করিতে হইয়াছে। শেষে মাথায় পৌছিয়া বস্ত্রাঞ্চল জবাব দিল। কাণের উপর উঠিয়া বলিল আর যাইতে পারি না। অগত্যা পরম ব্রীড়াবতী গৌরী ঠাকুরাণী কথিত বস্ত্রাঞ্চলকে কাণের কাছে ধরিয়া রাখিলেন। এবং ভবিষ্যতে আট হাত কাপড় কিনিবার জন্য মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বলিলেন "কে গোসাই ঠাকুর? এস এস! আমায় আবার প্রাতঃ প্রণাম কেন ভাই?"

ভব। তুমি ঠান্‌দিদি যে!

গৌরী। আদর করে বল বলিয়া। তোমরা হলে গোসাই মানুষ, দেবতা! তা করেছ করেছ, বেঁচে থাক। তা করলেও করতে পার, হাজার হোক আমি বয়সে বড়।

এখন ভবানন্দের অপেক্ষায় গৌরী দেবী মহাশয়া বছর পঁচিশের বড়, কিন্তু সুচতুর ভবানন্দ উত্তর করিলেন, "সেকি ঠানদিদি! রসের মানুষ দেখে ঠানদিদি বলি। নইলে যখন হিসাব হয়েছিল, তুমি আমার চেয়ে ছয় বছরের ছোট হইয়াছিলে মনে নাই? আমাদের বৈষ্ণবের সব রকম আছে জান, আমার মনে মনে ইচ্ছা মঠধারী ব্রহ্মচারীকে বলিয়া তোমায় নিকে করে ফেলি। সেই কথাটাই বল্‌তে এসেছি।"

গৌরি। সেকি কথা ছি! অমন কথা কি বল্‌তে আছে! আমরা হলাম বিধবা।

ভব। তবে নিকে হবে না কি?

গৌরী। তা ভাই, যা জান তা কর। তোমরা হলে পণ্ডিত, আমরা মেয়ে মানুষ কি বুঝি, তা, কবে হবে?

ভবানন্দ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলেন "সেই ব্রহ্মচারীটার সঙ্গে এক বার দেখা হইলেই হয়। আর—সে কেমন আছে?"

গৌরী বিষণ্ণ হইল। মনে মনে সন্দেহ

করিল নিকার কথাটা তবে বুঝি তামাসা। বলিল, "আছে আর কেমন, যেমন থাকে।"

ভব। তুমি গিয়া একবার দেখিয়া আইস কেমন আছে, বলিয়া আইস আমি আসিয়াছি একবার সাক্ষাৎ করিব।

গৌরী দেবী তখন ভাতের কাটি ফেলিয়া, হাত ধুইয়া বড় বড় ধাপের সিড়ি ভাঙ্গিয়া, দোতালার উপর উঠিতে লাগিল। একটী ঘরে মলিন শয্যার উপর বসিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী। কিন্তু সৌন্দর্য্যের উপর, একটা ঘোরতর ছায়া আছে। মধ্যাহ্নে কুলপরিপ্লাবিনী প্রসন্ন সলিলা বিপুলজলকল্লোলিনী স্রোতস্বতীর বক্ষের উপর অতি নিবিড় মেঘের ছায়ার ন্যায় কিসের ছায়া আছে। নদীহৃদয়ে তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, তীরে কুসুমিত তরুকুল বায়ুভরে হেলিতেছে, ঘন পুষ্প ভরে নমিতেছে, অট্টালিকা শ্রেণীও শোভিতেছে। তরণীশ্রেণী তাড়নে জল আন্দোলিত হইতেছে। কাল মধ্যাহ্ন, তবু সেই কাদম্বিনী নিবিড় কালো ছায়ায় সকল শোভাই কালিমাময়। এও তাই। সেই পূর্ব্বের মত চারু চিক্কণ চঞ্চল নিবিড় অলকাদাম, পূর্ব্বের মত সেই প্রশস্ত পরিপূর্ণ ললাটভূমে পূর্ব্ব মত অতুল তুলিকালিখিত ভ্রূধনু, পূর্ব্বের মত বিস্ফারিত সজল উজ্জ্বল কৃষ্ণতার বৃহচ্চক্ষু, তত কটাক্ষময় নয়, তত লোলতা নাই, কিছু নম্র। অধরে তেমনি রাগ রঙ্গ, হৃদয় তেমনি শ্বাসানুগামী পূর্ণতায় চল চল, বাহু তেমনি বনলতাদুষ্প্রাপ্য কোমলতা যুক্ত। কিন্তু আজ সে দীপ্তি নাই, সে উজ্জ্বলতা নাই, সে প্রখরতা নাই, সে চঞ্চলতা নাই, সে রস নাই। বলিতে কি, বুঝি সে যৌবন নাই। আছে কেবল সে সৌন্দর্য্য আর সে মাধুর্য্য। নূতন হইয়াছে ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য। ইহাকে পূর্ব্বে দেখিলে মনে হইত, মনুষ্য লোকে অতুলনীয়া সুন্দরী, এখন দেখিলে বোধ হয়, ইনি দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী। ইহার চারি পার্শ্বে দুই তিন খানা তুলাটের পুথি পড়িয়া আছে। দেওয়ালের গায়ে হরিনামের মালা টাঙ্গান আছে, আর মধ্যে মধ্যে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার পট, কালীয় দমন, নবনারী কুঞ্জর, বস্ত্রহরণ, গোবর্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি ব্রজলীলার চিত্র রঞ্জিত আছে। চিত্র গুলীর নীচে লেখা আছে, "চিত্র না বিচিত্র?" সেই গৃহ মধ্যে ভবানন্দ প্রবেশ করিলেন।

ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন কল্যাণী শারিরীক মঙ্গল ত?"

কল্যাণী। এ প্রশ্ন কি আপনি ত্যাগ করিবেন না? আমার শারিরীক মঙ্গলে আপনারই কি ইষ্ট, আর আমারই বা কি ইষ্ট?

ভব। যে বৃক্ষ রোপণ করে, সে তাহাতে নিত্য জল দেয়। গাছ বাড়িলেই তাহার সুখ, তোমার মৃত দেহে আমি জীবন রোপণ করিয়া ছিলাম, বাড়িতেছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব না কেন?

ক। বিষবৃক্ষের কি ফল আছে?

ভব। জীবন কি বিষ?

ক। না হলে অমৃত সিঞ্চনে আমি তাহা ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলাম কেন?

ভব। সে কথা অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিব মনে ছিল, সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। কে তোমার জীবন বিষময় করিয়াছিল?

কল্যাণী স্থির ভাবে উত্তর করিলেন, "আমার জীবন কেহ বিষময় করে নাই। জীবনই বিষময়। আমার জীবন বিষময়, আপনার জীবন বিষময়, সকলেরই জীবন বিষময়।"

ভব। সত্য কল্যাণী আমার জীবন বিষময়। যে দিন অবধি—তোমার ব্যাকরণ শেষ হইয়াছে?

ক। সকলি শেষ হইয়াছে। কেবল স্ত্রীত্ব শেষ হয় নাই।

ভব। অভিধান?

ক। স্বর্গ বর্গ বুঝিতে পারিলাম না। আপনি বুঝাইয়া দিতে পারেন?

ভব। যাহা আপনি বুঝি না, তাহা বুঝাইতে পারি না। সাহিত্য পূর্ব্ব মত পড়া হইতেছে?

ক। পূর্ব্বাপর বুঝি না। কুমারসম্ভব পরিত্যাগ করিয়া হিতোপদেশ পড়িতেছি।

ভব। কেন কল্যাণী?

কল্যাণী। কুমারে দেব চরিত্র, হিতোপদেশ পশুচরিত্র।

ভব। দেবচরিত্র ছাড়িয়া, পশুচরিত্রে এ অনুরাগ কেন?

ক। চিত্ত বশ নহে বলিয়া। আমার স্বামীর সম্বাদ কি প্রভু?

ভব। বার বার সে সম্বাদ কেন জিজ্ঞাসা কর? তিনি তো তোমার পক্ষে মৃত।

ক। আমি তাঁর পক্ষে মৃত, তিনি আমার পক্ষে নন।

ভব। তিনি তোমার পক্ষে মৃতবৎ হইবেন বলিয়াই ত তুমি মরিলে। বার বার সে কথা কেন কল্যাণী?

ক। মরিলে কি সম্বন্ধ যায়? তিনি কেমন আছেন?

ভব। ভাল আছেন।

ক। কোথায় আছেন? পদচিহ্নে?

ভব। সেই খানেই আছেন।

ক। কি কাজ করিতেছেন?

ভব। যাহা করিতেছিলেন। দুর্গনির্ম্মাণ, অস্ত্র নির্ম্মাণ। তাঁহারই নির্ম্মিত অস্ত্রে সহস্র সহস্র সন্তান সজ্জিত হইয়াছে। তাঁহার কল্যাণে কামান, বন্দুক, গোলা, গুলী, বারুদের আমাদের আর অভাব নাই। সন্তান মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদিগের মহৎ উপকার করিতেছেন। তিনি আমাদিগের দক্ষিণ বাহু।

ক। আমি প্রাণ ত্যাগ না করিলে কি এত হইত? যার বুকে কাদা পোরা কলসী বাঁধা সে কি ভবসমুদ্রে সাঁতার দিতে পারে? যার পায়ে লোহার শিকল সে কি দৌড়ায়? কেন সন্ন্যাসী তুমি এ ছার জীবন রাখিয়াছিলে?

ভব। স্ত্রী সহধর্ম্মিনী, ধর্ম্মের সহায়।

ক। ছোট ছোট ধর্ম্মে। বড় বড় ধর্ম্মে

কণ্টক। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" আমি বিধ কণ্টকের দ্বারা তাহার অধর্ম্ম কণ্টক উদ্ধৃত করিয়া ছিলাম। ছি! দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী! এ প্রাণ তুমি ফিরাইয়া দিলে কেন?

ভব। ভাল, যা দিয়াছি তা না হয় আমারই আছে। কল্যাণী! যে প্রাণ তোমায় দিয়াছি, তাহা কি তুমি আমায় দিতে পার?

ক। আপনি কিছু সম্বাদ রাখেন কি, আমার সুকুমারী কেমন আছে?

ভব। অনেক দিন সে সম্বাদ পাই নাই। জীবানন্দ অনেক দিন সে দিকে যান নাই।

ক। সে সম্বাদ কি আমায় আনাইয়া দিতে পারেন না? স্বামীই আমার ত্যাজ্য, বাঁচিলাম ত কন্যা কেন ত্যাগ করিব? এখনও সুকুমারীকে পাইলে এ জীবনে কিছু সুখ সম্ভাবিত হয়। কিন্তু আমার জন্য আপনি কেন এত করিবেন।

ভব। করিব কল্যাণী। তোমার কন্যা আনিয়া দিব। কিন্তু তার পর?

ক। তার পর কি ঠাকুর?

ভব। স্বামী?

ক। ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্যাগ করিয়াছি।

ভব। যদি তার ব্রত সম্পূর্ণ হয়?

ক। তবে তাঁর পায়ে লুটাইব। আমি যে বাঁচিয়া আছি তিনি কি জানেন?

ভব। না।

ক। আপনার সঙ্গে কি তাঁহার সাক্ষাৎ হয় না?

ভব। হয়।

ক। আমার কথা কি কিছু বলেন না?

ভব। না, যে স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে স্বামীর আর সম্বন্ধ কি?

ক। কি বলিতেছেন?

ভব। তুমি আবার বিবাহ করিতে পার, তোমার পুনর্জ্জন্ম হইয়াছে।

ক। আমার কন্যা আনিয়া দাও।

ভব। দিব, তুমি আবার বিবাহ করিতে পার?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তান ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। পরকাল?

ভব। অতল জলে।

ক। মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ক। কিসের জন্য এসব অতল জলে ডুবাইবে?

ভব। তোমার জন্য। দেখ, মনুষ্য হউন, ঋষি হউন, সিদ্ধ হউন, দেবতা হউন, চিত্ত অবশ; ধর্ম্ম অধর্ম্মের কাছে পরাজিত। যুধিষ্ঠির বলিয়া ছিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"; ইন্দ্র সহস্রলোচন, চন্দ্র কলঙ্কী, ব্রহ্মা কন্যাগামী। সন্তানধর্ম্ম আমার প্রাণ, কিন্তু আজ প্রথম বলি, তুমিই আমার প্রাণাধিক প্রাণ। যে দিন তোমায় প্রাণদান করিয়াছিলাম, সেই

দিন হইতে তোমার পাদমূলে বিক্রীত। আমি জানিতাম না, যে সংসারে এ রূপ-রাশি আছে। এমন রূপরাশি আমি কখন চক্ষে দেখিব জানিলে, কখন সন্তান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতাম না। এ ধর্ম্ম এ আগুণে পুড়িয়া ছাই হয়। ধর্ম্ম পুড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ আছে। আজ চারি বৎসর প্রাণও পুড়িতেছে, আর থাকে না! দাহ! কল্যাণী দাহ! জ্বালা! কিন্তু জ্বলিবে যে ইন্ধন তাহা আর নাই। প্রাণ যায়। চারি বৎসর সহ্য করিয়াছি আর পারিলাম না। তুমি আমার হইবে?

ক। তোমারি মুখে শুনিয়াছি যে সন্তান ধর্ম্মের এই এক নিয়ম যে, যে ইন্দ্রিয় পরবশ হয় তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। একথা কি সত্য?

ভব। এ কথা সত্য।

ক। তবে তোমার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু?

ভব। আমার এক মাত্র প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না চিত্ত আমার ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিব না। তুমি কবে মরিবে?

ভব। আগামী যুদ্ধে।

ক। তবে তুমি বিদায় হও। আমার কন্যা পাঠাইয়া দিবে কি?

ভবানন্দ সাশ্রুলোচনে বলিল, "দিব। আমি মরিয়া গেলে আমায় মনে রাখিবে কি?"

কল্যাণী বলিল "রাখিব। ব্রতচ্যুত অধর্ম্মী বলিয়া মনে রাখিব।"

ভবানন্দ বিদায় হইল কল্যাণী পুঁথি পড়িতে বসিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভবানন্দ ভাবিতে ভাবিতে মঠে চলিলেন। যাইতে যাইতে রাত্রি হইল। পথে একাকী যাইতেছিলেন। বনমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন বনমধ্যে আর এক ব্যক্তি তাঁহার আগে আগে যাইতেছে। ভবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে হে যাও?"

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল, "জিজ্ঞাসা করিতে জানিলে উত্তর দিই—আমি পথিক।"

ভব। বন্দে।

অগ্রগামী ব্যক্তি বলিল. "মাতরং।"

ভব। আমি ভবানন্দ গোস্বামী।

আগ্রগামী। আমি ধীরানন্দ।

ভব। ধীরানন্দ, কোথায় গিয়াছিলে?

ধীর। আপনারই সন্ধানে।

ভব। কেন?

ধীর। একটা কথা বলিতে।

ভব। কি কথা?

ধীর। নির্জ্জনে বক্তব্য।

ভব। এইখানেই বল না, এ অতি নির্জ্জনস্থান।

ধীর। আপনি নগরে গিয়াছিলেন?

ভব। হাঁ।

ধীর। গৌরী দেবীর গৃহে?

ভব। তুমিও নগরে গিয়াছিলে না কি?

ধীর। সেখানে একটি পরম সুন্দরী যুবতী বাস করে?

ভবানন্দ কিছু বিস্মিত, কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন—"এ সকল কি কথা?"

ধীর। আপনি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন?

ভব। তার পর?

ধীর। আপনি সেই কামিনীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত।

ভব। (কিছু ভাবিয়া) ধীরানন্দ, কেন এত সন্ধান লইলে? দেখ ধীরানন্দ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সকলই সত্য। তুমি ভিন্ন আর কয় জন একথা জানে?

ধীর। আর কেহ না।

ভব। তবে তোমাকে বধ করিলেই আমি কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পারি?

ধীর। পার।

ভব। আইস তবে এই বিজন স্থানে দুই জনে যুদ্ধ করি। হয় তোমাকে বধ করিয়া আমি নিষ্কণ্টক হই, নয় তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার সকল জ্বালা নির্ব্বাণ কর। অস্ত্র আছে?

ধীর। আছে—শুধু হাতে কার সাধ্য তোমার সঙ্গে এ সকল কথা কয়। যুদ্ধই যদি তোমার মত হয়, তবে অবশ্য করিব। সন্তানে সন্তানে বিরোধ নিষিদ্ধ কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য কাহারও সঙ্গে বিরোধ নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু যাহা বলিবার জন্য আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম তাহা সবটা শুনিয়া যুদ্ধ করিলে ভাল হয় না?

ভব। ক্ষতি কি—বল না।

ভবানন্দ তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া ধীরানন্দের স্কন্দে স্থাপিত করিলেন। ধীরানন্দ না পলায়।

ধীর। আমি এই বলিতেছিলাম,—তুমি কল্যাণীকে বিবাহ কর—

ভব। কল্যাণী তাও জান?

ধীর। বিবাহ কর না কেন?

ভব। তাহার যে স্বামী আছে।

ধীর। বৈষ্ণবের সেরূপ বিবাহ হয়।

ভব। সে নেড়া বৈরাগীর—সন্তানের নহে। সন্তানের বিবাহই নাই।

ধীর। সন্তান ধর্ম্ম কি অপরিহার্য্য—তোমার যে প্রাণ যায়। ছি! ছি! আমার কাঁধ যে কাটিয়া গেল? (বাস্তবিক এবার ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল।)

ভব। তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাকে অধর্ম্মে মতি দিতে আসিয়াছ? অবশ্য তোমার কোন স্বার্থ আছে।

ধীর। তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে—তরবার বসাইও না, বলিতেছি। এই

সন্তান ধর্ম্মে আমার হাড় জর জর হইয়াছে—আমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রের মুখ দেখিয়া দিনপাত করিবার জন্য বড় উতলা হইয়াছি। আমি এ সন্তান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কিন্তু আমার কি বাড়ী গিয়া বসিবার যো আছে? বিদ্রোহী বলিয়া আমাকে অনেকে চিনে। ঘরে গিয়া বসিলেই হয় রাজপুরুষে মাথা কাটিয়া লইয়া যাইবে, নয় সন্তানেরাই বিশ্বাসঘাতী বলিয়া মারিয়া ফেলিয়া, চলিয়া যাইবে। এই জন্য তোমাকে আমার পথে লইয়া যাইতে চাই।

ভব। কেন আমায় কেন?

ধীর। সেইটি আসল কথা। এই সন্তান সেনা তোমার আজ্ঞাধীন—সত্যানন্দ এখন এখানে নাই, তুমি ইহার নায়ক। তুমি এই সেনা লইয়া যুদ্ধ কর, তোমার জয় হইবে, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যুদ্ধজয় হইলে তুমি কেন স্বনামে রাজ্যস্থাপন কর না, সেনা ত তোমার আজ্ঞাকারী। তুমি রাজা হও—কল্যাণী তোমার মন্দোদরী হউক, আমি তোমার অনুচর হইয়া স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করি, আর আশীর্ব্বাদ করি। সন্তান ধর্ম্ম অতল জলে ডুবাইয়া দাও।

ভবানন্দ, ধীরানন্দের স্কন্ধ হইতে তরবারি ধীরে ধীরে নামাইলেন। ধীরানন্দও সরিয়া গেল। ভবানন্দ কিছুক্ষণ অন্যমনা ছিলেন, যখন খুজিলেন তখন আর ত হাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মঠে না গিয়া, ভবানন্দ গম্ভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সেই জঙ্গল মধ্যে একস্থানে একপ্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকাদির উপর, লতাগুল্ম কণ্টকাদি অতিশয় নিবিড় ভাবে জন্মিয়াছে। সেখানে অসংখ্য সর্পের বাস। ভগ্ন প্রকোষ্টের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত অভগ্ন ও পরিস্কৃত ছিল, ভবানন্দ গিয়া তাহার উপরে উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিয়া ভবনান্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রজনী অতি ঘোর তমসাময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিশয় নিবিড়, বৃক্ষলতায় দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল, জনশূন্য, অন্ধকার দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ কম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নকারী, বধ্য এবং বধকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ। তাঁহার পক্ষে তখন যেন পৃথিবী নাই, অথবা কেবল ভয়ের উপাদানময়ী হইয়া আছেন। সেই সময়ে ভবানন্দ কপালে হাত দিয়া ভাবিতেছিল; স্পন্দ নাই, নিশ্বাস

নাই, ভয় নাই, অতি প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্য হইবে। আমি ভাগী রথী জল তরঙ্গ সমীপে ক্ষুদ্র গজদেহ স্থাপন করিয়া কি করিব? ইহা আমাকে করিতে হইয়াছে, অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে। আপনার ওজন আপনি না বুঝিয়া মাণদণ্ডে আমি তুলিত হইতে উঠিয়াছিলাম। যে লোভী, যে পাপিষ্ঠ, যে ইন্দ্রিয় পরবশ, যে অধর্ম্মী তাহার আবার ধর্ম্ম কি? তাহার আবার সত্য কি? পাপে আমার ভয় কি? অনন্ত নরক আমার কপালে নিশ্চিত। ইহজীবন ধ্বংসের সম্ভাবনা, এই ইহজীবন ধ্বংসে আমার ভয় কি? অতএব যাহাই কপালে ঘটুক, আমি এদুষ্কর্ম্ম করিব। এদিকেও প্রাণ যায়, সে দিকেও প্রাণ যাইবে। যে বিপদ দূরবর্ত্তী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া যে বিপদ নিকটবর্ত্তী তাহা হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হয়। আমি ধীরানন্দের পরামর্শ শুনিব।—না! ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা গুরু, এ জীবন হয় তো এই মুহূর্ত্তেই সর্প দংশনে শেষ হইতে পারে, কিন্তু জন্মান্তরের তো শেষ নাই। এ জীবনে আমি যদি সুখী হই, সে দুই দিনের জন্য, পরলোকে যদি আমি দুঃখী হই, সে অনন্তকালের জন্য।" এমন সময়ে পেচক মাথার উপর মৃদু গম্ভীর শব্দ করিল। ভবানন্দ তখন মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "ও কি শব্দ? কাণে যেন গেল, যেন যম আমার ডাকিতেছে। আমি জানি না কে শব্দ করিল, কে আমায় ডাকিল, কে আমায় বিধি দিল, কে আমায় নিষেধ করিল। পুণ্যময়ি অনন্তে! তুমি শব্দময়ী, কিন্তু তোমার শব্দের তো মর্ম্ম আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ধর্ম্মে মতি দাও, আমার পাপ হইতে নিরস্ত কর। ধর্ম্মে, হে গুরুদেব! ধর্ম্মে যেন আমার মতি থাকে।"

তখন সেই ভীষণ কানন মধ্যে হইতে অতি মধুর অথচ গম্ভীর, মর্ম্মভেদী মনুষ্য কণ্ঠ শ্রুত হইল; কে বলিল "ধর্ম্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্ব্বাদ করিলাম।"

ভবানন্দের শরীরে রোমাঞ্চ হইল। "একি এ? এ যে গুরুদেবের কণ্ঠ! মহারাজ কোথায় আপনি! এ সময়ে দাসকে দর্শন দিন।"

কিন্তু কেহ দর্শন দিল না—কেহ উত্তর করিল না। ভবানন্দ পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন—উত্তর পাইলেন না। এ দিক ওদিক খুজিলেন—কোথাও কেহ না।

যখন রজনী প্রভাতে প্রাতঃ সূর্য্য উদিত হইয়া বৃহৎ অরণ্যের শিরঃস্থ শ্যামল পত্র রাশিতে প্রতিভাসিত হইতেছিল তখন ভবানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! কর্ণে প্রবেশ করিল—"হরে মুরারে! হরে মুরারে।" চিনিলেন সত্যানন্দের কণ্ঠ। বুঝিলেন, প্রভু প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

রঙ্গমতী।

কাব্য।

(শ্রীনবীনচন্দ্র সেন প্রণীত)

বঙ্গভাষায় উৎসর্গ পত্র কেহ সমালোচনা করেন না,—কেন না সচরাচর তাহা সমালোচনার যোগ্য নহে। সমালোচ্য "রঙ্গমতী কাব্যের" উৎসর্গ পত্র বাস্তবিক সমালোচনার যোগ্য। বাঙ্গালীর কাব্যরসজ্ঞতার উপর অনেকের এমনই অটল ভক্তি, যে তাঁহারা অনায়াসে স্থির করিতে যান যে "বাঙ্গালী কবি কেন?" মনে হইতেছে, সেদিন এক জন লেখক জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন "বাঙ্গালী কবি নয় কেন?" কোন্ কথা ঠিক্ একেবারে বলিয়া উঠা বড় সহজ নহে; অথচ, বাঙ্গালীকে অরসিক বলিতে প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠে! সে যাহা হউক, যে বৈচিত্র কবিপ্রতিভা বিকাশের প্রধান উপকরণ, বঙ্গসমাজে তাহা বড় নাই। এই চিরস্থিতিশীল সমাজে বৈচিত্র হাসির কথা; স্বানুবর্ত্তিতা পাগলামী। সুতরাং চিন্তাশীল স্বীকার করিবেন যে 'বঙ্গসমাজ কাব্যের প্রশস্ত ক্ষেত্র নহে। বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে মলয়ানিল যেমন অব্যাহতগতিতে বহিতে পায়, সমাজক্ষেত্রে কাব্যসমীরণ তেমন সৌভাগ্যশালী নহে।

তবে বঙ্গভূমে মহাকাব্য সকল জন্মিল কি রূপে? ইহার উত্তর সহজ। যখনই এই চিরস্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনীগুলি কালপ্রভাবে এক এক বার শিথিল হইয়াছে, অমনি বঙ্গে কাব্য জন্মিয়াছে। বৈদেশিক ভাবপ্রবাহ যখন বহিয়াছে, তখনই কাব্য দেখা দিয়াছে—কেন না তখন সমাজ বৈচিত্র্যের মহিমা বুঝিয়াছে। স্বীকার করি, সমাজের এইরূপ অবস্থাতেই সকল দেশে কাব্য জন্মে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করি যে, স্থিতিশীলতায় বঙ্গসমাজের তুলনা নাই। নদীমুখনীত কর্দ্দমরাশিতে কতিপয় সহস্র বর্ষ মধ্যে বঙ্গভূমি গঠিত না হউক, কিন্তু স্থিতিশীল আর্য্যজাতির শেষ লীলাস্থলী এই বঙ্গভূমি। তাই সমাজবন্ধন এত কঠোর।—কেন না, নিবিবার আগে প্রদীপ উজ্জ্বলতর হয়! সমাজবন্ধন এত কঠোর বলিয়াই, শিথিলাবস্থায় ইহার কার্য্যক্ষেত্র এত প্রশস্ত হইয়া উঠে। যেখানে ঘাতের বেগ প্রবল, প্রতিঘাতের বেগ সেখানে অসহ্য।

বাঙ্গলার "রঙ্গমতীর" কবি, উৎসর্গপত্রে স্বীয় জীবনের বৈচিত্র্য বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অন্য দেশে সে কার্য্য সমালোচকের। ইহাতেই প্রভেদ

বুঝা যায়। কবির প্রতি আমাদের ভক্তি কেমন, তাহা জানিতে তত কষ্ট পাইতে হয় না। সাধারণতঃ বাঙ্গালী সমালোচক যদি বঙ্গকবিজীবনের বৈচিত্র্য বুঝিতেন, তবে আর বাঙ্গালী কবিকে নিজের কথা নিজে বলিতে হইত না।

ছয় সর্গে "রঙ্গমতী" কাব্য শেষ হইয়াছে। প্রথম সর্গে, কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্রের নৌকাযাত্রা এবং দারুণ ঝটিকায় তাঁহার নিমজ্জন বর্ণিত হইয়াছে। সর্গারম্ভে নিদাঘের ছবিটী কমনীয় বটে। আর বাঙ্গলাভাষায় "চন্দ্রকলার গীত" এক নূতন জিনিস। তাহা ছাড়া এসর্গে সুখ্যাতির যোগ্য আর কিছু নাই।

দ্বিতীয় সর্গে—"কানন কালীর শ্বেত-প্রস্তর মন্দিরে" সুষুপ্ত যুবা বীরেন্দ্র। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তপস্বিনী। সুষুপ্ত বীরেন্দ্রের নিদ্রায় শান্তি নাই——

নিদ্রার সাগরে

* * * বহিতেছে কুস্বপ্নঝটিকা।

তপস্বিনীর "বৎস বীরেন্দ্র!" সম্বোধন শুনিয়া যুবার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি আপন স্বপ্নবৃত্তান্তছলে জীবনের পূর্ব্বকাহিনী বিবৃত করিলেন।

এই দীর্ঘ বিবৃতি বড় অস্বাভাবিক হইয়াছে। কবির মনোহর কবিত্বগুণে ইহা পড়িতে ভাল লাগে বটে, কিন্তু ইহা সুরুচিকর নহে। এই সর্গে মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবজীর একটি বড় সুন্দর ছবি আছে। এই ছবি পূর্ণ এবং ভাস্বর। ইতিহাসে শিবজীর সেই সকল অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী পড়িয়া পাঠকের মনে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি জন্মে, কবি নবীনচন্দ্রের এই স্বল্পাক্ষরগ্রথিত, ক্ষুদ্র চিত্রে তাহার শত গুণ ফল হয়। এই দেখুন,

"সগর্ব্বে ফিরায়ে পুনঃ প্রদীপ্ত বদন,
ললাটে ধমনীত্রয় স্ফীত, আরক্তিম,—
বালার্ক কিরণরেখা, হায় রে যেমতি
উদয় গগনে জলে নিদাঘ-প্রভাতে।
কুঞ্চিত অধরে পুনঃ বলিতে লাগিলা।
'দস্যু আমি! আমি দস্যু মহারাষ্ট্রকুলে!'
ঘোর অট্ট হাসি বীর উঠিল হাসিয়া।
হাসিয়া? হাসি ত নহে। ভৈরব-গর্জ্জনে
আগ্নেয় ভূধর হতে হুতাশন-রাশি
হইল নির্গত যেন!—ভয়ঙ্কর হাসি!"

এই চিত্র বড় সুন্দর, বড় উদ্দীপক বটে, কিন্তু ইহা যথাস্থানে নিবেশিত হয় নাই। স্বপ্নবৃত্তান্ত শেষ করিয়া জীবন বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলে নির্জ্জনবাসিনী তপস্বিনীর একদিন ভাল লাগিলেও লাগিতে পারে, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা অসহ্য। সেই উপন্যাসপ্রবাহে শিবজীর এই সুপ্ত চিত্র ভাসিয়া গিয়াছে;—কবির উদ্দীপনা গুণেও ইহার ফল স্থায়ী হয় নাই। শিবজীর উপর বড় অবিচার করা হইয়াছে। এই মহাচিত্রের গৌরবানুরোধে কবি পুনা দুর্গের চিত্র, কাব্যের প্রথম সর্গে যথাযথ দিলে ভাল করিতেন। সেইখানে আমরা নয়ন ভরিয়া মহারাষ্ট্র যুগে শেষ হিন্দুকুলতিলক শিবজীর অনন্ত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিতাম! তাহা হইলে আর পিতাম্বরীর গমনমধ্যে, নিয়-

জনশ্রান্ত ক্ষীণকণ্ঠ বীরেন্দ্রের মুখে ভুলিতে হইত না—

"প্রীতি দৃষ্টি মম পানে করি কিছুক্ষণ,
ত্যজিয়া পর্য্যঙ্কাসন,বীরেন্দ্র কেশরী
ভ্রমিতে লাগিলা ধীরে, অবনত মুখে
অন্য মনে,সন্ধ্যালোকে,শিবির বাহিরে।"

অথচ কাব্যও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না। এই কাব্যের যাহা কেন্দ্র, তাহা বুঝি, তাহা হইলে আরও স্পষ্টীকৃত হইত।

তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়,চন্দ্রশেখরের অদ্ভুত নৈসর্গিক শোভা! এই কাব্যের প্রধান আকর্ষণ নিসর্গ বর্ণনা। কাব্যের যে কোন সর্গে ইহার প্রাচুর্য্য আছে। চিরসমতলবাসী বঙ্গকবিকুলের সৃষ্ট সাহিত্যসংসারে "রঙ্গমতী কাব্য" নূতন জিনিস। নিসর্গের অনন্ত ভাব এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে আর কোন বাঙ্গালি কবি চিত্রিত করিতে পারেন নাই। এবং নবীন বাবু ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালি কবি সে দৃশ্যের প্রতি বিচার করিতে পারেন কি না,জানি না।

এই সর্গে একটী বানরের চিত্র আছে। সে চিত্র পূর্ণ এবং আকাঙ্ক্ষার অতীত। সাধারণতঃ বাঙ্গালী কবি শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া বসেন। সুতরাং ইচ্ছা করিয়া বানর গড়িতে বসিলে কুশলী বাঙ্গালিকবির চিত্র যে, অভ্রান্ত হইবে, ইহা বিস্ময়ের কথা নহে। জলধর এবং বিদ্যাদিগ্‌গজ বাঙ্গালীর মৌলিক চিত্র। আর মোহন রামদাস কল্পতরু মূলে দেখা দিয়াছেন। আর আবার "ঢেঁকি পঞ্চানন" আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন!

"দোহাই তোমার বাবা! যাহা আছে সব
দিতেছি বলিয়া—এক গুণ দুগ্ধ তাহে
দধি দুই গুণ—তিন গুণ লুচি আর
মণ্ডা চতুর্গুণ। ক্ষুদ্র উদর সাগরে
দধি, দুগ্ধ অম্বুরাশি, লুচি মণ্ডাচয়।
ভীষণ ঝটিকা তাহে,—অর্থের পিপাসা!"

চতুর্থ সর্গে "রঙ্গমতী বনের" ছবি।—সে বড় সুন্দর! উচ্চতম শৃঙ্গে বসিয়া প্রভাতে বীরেন্দ্র চিন্তামগ্ন! সেইখানে বসিয়া তিনি শৈশবের কথা ভাবিতেছিলেন। শৈশবের, কৈশোরের সরল সুখ, সরল প্রীতির সহিত যৌবনের কুটিল ভাবের তুলনা করিতেছিলেন। শৈশবের যে চিরসঙ্গিনী,—শূন্যহৃদয়া বালিকা,—যৌবনের যে সুখস্বপ্ন তাহার কথা—সেই কুসুমের কথা—তিনি একমনে ভাবিতেছিলেন। এই বনে বালিকা কুসুমের সঙ্গে কেমন খেলা করিতেন, কেমন স্নেহের বিবাদ করিতেন, সে সব কথা মনে পড়িয়া তাঁহার স্মৃতিসাগর মথিত হইতেছিল! যে সকল কবিতায় এই দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে, তাহারা বড় মোহময়;—পাঠককে যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে। কিন্তু এই দৃশ্য বাঙ্গালা কাব্যে আর একবার দেখিয়াছিলাম। বীরেন্দ্র কুসুমকে দেখিয়া, প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যকালের প্রণয়টা মনে পড়িয়া যায়।

বীরেন্দ্রের সুখের চিন্তা থামিয়া গেল —কেন না তিনি দূরে শিকারীর বীরগান

শুনিতে পাইলেন। এই শিকারীর গানের প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না। বঙ্গসাহিত্য-সংসারের প্রধানতঃ গীতি কবিতার জন্যই নবীনবাবুর প্রতিষ্ঠা। তাঁহার "অবকাশ রঞ্জিনীর" পীযূষময়ী গীতি কবিতানিচয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না। তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধের" গীতি কবিতায় মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক স্বীকার করিয়াছেন যে; গীতিকবিতায় তিনি মন্ত্রসিদ্ধ। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে "রঙ্গমতী কাব্যে" তিনি সে যশঃ সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াছেন। বরং গাম্ভীর্য্য ও নৈপুণ্যে এ সম্বন্ধে তিনি সমধিক উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

সর্গ শেষে দস্যু বেঞ্জামিনের সঙ্গে বীরেন্দ্রের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। তাহা পড়িতে পড়িতে আমাদের "Lady of the Lake" মনে পড়িয়া গেল। রডরিকের (Roderick) সঙ্গে ফিজেমসের (Fitz-James) ঠিক্ এইরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। "রঙ্গমতীর" ধরণ অনেকটা (Lady of the Lake"এর মত। যে সময় গীতি শুনিতে শুনিতে Roderick প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, "রঙ্গমতী কাব্যে" তপস্বিনীর কাছে পুরোহিতের বিজয় গীতি তাহারই স্থলাভিষিক্ত। তবে বোধ হয় যে, উদ্দীপনায় নবীন বাবুর কবিতায় সার্থকতা অধিকতর।

পঞ্চম সর্গের প্রভাতে "রঙ্গমতী দেবী মন্দিরে" জীবন্ত বিষাদের গীতি!—শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। নবীন বাবুর গীতিকাব্য কুশলতার আমরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছি—পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। পঞ্চম সর্গের আকর্ষণ বলিতে গেলে দুইটি গীতিই—কুসুমিকার বিষাদগীতি আর তপস্বিনীর কাছে কামন কালীর পুরোহিতের সমরগীতি। সে কথা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি।

ষষ্ঠ সর্গের কবিতার অধিকাংশ বড় ভাবোদ্দীপক। বিশেষ অশোকমূলে একাকিনী বসিয়া, কুসুমিয়া রমণী বিচিত্র মাল্য বুনিতে বুনিতে, বিষাদে, যে বিরহ গীতি গাহিতেছে, তাহা শুনিয়া তৃপ্তি মিটে না।—সে গীতির আমূল উদ্ধৃত করিতে সাধ করে!—একটু শুনুন,

"যে দেশে রয়েছ তুমি,
নাহি কি আকাশ ভূমি
সে দেশে, সলিল নাহি, নাহি রবি শশী?
আকাশে নীলিমা নাই
ভূধে, বৃক্ষলতা নাই,
অনিলে তরল শোভা, নিশি কণ্ঠে শশী?

"দিনে দিবাকর নাই?
প্রদোষ, প্রভাত নাই?
নরের হৃদয় নাই, হৃদয়েতে স্মৃতি?
থাকিলে, এ দুঃখিনীরে
ডাসায়ে বিস্মৃতি নীরে,
কেমনে রয়েছ ছাড়ি আশ্রিতা ব্রততী?

"যখন যে দিকে চাই,
কেবল দেখিতে পাই

অদ্রিজ তোমার মুখ,—শূন্য, ধরাতল!
　　স্বর স্বর নিরন্তরে,
　　নিত্য প্রেম গীত স্বরে,
অনন্ত প্রেমের কাব্য গগন, ভূতল!”

নবীন বাবুর বিশ্লেষণ শক্তি “পলাশীর যুদ্ধ” কাব্যে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। “রঙ্গমতী কাব্যে” তাঁহার আশ্লেষণ শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ না করুক, দেখা দিয়াছে। “রঙ্গমতীর” অধিকাংশ চিত্র ফোট ফোট হইয়াও ফুটে নাই, তবে ফুটাইবার উদ্যম আছে বটে। বীরেন্দ্র চরিত্রে তিনি কয়টী রেখাপাত করিয়াছেন;—তাহারা তাঁহার বিকাশোন্মুখ আশ্লেষণ শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার বীরেন্দ্র আশার যেন অবতার! তিনি রঙ্গমতীর সুন্দর কানন দেখিতে দেখিতে উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন

　　“একটী রাজ্যের উপকরণ সুন্দর
　　রয়েছে পড়িয়া!”

“পলাশীর যুদ্ধে” নবীন বাবু যখনই মাতৃভূমির দুঃখ ভাবিয়া রোদন করিয়াছেন, তাঁহার কবিতা গৈরিকনিস্রবৎ তীব্র উদ্দীপনা উদগীর্ণ করিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী রোদন “রঙ্গমতীর” অস্থি পঞ্জর! প্রভেদ এই “পলাশীর যুদ্ধ” কেবলমাত্র সুপদ্যের সমষ্টি! তাহার বড় একটা লক্ষ্য নাই। “রঙ্গমতী কাব্যের” কেন্দ্র আছে, বীজ আছে। সুতরাং কবি, কাব্যসোপানে আর একপদ উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

পালামৌ।

আবার পালামৌর কথা লিখিতে বসিয়াছি; কিন্তু ভাবিতেছি এবার কি লিখি? লিখিবার বিষয় এখন ত কিছুই মনে হয় না, অথচ কিছু না কিছু লিখিতে হইতেছে। বাঘের পরিচয় ত আর ভাল লাগে না; পাহাড় জঙ্গলের কথাও হইয়া গিয়াছে, তবে আর লিখিবার আছে কি? পাহাড়, জঙ্গল, বাঘ, এই লইয়াই পালামৌ। যে সকল ব্যক্তিরা তথায় বাস করে তাহারা জঙ্গলি, কুৎসিত, কদাকার জানওয়ার, তাহাদের পরিচয় লেখা বৃথা।

কিন্তু আবার মনে হয়, পালামৌ জঙ্গলে কিছুই সুন্দর নাই একথা বলিলে লোকে আমায় কি বিবেচনা করিবে? সুতরাং পালামৌ সম্বন্ধে দুটা কথা বলা আবশ্যক।

একদিন সন্ধ্যার পর চিকপর্দ্দা ফেলিয়া তাঁবুতে একা বসিয়া সাহেবি ঢঙ্গে কুকুরী লইয়া ক্রীড়া করিতেছি, এমত সময় এক জন কে আসিয়া বাহির হইতে আমাকে ডাকিল “খাঁ সাহেব!” আমার সর্ব্বশরীর

জলিয়া উঠিল। এখন হাসি পায়, কিন্তু তখন বড়ই রাগ হইয়াছিল। রাগ হইবার অনেক কারণও ছিল; কারণ, নং এক এই যে আমি মান্য ব্যক্তি; আমাকে ডাকিবার সাধ্য কাহার? আমি যাহার অধীন, অথবা যিনি আমা অপেক্ষা অতি প্রধান, কিম্বা যিনি আমার বিশেষ আত্মীয়, কেবল তিনিই আমাকে ডাকিতে পারেন। অন্য লোকে "শুনুন" বলিলে সহ্য হয় না।

কারণ নং দুই যে, আমাকে "খাঁ সাহেব" বলিয়াছে বরং "খাঁ বাহাদুর" বলিলে কতক সহ্য করিতে পারিতাম, ভাবিতাম হয় ত লোকটা আমাকে মুছলমান বিবেচনা করিয়াছে, কিন্তু পদের অগৌরব করে নাই। "খাঁ সাহেব" অর্থে যাহাই হউক, ব্যবহারে তাহা আমাদের "বোস মশায়" বা "দাস মশায়" অপেক্ষা অধিক মান্যের উপাধি নহে। হারম্যান কোম্পানি যাহার কাপড় সেলাই করে, ফরাসি দেশে যাহার জুতা সেলাই হয় তাহাকে "বোস মহাশয়" বা "দাস মহাশয়" বলিলে সহ্য হইবে কেন? বাবু মহাশয় বলিলেও মন উঠে না। অতএব স্থির করিলাম এ ব্যক্তি যেই হউক, আমাকে তুচ্ছ করিয়াছে আমাকে অপমান করিয়াছে।

সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ইহার বিশেষ প্রতিফল পাইতে হইত, কিন্তু "হারামজাদ্", "বদ্জাত" প্রভৃতি সাহেবদত্তার সুগত গালি ব্যতীত আর তাহাকে কিছুই দিই নাই, এই আমার বাহাদুরি। বোধ হয়, সে রাত্রে বড় শীত পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁবুর বাহিরে যাইতে সাহস করি নাই। আগন্তুক গালি খাইয়া আর কোন উত্তর করিল না; বোধ হয় চলিয়া গেল। আমি চিরকাল জানি, যে গালি খায়, সে হয় ভয়ে মিনতি করে, নতুবা গালি অকারণ দেওয়া হইয়াছে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তর্ক করে; তাহা কিছুই না করায়, আমি ভাবিলাম এব্যক্তি চমৎকার লোক। সেও হয় ত আমাকে ভাবিল "চমৎকার লোক।" নাম জানে না, পদ জানে না, কি বলে ডাকিবে তাহা জানে না; সুতরাং দেশীয় প্রথা অনুসারে সম্ভ্রম করে 'খাঁ সাহেব' বলিয়া ডাকিয়াছে, তাহার উত্তরে যে 'হারামজাদ' বলিয়া গালি দেয়, তাহাকে "চমৎকার লোক" ব্যতীত আর কি মনে করিবে?

দণ্ডেক পরে আমার "খানশামা বাবু" তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ঈষৎ কণ্ঠকণ্ডুয়নশব্দ দ্বারা আপনার আগমনবার্ত্তা জানাইল। আমার তখন ও রাগ আছে, "খানসামা বাবু"ও তাহা জানিত, এই জন্য কলিকা হস্তে তাঁবুতে প্রবেশ করিল, কিন্তু অগ্রসর হইল না, দ্বারের নিকট দাড়াইয়া, অতি গম্ভীরভাবে কলিকার "ফু" দিতে লাগিল, আমি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিতেছি, কতক্ষণে কলিকা আলবোলার বসাইয়া দিবে, এমন সময়ে দ্বারের পার্শ্বে কি নড়িল, চাহিয়া দেখিলাম সেদিকে কিছুই নাই,

কেবল নীল আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছে ; তাহার পরেই দেখি দুইটি অস্পষ্ট মনুষ্য-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে, টেবিলের বাতি সরাইলাম, আলোক তাহাদের অঙ্গে পড়িল। দেখিলাম একটি বৃদ্ধ আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রুতে পরিপ্লুত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বোধ হয় যেন যুবতী। আমি তাহাদের প্রতি চাহিবামাত্র উভয়ে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া যোড়হস্তে নতশিরে আমায় সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবতীর মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন বড় ভয় পাইয়াছে, অথচ ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি আছে। তাহার যুগ্ম ভ্রু দেখিয়া আমার মনে হইল যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে। আমি অনিমিষ লোচনে সুন্দরী দেখিতে লাগিলাম ; কেন আসিয়াছে, কোথায় বাড়ী এ কথা তখন মনে আসিল না। আমি কেবল তাহার রূপ দেখিতে লাগিলাম, তাহাকে দেখিয়াই প্রথমে একটি রূপবতী পক্ষিণী মনে পড়িল ; গেঙ্গোখালি "মোহানার" যে খানে ইংরেজেরা প্রথম উপনিবাস স্থাপন করেন, সেইখানে একদিন অপরাহ্নে বন্দুক স্কন্ধে পক্ষী শিকার করিতে গিয়াছিলাম, তথায় কোন বৃক্ষের শুষ্ক ডালে একটি ক্ষুদ্র পক্ষী অতি বিষণ্নভাবে বসিয়াছিল, আমি তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম, আমায় দেখিয়া পক্ষী উড়িল না, মাথা হেলাইয়া আমায় দেখিতে লাগিল। ভাবিলাম, "জঙ্গলী পাখী হয় ত কখন মানুষ দেখে নাই দেখিলে বিশ্বাসঘাতকে চিনিত।" চিনাইবার নিমিত্ত আমি হাসিয়া বন্দুক তুলিলাম ; তবু পক্ষী উড়িল না, বুক পাতিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি অপ্রতিভ হইলাম, তখন ধীরে ধীরে বন্দুক নামাইয়া অনিমিষলোচনে পক্ষীকে দেখিতে লাগিলাম ; তাহার কি আশ্চর্য্য রূপ !! সেই পক্ষিণীতে যে রূপরাশি দেখিয়াছিলাম, এই যুবতীতে ঠিক্ তাহাই দেখিলাম। আমি কখন কবির চক্ষে রূপ দেখি নাই, চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিস, রূপের আকার কি, শরীরের কোন কোন স্থানে তাহার বাসা, এ সকল বার্ত্তা আমাদের বঙ্গকবিরা বিশেষ জানেন, এই জন্য তাঁহারা অঙ্গ বাছিয়া বাছিয়া বর্ণনা করিতে পারেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি তাহা পারি না। তাহার কারণ আমি কখন অঙ্গ বাছিয়া রূপ তল্লাস করি নাই। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি নির্লজ্জ হইয়া তাহা বলিতে পারি ; একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম শিশুকে সর্ব্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর কাহারও দেখিতে পাইতাম না অনেক দিনের পর একটি ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে

বুকে করিয়াছিলাম। আমার সেই চক্ষু! আমি রূপ রাশি কি বুঝিব? তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম।

বাল্যকালে আমার মনে হইত যে ভূত প্রেত যে প্রকার নিজে দেহহীন অন্যের দেহ আবির্ভাবে বিকাশ পায়, রূপ ও সেই প্রকার অন্যদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভূতের আশ্রয় কেবল মনুষ্য, বিশেষতঃ মানবী। কিন্তু বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যেরূপ, লতায় সেইরূপ, নদীতে ও সেই রূপ, পক্ষীতে ও সেইরূপ, ছাগে ও সেই রূপ সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্র ভেদ। আমি পাত্র দেখিয়া ভুলি না; দেহ দেখিয়া ভুলি না; ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না। অনেকের এই প্রকার রুচিবিকার আছে। যাঁহারা বলেন যুবতীর দেহ দেখিয়া ভুলিয়াছেন তাঁহাদের মিথ্যা কথা।

আমি যুবতীকে দেখিতেছি এমত সময় আমার খানসামা বাবু বলিল "এরা বাই, এরাই তখন খাঁ সাহেব বলিয়া ডাকিয়াছিল" শুনিবামাত্র আবার রাগ পূর্ব্বমত গর্জ্জিয়া উঠিল, চিৎকার করিয়া আমি তাহাদের তাড়াইয়া দিলাম। সেই অবধি আর তাহাদের কথা কেহ আমায় বলে নাই। পরদিবস অপরাহ্নে দেখি এক বটতলায়, ছোট বড় কতকগুলা স্ত্রীলোক বসিয়া আছে, নিকটে দুই একটা "বেতো" ঘোড়া চরিতেছে; জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম তাহারা ও "বাই;" ব্যয় লাঘব করিবার নিমিত্ত তাহারা পাদাপৌ দিয়া যাইতেছে, এই সময় পূর্ব্বরাত্রের বাইকে আমার স্মরণ হইল, তাহার গীত শুনিব মনে করিয়া তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। কিন্তু লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল অতি প্রত্যূষে সে চলিয়া গিয়াছে, আমি আর কোন কথা কহিলাম না দেখিয়া একজন রাজপুত প্রতিবাসি বলিল, "সে কাঁদিয়া গিয়াছে।"

আ। কেন?

প্র। এই জঙ্গল দিয়া আসিতে আসিতে তাহার সঙ্গিয়া সকলে মরিয়াছে মাত্র একজন বৃদ্ধ সঙ্গে ছিল "খরচাও" ফুরাইয়াছে। দুইদিন উপবাস করেছে, আরও কতদিন উপবাস করিতে হয় বলা যায় না। এ জঙ্গল পাহাড় মধ্যে কোথা ভিক্ষা পাইবে? আপনার নিকট ভিক্ষার নিমিত্ত আসিয়াছিল, আপনিও ভিক্ষা দেন নাই।

এ কথা শুনিয়া আমার কষ্ট হইল, তাহার বিপদ কতক অনুভব করিতে পারিলাম, নিজে সেই অবস্থায় পড়িলে কি যন্ত্রণা পাইতাম, তাহা কল্পনা করিতে লাগিলাম। জঙ্গলে অন্নাভাব আর অপার নদীতে নৌকা ডুবি একই প্রকার। আমি তাহাকে অনায়াসে দুই পাঁচ টাকা দিতে পারিতাম, তাহাকে নিজের

কোন ক্ষতি হইত না; অথচ সে রক্ষা পাইত। আমি তাহাকে উদ্ধার করিলাম না, তাড়াইয়া দিলাম; এ নিষ্ঠুরতার ফল একদিন আমায় অবশ্য পাইতে হইবে, এইরূপ কথা আমার সর্ব্বদা মনে হইত। দুই চারি দিনের পর একটি সাহেবের সহিত আমার দেখা হইল, তিনি দশক্রোশ দূরে একা থাকিতেন, গল্প করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে আমার তাঁবুতে আসিতেন। গল্প করিতে করিতে আমি তাঁহাকে যুবতীর কথা বলিলাম, তিনি কিয়ৎক্ষণ রহস্য করিলেন, তাহার পর বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছি; সে এ জঙ্গল অতিক্রম করিতে পারে নাই, পথেই মরিয়াছে; এ কথা সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, আমার বড়ই কষ্ট হইল; আমি কেবল অহঙ্কারের চাতুরীতে পড়িয়া "খাঁ সাহেব" কথায় চটিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে একদিন আপনার অহঙ্কারে আপনি হাসিব।

সাহেবকে বিদায় দিয়া অপরাহ্নে যুবতীর কথা ভাবিতে ভাবিতে পাহাড়ের দিকে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে কতকগুলি কোলকন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা "দাড়ি" হইতে জল তুলিতেছিল। এই অঞ্চলে জলাশয় একেবারে নাই, নদী শীতকালে একে বারে শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়, সুতরাং গ্রামালোকেরা এক এক স্থানে "পাতকুয়ার" আকারে ক্ষুদ্র খাত খনন করে—তাহা দুই হাতের অধিক গভীর করিতে হয় না—সেই খাতে জল ক্রমে ক্রমে চুঁইয়া জমে, আট দশ কলস তুলিলে আর কিছু থাকে না, আবার জল ক্রমে আসিয়া জমে। এই ক্ষুদ্র খাদগুলিকে দাড়ি বলে।

কোলকন্যারা আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একটি লম্বোদরী—সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা—মাথায় পূর্ণ কলস দুই হস্তে ধরিয়া হাস্যমুখে আমায় বলিল, রাত্রে নাচ দেখিতে আসিবেন? আমি মাথা হেলাইয়া স্বীকার করিলাম, অমনি সকলে হাসিয়া উঠিল। কোলের যুবতীরা যত হাসে, যত নাচে, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন জাতির কন্যারা তত হাসিতে নাচিতে পারে না; আমাদের দুরন্ত ছেলেরা তাহার শতাংশে পারে না।

সন্ধ্যার পর আমি নৃত্য দেখিতে গেলাম; গ্রামের প্রান্তভাগে এক বটবৃক্ষতলে গ্রামস্থ যুবারা সমুদয়ই আসিয়া একত্র হইয়াছে। তাহারা "খোঁপা" বাঁধিয়াছে, তাহাতে দুই তিনখানি কাঠের "চিরুণী" সাজাইয়াছে। কেহ মাদল আনিয়াছে, কেহ বা লম্বা লাঠি আনিয়াছে, রিক্তহস্তে কেহই আসে নাই; বয়সের দোষে সকলেরই দেহ চঞ্চল, সকলেই নানা ভঙ্গীতে আপন আপন বলবীর্য্য দেখাইতেছে। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃণ্ময় মঞ্চের উপর জড়বৎ বসিয়া আছে। তাহাদের জানু গ্রাম

স্কন্ধ ছাড়াইয়াছে, তাহারা বসিয়া নানা ভঙ্গীতে কেবল ওষ্ঠক্রীড়া করিতেছে, আমি গিয়া তাহাদের পার্শ্বে বসিলাম।

এই সময় দলে দলে গ্রামস্থ যুবতীরা আসিয়া জমিতে লাগিল; তাহারা আসিয়াই যুবাদিগের প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। উপহাস আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কেবল অনুভবে স্থির করিলাম যে, যুবারা ঠকিয়া গেল। ঠকিবার কথা, যুবা দশ বারটি, কিন্তু যুবতীরা প্রায় চল্লিশজন, সেই চল্লিশজনে হাসিলে হাইলণ্ডের পল্টন ঠকে।

হাস্য উপহাস্য শেষ হইলে, নৃত্যের উদ্যোগ আরম্ভ হইল। যুবতী সকলে হাতি ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রেখা বিন্যাস করিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে বড় চমৎকার হইল, সকলগুলিই সমউচ্চ, সকলগুলিই পাথুরে কাল; সকলেরই অনাবৃত দেহ; সকলের সেই অনাবৃত বক্ষে আরসির ধুক্‌ধুকি চন্দ্রকিরণে এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছে। আবার সকলের মাথায় বনপুষ্প, কর্ণে বনপুষ্প, ওষ্ঠে হাসি। সকলেই আহ্লাদে পরিপূর্ণ, আহ্লাদে চঞ্চল, যেন তেজঃপুঞ্জ অশ্বের ন্যায় সকলেই দেহবেগ সংযম করিতেছে।

সম্মুখে যুবারা দাঁড়াইয়া, যুবাদের পশ্চাতে মৃণ্ময়মঞ্চোপরি বৃদ্ধেরা এবং তৎসঙ্গে এই নরাধম। বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করিলে যুবাদের দলে মাদল বাজিল, অমনি যুবতীদের দেহ যেন শিহরিয়া উঠিল। যদি দেহের কোলাহল থাকে তবে যুবতীদের দেহে সেই কোলাহল পড়িয়া গেল, পরেই তাহারা নৃত্য আরম্ভ করিল। তাহাদের নৃত্য আমাদের চক্ষে নূতন; তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, অথচ কেহ চলে না; দোলে না, টলে না। যে যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তালে তালে পা ফেলিতে লাগিল, তাহাদের মাথার ফুলগুলি নাচিতে লাগিল, বুকের ধুক্‌ধুকি দুলিতে লাগিল।

নৃত্য আরম্ভ হইলে পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ হইতে কম্পিত কণ্ঠে একটি গীতের "মহড়া" আরম্ভ করিল, অমনি যুবারা সেই গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে যুবতীরা তীব্র তানে "ধুয়া" ধরিল। যুবতীদের সুরের ঢেউ নিকটের পাহাড়ে গিয়া লাগিতে লাগিল। আমার তখন স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল যেন সুর কখন পাহাড়ের মূল পর্য্যন্ত, কখন বা পাহাড়ের বক্ষ পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকিতেছে। তাল পাহাড়ে ঠেকা অনেকের নিকট রহস্যের কথা কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে, আমার লেখা পড়িতে গেলে এরূপ প্রলাপ বাক্য মধ্যে মধ্যে সহ্য করিতে হইবে।

যুবতীরা তালে তালে নাচিতেছে, তাহাদের মাথার বনফুল সেই সঙ্গে উঠিতেছে নামিতেছে, আবার সেই ফুলের

ছুটি একটি ঝরিয়া তাহাদের স্কন্ধে পড়িতেছে। শীতকাল নিকটে দুই তিন স্থানে হুহু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, অগ্নির আলোকে নর্ত্তকীদের বর্ণ আরও কাল দেখাইতেছে; তাহারা তালে তালে নাচিতেছে, নাচিতে নাচিতে ফুলের পাপড়ির ন্যায় সকলে এক এক বার "চিতিয়া" পড়িতেছে; আকাশ হইতে চন্দ্র তাহা দেখিয়া হাসিতেছে, আর বটমূলের অন্ধকারে বসিয়া আমি হাসিতেছি।

নৃত্যের শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে পারিলাম না; বড় শীত অধিকক্ষণ থাকা গেল না।

প্রঃ মাঃ বঃ।

রস।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রস নয়টি। আদি, হাস্য, করুণ, বীর, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত। ইহাদের মধ্যে স্ত্রীবিষয়ক রতি আদিরসের স্থায়ী ভাব; হাস হাস্যরসের স্থায়ী ভাব; শোক করুণরসের স্থায়ী ভাব; উৎসাহ বীররসের স্থায়ী ভাব; বিস্ময় অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব; ভয়, ভয়ানকরসের স্থায়ী ভাব; জুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা বীভৎসরসের স্থায়ী ভাব; ক্রোধ, রৌদ্ররসের স্থায়ী ভাব এবং নির্ব্বেদ শান্তরসের স্থায়ী ভাব। আলঙ্কারিকেরা বলেন, পূর্ব্বোক্ত স্থায়ী ভাবসকল প্রকৃষ্টরূপে আস্বাদ্যমান হইলে তাহাকেই রস কহে।

তাঁহারা মনের ভাবসকলকে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন, কিন্তু কোনস্থলেই কি নিয়মে ভাগ করিয়াছেন, তাহা বলেন নাই। তাঁহাদের মতে কখন কখন স্থায়ী ভাবও সঞ্চারী ভাব হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতে স্থায়ী ভাব নয়টির অধিক হইতে পারে না, সুতরাং রসও নয়টির অধিক হইতে পারে না। প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের মনে যাহাই থাকুক না, আধুনিক আলঙ্কারিকেরা নবাধিক রস স্বীকারে একান্ত অসম্মত।

তাঁহাদের মতে প্রত্যেক রসের দেবতা আছে ও প্রত্যেক রসের রূপও আছে। তাঁহাদের মতে আদিরস শ্যামবর্ণ, উহার দেবতা বিষ্ণু। হাস্যরস শ্বেতবর্ণ, উহার দেবতা প্রমথ। রৌদ্ররস রক্তবর্ণ, উহার দেবতা রুদ্র। বীররস হেমবর্ণ, উহার দেবতা মহেন্দ্র। বীভৎসরস নীলবর্ণ, উহার দেবতা মহাকাল। ভয়ানক রস কৃষ্ণবর্ণ, উহার দেবতা কাল। অদ্ভুতরস পীতবর্ণ, উহার

দেবতা গন্ধর্ব্ব। শান্তরস কুন্দেন্দুসুন্দরচ্ছায় অর্থাৎ উহার কান্তি কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, উহার দেবতা শ্রীনারায়ণ। করুণরস কপোতবর্ণ অর্থাৎ পারাবতের গলদেশের বর্ণের ন্যায় উহার বর্ণ, উহার দেবতা যম।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের রসপরিচ্ছেদ পাঠ করিলে, কতকগুলি প্রশ্ন স্বতই আমাদের মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা রস কাহাকে বলিতেন? মনের অসংখ্য ভাবের মধ্যে নয়টিকে বাছিয়াই স্থায়ী ভাব বলিলেন কেন? এই নয়টি ভিন্ন, আরও অনেকগুলি ভাব ত মনোমধ্যে স্থায়ী হইতে পারে। স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগ রস হইল; কিন্তু অনুরাগ কি স্ত্রীভিন্ন অপর কাহারও প্রতি বর্ত্তিতে পারে না? না, বর্ত্তিলে স্থায়ী হইতে পারে না? আমরা ত দেখিতেছি অপত্যস্নেহ, বন্ধুতা, পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, রাজভক্তি প্রভৃতি অনুরাগের নানা অঙ্গ, এবং সকলগুলিই স্থায়ী। যদি স্ত্রীবিষয়ক অনুরাগভিন্ন রস না হয়, তাহা হইলে স্বদেশানুরাগোদ্দীপক বাঙ্গালাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট গ্রন্থাবলী নীরস অথবা নীচরস বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে আমরা এই প্রস্তাবে রস কি? ও রস কেন নয়টি হইল? তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রস কি? এ সম্বন্ধে সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের বিস্তর মতভেদ আছে। রসের কার্য্যের নাম অনুভাব, কারণের নাম বিভাব। উহা দুইপ্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। যাহাভিন্ন রসোৎপত্তি হয় না, তাহার নাম আলম্বন। যাহাতে প্রাবল্য জন্মে তাহার নাম উদ্দীপন। রসের সঙ্গে সঙ্গে যে অন্যভাবের উদ্দীপন হয় তাহার নাম সঞ্চারী। আদিরসের স্ত্রী আলম্বন চন্দ্রকিরণ মলয় পবনাদি উদ্দীপন, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি অনুভাব উহাতে হাস্য প্রভৃতি যে নানা ক্ষণস্থায়ী ভাবের উদয় হয় তাহার নাম সঞ্চারী।

ভট্টলোল্লট প্রভৃতি বলেন, ললনা, উদ্যান প্রভৃতি কারণজনিত অনুরাগাদি স্থায়ীভাব, কটাক্ষ, ভ্রূক্ষেপ প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা প্রতীতিযোগ্য, এবং নির্ব্বেদাদি সহকারী ভাব দ্বারা উপচিত হয়। উহা মুখ্যরূপে প্রকৃত রামাদিতেই থাকে। কিন্তু কেহই স্বরূপ অনুসন্ধান করেন না বলিয়াই কাব্যস্থ রামাদিতেও আছে বোধ হয়, তখনই উহার নাম রস। এই মতে বিভাবাদি দ্বারা অনুরাগাদির অনুমান হয়।

শ্রীশঙ্কুক বলেন, সম্যক্ জ্ঞান, মিথ্যা জ্ঞান, সংশয় ও সাদৃশ্যজ্ঞান (যথা রামই এই, এই রাম; উত্তরকালে এ রাম নয়, এরূপ বাধা সম্ভাবনাসত্ত্বে এই রাম, এ ব্যক্তি রাম হইতেও পারে, নাও পারে; এ রামসদৃশ) এই যে চারিপ্রকার জ্ঞান আছে তৎসমুদয় হইতে পৃথক্ কোন চিত্রিত তুরঙ্গ দেখিয়া তুরঙ্গজ্ঞানের ন্যায়

নর্ত্তককে রাম বলিয়া প্রতীতি হইলে,সে যখন শিক্ষা, অভ্যাস, নৈপুণ্যবলে—

এই সে আমার দেহে সুধারসচ্ছটা
কর্পূর শলাকারাশি নয়নযুগলে
মূর্ত্তিমতী মনোরথ লক্ষীস্বরূপিণী
প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরে দেখা দিলে

দৈবক্রমে ত্যজি মোরে চপলনয়না
গেল চলি প্রাণপ্রিয়া সহাস্যবদনা
অমনি বিষম কাল হল উপস্থিত
অবিরল হয় যাহে জলদগর্জ্জিত

ইত্যাদি করুণ বাক্যদ্বারা কারণ, কার্য্য ও সহকারী ভাবসমূহ প্রকাশ করে, (ইহারই নাম বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব) তখন তাহারা কৃত্রিম হইলেও লোকে কৃত্রিম বলিয়া অনুমান করিতে পারে না; এবং সেই সকল কার্য্য কারণাদির দ্বারা অনুরাগাদির অনুমান করে। অনুরাগাদি যদিও নর্ত্তকে নাই, তথাপি সামাজিকদিগের মনে উহা আছে বলিয়া আস্বাদ্যমান হয়। অন্য অনুমান হইতে অনুরাগাদির অনুমানের বিশেষ এই যে, বস্তু সৌন্দর্য্যবলে, এবং আস্বাদ্যমান বলিয়া উহা অনুমান বলিয়াই বোধ হয় না। প্রত্যক্ষ বলিয়া বোধ হয়, এই মতে নর্ত্তকের ভাব দেখিয়া সীতাবিষয়ক রামের অনুরাগ আমরা এক প্রকার সাক্ষাৎকারে দেখিতে পাই।

ভট্টনায়ক বলেন, "অনুরাগাদি রামে আছে আমি দেখিতেছি, অথবা আমাতে আছে আমিই অনুভব করিতেছি এই উভয়প্রকার সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক। কিন্তু কাব্য ও নাটকপাঠে ভাবকত্ব নামে একটি ব্যাপার (মনের কার্য্য) উৎপত্তি হয় এবং উহার দ্বারা বিভাবাদি সাধারণীকৃত হয়, (অর্থাৎ ঐ ব্যাপার দ্বারা রাম সীতা জ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র স্ত্রী পুরুষ নায়িকা জ্ঞান থাকে।) ঐ ভাবকত্ব ব্যাপারে অনুরাগাদিকে উপস্থিত করে সেই অনুরাগাদি আস্বাদ্যমান হয়। আস্বাদ সময়ে রজঃ ও তমঃ গুণ অতিক্রম করিয়া সত্বগুণ প্রবল হয়। তখন স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানমাত্র বর্ত্তমান থাকে। এই স্বপ্রকাশ আনন্দময় জ্ঞানস্বরূপ রসাস্বাদের নাম ভোগ বা ভোজকত্ব ব্যাপার।" এই মতে মানুষের মনে ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে দুইটি ব্যাপার আছে। প্রথমটির দ্বারা অনুরাগ কারণ সকল সাধারণরূপে প্রতীত হয়, দ্বিতীয়টির দ্বারা উহাদের আস্বাদগ্রহণ করা যায়।

আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলেন, "যাহারা সর্ব্বদা প্রমদাদিসহকারে অনুরাগাদির অনুমান করিতে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে, এরূপ সামাজিকেরা কাব্য বা নাটক পাঠ করিলে পূর্ব্বোক্ত বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারী ভাব কারণ, কার্য্য, এবং সহকারিতা পরিহার করিয়া অলৌকিক বিভাবাদিরূপে পরিণত হয়। তখন এই সকল বিভাবাদি আমার অথবা শত্রুর অথবা উদাসীনের অথবা আমার নয়,

শত্রুর নয়, অথবা উদাসীনের নয়, এরূপ সম্বন্ধবিশেষে প্রতীত হয় না। সম্বন্ধশূন্য সাধারণভাবে উহা অভিব্যক্ত হইয়া সামাজিকদিগের মনে অবস্থিত হয়। যদিও উহা নিয়মিত প্রমাতৃগত তথাপি সাধারণ উপায়বলে তৎকালে উহার নিয়মিত প্রমাতৃভাব বিগলিত হয়। তখন প্রমাতার জ্ঞানান্তর সম্পর্কশূন্য অপরিমিত ভাবের উদয় হয়। তিনি যেন সকল হৃদয়েরই সংবাদ অবগত হইতে পারেন। তখন পূর্ব্বোক্ত অনুরাগাদি জ্ঞান হইতে অভিন্ন হইলেও যেন নিজ আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আস্বাদই উহার প্রাণ। বিভাবাদির অবধিই উহার জীবনের অবধি। যেমন পানক রস নামক মোদকে মরীচ থাকিলেও তাহার আস্বাদ নষ্ট হয় না, অনুরাগাদির আস্বাদও তদ্রূপ বিরোধী কারণে বিকৃত হয় না। উহা যেন সম্মুখে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ আলিঙ্গন করিতে থাকে, অন্য সমস্ত তিরোহিত করে। যেন ব্রহ্মাস্বাদ অনুভব করাইয়া দেয়। ভূলোকদুর্লভ চমৎকার উৎপন্ন করে। তখন উহার নাম রস হয়।"

এই মতেও ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামে ব্যাপারদ্বয় স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ভট্টনায়কের মতের উপর কিছু উন্নতি মাত্র। ইঁহার মতে অলৌকিক ব্যাপার দ্বারা রসনিষ্পত্তি হয়। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও মুখ্যকল্পে এই মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

ভাবকত্ব ব্যাপারটি কি? উহার স্বরূপ কি? কার্য্য কি? জানা আবশ্যক। ন্যায়মতে করণের কার্য্যকে ব্যাপার বলে। যথা দাত্রের পতন উহার ব্যাপার। সংস্কৃতমতে মন জ্ঞানের করণ। মনের কার্য্যের নাম উহার ব্যাপার। ভাবকত্ব মনের কার্য্য, এই কার্য্য দ্বারা পরিমিত ব্যক্তিগত শোকাদি সাধারণরূপে প্রতীত হয়।

ভোজকত্ব ব্যাপার শব্দেও মনের কার্য্য বুঝায়। মনের যে কার্য্যদ্বারা কাব্যরসের আস্বাদগ্রহ হয়, যাহাতে চিত্ত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে, তাহার নাম ভোজকত্ব ব্যাপার।

ইউরোপীয়দিগের মতে মন জ্ঞানোপলব্ধির করণ নহে উহাই কর্ত্তা। সংস্কৃতমতে আত্মা কর্ত্তা, মন করণ। ইদানীন্তন ইউরোপীয়েরা মন ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মনোবৃত্তিসমূহ তিনভাগে বিভক্ত। বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতা। হৃদয়বৃত্তিসমূহের মধ্যে তাঁহাদের মতে কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহার নাম (Esthetic faculty) বা সৌন্দর্য্যগ্রাহবৃত্তি। অভ্যাসবলে এই বৃত্তি পরিপুষ্ট হইলে উহার দ্বারা আমরা সুন্দর বস্তুকে সুন্দর বলিয়া বুঝিতে পারি এবং তাহার আস্বাদও গ্রহণ করিতে পারি। এই সৌন্দর্য্যগ্রাহকতাবৃত্তি আমা-

দিগের ভোজকত্ব ব্যাপার। আমরা যাহাকে ভাবকত্ব ব্যাপার বলি, ইংরেজেরা তাহা মানেন না। কবিরা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করেন। আমরা তাহার আস্বাদ গ্রহণ করি। যাহার সৌন্দর্য্যগ্রাহকতাবৃত্তিসমূহ যত পরিপুষ্ট সে সেই পরিমাণে তাহার আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে।

সৌন্দর্য্যগ্রহ ও রসগ্রহ যদি একই হইল, তবে রস নয়টী হয় কেন? সৌন্দর্য্য অশেষবিধ, সুতরাং রসও অশেষ বিধ হওয়া উচিত। যদি বল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য রস নহে কেবলমাত্র আন্তরিক সৌন্দর্য্যই রস। বাহ্যবস্তু সমূহ—আকাশ, নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দর, পুরী, হর্ম্ম্য প্রভৃতিগত সৌন্দর্য্য রস নহে কেবল মনের অনুরাগাদি ভাবসমূহগত সৌন্দর্য্যই রস, তাহা হইলেও বাহ্যবস্তুগত সৌন্দর্য্য যখন আস্বাদের বিষয় হইতে পারে তখন উহা কেন রস হইবে না ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। যদিও কেবল মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য্যকেই রস বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে উহা কেন যে নয়টীমাত্র হইবে বুঝিতে পারিলাম না। মনোবৃত্তি অসংখ্য। সুতরাং রসও অসংখ্য হওয়া উচিত। যখন যে মনোবৃত্তিগত সৌন্দর্য্য আস্বাদনীয় হয় তখন তাহাই রস হইবে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নয়টী স্থায়ী এবং ত্রেত্রিশটী সঞ্চারী ভাব স্বীকার করিলে ম্যাক্‌বেথের রাজ্যতৃষ্ণা, হ্যামলেটের অনুৎসাহময় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি, প্রস্‌পেরোর উদারচরিত্রতা, ম্যানফ্রেডের মানবজাতির প্রতি ঘৃণা, রসের মধ্যেই পড়ে না। অথচ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই সংস্কার এই যে, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থচতুষ্টয়ই রসাংশে পৃথিবীর সমস্ত কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব আমাদের মতে মনের যে বৃত্তি সুন্দররূপে লিখিত হইতে পারে, তাহারই নাম রস। কেবল একজন মাত্র সংস্কৃত আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য বা চমৎকারকেই রস বলিয়াছেন।

রসে সারঃ চমৎকারঃ সর্ব্বত্রৈবানুভূয়তে
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্রৈবাদ্ভুতো রসঃ॥
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসং।

কিন্তু নারায়ণের মত সংস্কৃত আলঙ্কারিকমণ্ডলীমধ্যে তাদৃশ সমাদৃত হয় নাই।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা যে নয়টি মাত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন কেন, সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, যখন অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল তৎকালে প্রচলিত গ্রন্থাদিমধ্যে এই নয়প্রকার ভাবেরই প্রাধান্য দেখিয়া তাঁহারা কাব্যের নয়টি মাত্র রস নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় এক এক সময়ে সামাজিক অবস্থা অনুসারে এক একপ্রকার লিখনপ্রণালী প্রচলিত হয়। কখন নাটকের বহুল প্রচার হয়, কখন গীতিকাব্যের, কখন উপন্যাসের, কখন নবন্যাসের, কখন বা মহাকাব্যের।

সামাজিক অবস্থা অনুসারে লোকে ভিন্ন ভিন্নবিষয়ক গ্রন্থাদিপড়িতে ভালবাসে। কখন যুদ্ধবিষয়িণী কবিতা, কখন প্রণয়ের প্রবন্ধ, কখন শোকোদ্দীপক প্রস্তাব, কখন ধর্ম্মগ্রন্থ, ইত্যাদি ইত্যাদি। মধ্যসময়ে ইউরোপখণ্ডে প্রণয় ও যুদ্ধের কাব্যই অধিক সমাদৃত হইত। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে প্রণয় ও স্বদেশানুরাগই অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হয়। এরূপ অলঙ্কারগ্রন্থ প্রণীত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে কখন প্রণয়, কখন যুদ্ধ, কখন পরিহাস, কখন শোক, কখন বিস্ময়, কখন ঘৃণা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাদি অধিক পরিমাণে লিখিত ও পঠিত হইত। আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা যখন অলঙ্কারশাস্ত্র লিখিতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের বোধ হইয়াছিল যে, এই নয়প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া গ্রন্থ লিখিতে পারিলেই উহা জনসমাজে বিশেষরূপে আদৃত হইবে, এই জন্য তাঁহারা উক্ত নয়টিকেই প্রধান ভাব বা রসমধ্যে স্থির করিয়াছেন। নচেৎ এই নয়টিকেই উচ্চস্থান দিবার আর কোন কারণ দেখা যায় না।

বাঙ্গালা ভাষা।

বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে গেলে প্রথমতঃ রচনাপ্রণালী লইয়া বড়ই গোল বাঁধে। একদল, জনমেজয় যেমন সর্প দেখিলেই আহুতি দিতেন, সেইরূপ পারসী কথা দেখিলেই তাহাকে তাহার আহুতি দেন। আর একদল আছেন, তাঁহারা সংস্কৃত কথার প্রতি সেইরূপ সদয়। কেহ ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষার কথা দেখিলেই চটিয়া উঠেন, প্রবন্ধের মধ্যে হাজার ভাল জিনিস থাকুক, আর পড়েন না। আবার কেহ আছেন যেই দেখিলেন, দুই পাঁচটি সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার হইয়াছে, অমনি সে গ্রন্থ অপাঠ্য বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। এখন আমরা গরীব, দাঁড়াই কোথা? আমরা ইংরেজি পড়ি আমাদের অর্দ্ধেক ভাবনা ইংরেজিতে। আমরা কলম ধরিলেই ইংরেজি কথায় ইংরেজি ভাব আইসে। সংস্কৃত আমরা যা পড়ি, তাতে সে ভাব ব্যক্ত হয় না। বাঙ্গালার বিদ্যা বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, আর বঙ্কিমবাবুর নবেল কয়খানি। তাতেও ত কুলায় না। নূতন কথা পড়ি এমন ক্ষমতাও নাই। তবে আমাদের কি হইবে। হয় কলম ছাড়িতে হয়, না হয় যেরূপে পারি মনের ভাব

ব্যক্ত করিয়া দিতে হয়। নিজের কথায় নিজের ভাব আমি ব্যক্ত করিব, তাহাতে অন্যের কথা কহার স্বত্ব কতদূর আছে জানি না। কিন্তু, পূর্ব্বোক্ত দুই দলের লোক দুইদিক্ হইতে কুঠার লইয়া তাড়া করেন। সুতরাং এক এক সময়ে বোধ হয় " * * * তত্র মৌনং হি শোভতে" কিন্তু আবার যখন অঙ্গুলিকণ্ডূয়ন উপস্থিত হয়, তখন না লিখিয়াও থাকিতে পারি না। বিশেষ এই যে, যখন কর্ত্তব্যবোধে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তখন পাঁচজনের কথায় তাহা হইতে নিরস্ত হওয়া নিতান্ত কাপুরুষের কাজ। যে কোন ভাষাই হউক, যে কোন রচনাপ্রণালীতেই হউক, যদি দুটা ভাল কথা বলিতে পারি, পাঁচজনের ভয়ে চুপ করিয়া থাকিব কেন?

তবে ভাল কথা বলিতে যদি মন্দ কথা বলি, তাহা হইলে পাঁচজনের গালাগালি দিবার বাস্তবিক অধিকার আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকগণ কথাটা ভাল কি মন্দ সেদিকে লক্ষ্যও করেন না। নাই করুন, কথাটা ভাল করিয়া বলা হইয়াছে কি না, তাহাও দেখেন না। দেখেন কেবল লেখার মধ্যে বড় বড় সংস্কৃত কথা আছে কি পারসী ও ইংরেজি শব্দ আছে। মারামারি করেন কেবল তাহাই লইয়া। সুতরাং আমার মত ক্ষুদ্র লেখকবর্গের সেই বিষয়েই দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। তাহাতেও গোলযোগ। যখন দুই দল দুইদিক ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন, তখন উভয়দলের মন রক্ষা করা অসম্ভব। অথচ যে দলের মনরক্ষা না হইবে, তিনিই কুঠার উত্তোলন করিয়া লেখকের প্রতি ধাবমান হইবেন। এ অবস্থায় লেখকবেচারা বিষম সমস্যায় পড়িয়া যায়।

এ সমস্যার কি পূরণ হয় না? এ সঙ্কট হইতে কি পরিত্রাণের উপায় নাই? বঙ্গীয়লেখককুল কি এই প্রতিকূল বাত্যায় ভগ্নপোত হইয়া অপার সমুদ্রে ভাসিবেন? তাঁহারা কি কূলে উঠিতে পারিবেন না? সমালোচকদিগের এই বিষম রোগের কি উপশম হইবে না? উপশম নাই হউক, ইংরেজিতে বলে রোগের নির্ণয় অর্দ্ধেক উপশম। এ রোগের কারণনির্ণয়ের কি কিছুই চেষ্টাও হইবে না।

অনেকগুলি সুচিকিৎসকের সহিত বিশেষ পরামর্শ করিয়া আমরা ইহার কতক কারণ ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি বলিতে পারি না। কতক অনুভব করিয়াছি। যাহা বুদ্ধিস্থ হইয়াছে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এস্থলে কুঠারের ভয় করিলে চলিবে না। যদি আর কেহ অন্যহেতুপ্রদর্শন করিতে পারেন, নিরতিশয় আনন্দসহকারে শ্রবণ করিব।

কথাটি এই যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত

বাঙ্গালা ভাষায় লেখনীধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙ্গা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই, সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে না আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

এখন তাঁহাদের বই পড়িয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহাদের যথার্থ মাতৃভাষার জ্ঞান সুদূরপরাহত হইয়াছে। অথচ ইঁহারাই যখন লেখনীধারণ করেন, তখন মনে করেন যে, আমার বাঙ্গালা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাঙ্গালা তিনি এবং তাঁহার পারিষদবর্গ বুঝিল, আর কেহ বুঝিল না। কেমন করিয়া বুঝিবে! সে ত দেশীয় ভাষা নহে। সে অনুবাদকদিগের কপোলকল্পিত ভাষার উচ্ছিষ্ট মাত্র। দেশের অধিকাংশ লোকই উচ্ছিষ্টভোজনে জাতিপাতের ভয় করে অথচ লেখকমহাশয়েরা তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন মূর্খ বলিয়া উপহাস করেন। এই গেল একদলের কথা :—

আবার যখন অনুবাদকদিগের এইরূপ দীর্ঘ ছন্দ সংস্কৃতের "নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্নের" নদ, নদী, পর্ব্বত, কন্দরের অসম্ভব বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল, যখন সংস্কৃত, ইংরেজি পড়া অপেক্ষা বাঙ্গালা পড়ায় অভিধানের অধিক প্রয়োজন হইয়া পড়িল, তখন কতকগুলি লোক চটিয়া বলিলেন, এ বাঙ্গালা নয়। বলিয়া তাঁহারা যত চলিত কথা পাইলেন, তাহাই লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের সংখ্যা অল্প, কিন্তু ইঁহারা সংস্কৃতের সং পর্য্যন্ত শুনিলে চটিয়া উঠেন। এমন কি ইঁহারা সংস্কৃতমূলক শব্দ ব্যবহার করিতে রাজি নন। অপভ্রংশ শব্দ, ইংরেজিশব্দ, পারসীশব্দ ও দেশীয়শব্দের দ্বারা লিখিতে পারিলে সংস্কৃতশব্দ প্রাণান্তেও ব্যবহার করেন না। এই গেল আর একদলের কথা। সুতরাং এই উভয় দল যে পরস্পর বিরোধী হইবেন, এবং বঙ্গীয় লেখকগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন, আপত্তি কি।

আমরা যে পূর্ব্বে লিখিয়াছি বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা এ পর্য্যন্ত লেখনীধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা। আমরা ইতিহাস দ্বারা এইটি সমর্থন করিব।

সকলেই জানেন অতি অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় গদ্যগ্রন্থ ছিল না, কিন্তু পদ্য প্রচুর ছিল। ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যে সকল পদ্য লিখিত হইয়াছিল, তাহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, অনুবাদ করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে দু পাঁচটি অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ থাকিলেও উহা প্রধানতঃ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা

কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতি কবিগণের লেখা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। গদ্য না থাকিলেও ভদ্রসমাজে যে ভাষা প্রচলিত থাকে তাহাকেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা কহে। আমাদের দেশে সেকালে ভদ্রসমাজে তিনপ্রকার বাঙ্গালা ভাষা চলিত ছিল। মুসলমান নবাব ও ওমরাহদিগের সহিত যে সকল ভদ্রলোকের ব্যবহার করিতে হইত, তাঁহাদের বাঙ্গালায় অনেক উর্দ্দূশব্দ মিশান থাকিত। যাঁহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের ভাষায় অনেক সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত। এই দুই ক্ষুদ্রসম্প্রদায় ভিন্ন বহুসংখ্যক বিষয়ী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাঙ্গালায় উর্দ্দূ ও সংস্কৃত দুই মিশান থাকিত। কবি ও পাঁচালীওয়ালারা এই ভাষায় গীত বাঁধিত। মোটামুটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বিষয়ী লোক, ও আদালতের লোক এই তিন দল লোকের তিন রকম বাঙ্গালা ছিল। বিষয়ী লোকের যে বাঙ্গালা তাহাই পত্রাদিতে লিখিত হইত, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ঐরূপ বাঙ্গালা শিখিলেই যথেষ্ট জ্ঞান করিত।

ইংরেজেরা এদেশ দখল করিয়া ভাষার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা বহুসংখ্যক আদালত স্থাপন করায় এবং আদালতে উর্দ্দূ ভাষা প্রচলিত রাখায় বাঙ্গালাময় পারসী শব্দের কিছু অধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল মাত্র। সাহেবেরা পারসী শিখিতেন, বাঙ্গালা শিখিতেন। দেশীয়েরা দেশীয় ভাষায় তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেন। সুতরাং ইংরেজি কথা বাঙ্গালার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। যাঁহারা ইংরেজি শিখিতেন বা ইংরেজের সহিত অধিক মিশিতেন দেশের মধ্যে প্রায়ই তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রভুত্ব থাকিত না।

কথক মহাশয়েরা বহুকালাবধি বাঙ্গালায় কথা কহিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা সংস্কৃতব্যবসায়ী কিন্তু তাঁহারা যে ভাষায় কথা কহিতেন তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ বিষয়ী লোকের ভাষা। কেবল জন্মকাল বর্ণনাস্থলে ও সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাস্থলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ভাষার অনুসরণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে যে সময়ে ইংরেজ মহাপুরুষেরা বাঙ্গালীদিগকে বাঙ্গালা শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন, সেই সময়ে যে সকল পণ্ডিতের সহিত তাঁহাদের আলাপ ছিল তাঁহারা সংস্কৃত কালেজের ছাত্র। তখন সংস্কৃত কালেজ বাঙ্গালায় একঘরে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাঁহাদিগকে যবনের দাস বলিয়া সঙ্গে মিশিতে দিতেন না। তাঁহারা যে সকল গ্রন্থাদি পড়িতেন তাহা এ দেশমধ্যে চলিত ছিল না। এমন কি দেশীয় ভদ্রসমাজে তাঁহাদের কিছুমাত্র আদর ছিল না। সুতরাং তাঁহারা দেশে কোন্ ভাষা চলিত কোন্ ভাষা অচলিত, তাহার কিছুই বুঝিতেন না। হঠাৎ তাঁহাদিগের উপর বাঙ্গালা পুস্তক

প্রণয়নের ভার হইল। তাঁহারাও পণ্ডিত-স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতাসহকারে বিষয়ের গুরুত্ব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া লেখনীধারণ করিলেন।

পণ্ডিতদিগের উপর পুস্তক লিখিবার ভার হইলে তাঁহারা প্রায়ই অনুবাদ করেন। সংস্কৃত কালেজের পণ্ডিতেরাও তাহাই করিলেন। তাঁহারা যে সকল অপ্রচলিত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন তাহারই তর্জ্জমা আরম্ভ করিলেন। রাশি রাশি সংস্কৃতশব্দ বিভক্তিপরিবর্জ্জিত হইয়া বাঙ্গালা অক্ষরে উত্তম কাগজে উত্তমরূপে মুদ্রিত হইয়া পুস্তকমধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। যিনি কাদম্বরী তর্জমা করিয়াছিলেন, তিনি লিখিলেন, "একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরবে অরণ্যানী কোলাহলময় হইলে, নবোদিত রবির আতপে গগনমণ্ডল লোহিতবর্ণ হইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ত অন্ধকাররূপ ভস্মরাশি দিনকরের কিরণরূপ সম্মার্জ্জনী দ্বারা দূরীকৃত হইলে, সপ্তর্ষিমণ্ডল অবগাহনমানসে মানসসরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শাল্মলীবৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।" আমরা পূর্ব্বে যে তিন ভাষার উল্লেখ করিয়াছি, ইহার সহিত তাহার একটিরও সম্পর্ক নাই।

এ ত গেল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ। ইংরেজি হইতে অনুবাদ একবার দেখুন, "পাঠশালার সকল বালকই, বিরামের অবসর পাইলে, খেলায় আসক্ত হইত; কিন্তু তিনি সেই সময়ে নিবিষ্টমনা হইয়া, ঘরট্ট প্রভৃতি যন্ত্রের প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিতেন। একদা, তিনি একটা পুরান বাক্স লইয়া জলের ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘড়ীর শঙ্কু বাক্সমধ্য হইতে অনবরত বিনির্গত জলবিন্দুপাতের দ্বারা নিমগ্ন কাষ্ঠখণ্ডপ্রতিঘাতে পরিচালিত হইত; বেলাববোধনার্থ তাহাতে একটি প্রকৃত শঙ্কুপট্ট ব্যবস্থাপিত ছিল।" ইংরেজি পড়িলে বরং ইহা অপেক্ষা সহজে বুঝা যাইতে পারে।

এই শ্রেণীর লেখকের হস্তে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির ভার অর্পিত হইল। লিখিত ভাষা ক্রমেই সাধারণের দুর্ব্বোধ ও দুষ্পাঠ্য হইয়া উঠিল। অথচ এডুকেশন ডেস্প্যাচের কল্যাণে সমস্ত বঙ্গবাসী বালক এই প্রকারের পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টির দফা একেবারে রফা হইয়া গেল।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের দেখাদেখি ইংরেজিওয়ালারাও লেখনীধারণ করিলেন। বাঙ্গালায় সংস্কৃত কালেজের ছাত্রেরা যেমন একঘরে ছিলেন, ইংরেজিওয়ালারাও তাহা অপেক্ষা অল্প ছিলেন না। তাঁহারাও পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাঙ্গালা ভাষার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের ভাব ইংরেজিতে মনোমধ্যে উদিত হইত, হজম করিয়া নিজ কথায় তাহা ব্যক্ত

করিতে পারিতেন না। নূতন কথা তাঁহাদের গড়্‌বার প্রয়োজন হইত। গড়িতে হইলে নিজ ভাষায় ও সংস্কৃতে যেটুকু দখল থাকা আবশ্যক তাহা না থাকায় সময়ে সময়ে বড়ই বিপন্ন হইতে হইত। উৎপিপীড়িষা, জিজীবিষা, জিঘাংসা,প্রভৃতি কথার সৃষ্টি হইত। "তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরি-নিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিক্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চলশিখানিঃসারিণী লোলায়মানা জ্বালামুখী, বিংশতিসহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃতশাখাপ্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধ বিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত,ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কাসমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘমধ্যাহ্ন, মনঃপ্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত বিশুদ্ধ গগনমণ্ডল ইত্যাদি ভারতভূমিসম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত,চমৎকৃত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা তদীয় উপাসনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন।" এ ভাষায় মন্তব্যপ্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। আমরা বিশেষ যত্নপূর্ব্বক দেখিয়াছি যে, যে বালকেরা এই সকল গ্রন্থপাঠ করে, তাহারা অতি সত্বরেই এই সকল কথা ভুলিয়া যায়। কারণ, এরূপ শব্দ তাহাদিগকে কখনই ব্যবহার করিতে হয় না। আমাদের এক পুরুষপূর্ব্বে লোকের সংস্কার এই ছিল যে, চলিত শব্দ পুস্তকে ব্যবহার করিলে সে পুস্তকের গৌরব থাকে না। সেই জন্য তাঁহারা বরফের পরিবর্ত্তে তুষার, ফোয়ারার পরিবর্ত্তে প্রস্রবণ, ঘূর্ণীর পরিবর্ত্তে আবর্ত্ত, গ্রীষ্মের পরিবর্ত্তে নিদাঘ প্রভৃতি আভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া, গ্রন্থের গৌরবরক্ষা করিতেন। অনেক সময়ে তাঁহাদের ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতেও তত চলিত নহে, কেবল সংস্কৃত অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। ভট্টাচার্য্যদিগের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থকারেরা জানিতেন না, সুতরাং তাঁহাদের গ্রন্থে সে সকল কথা মিলেও না। শুনিয়াছি গ্রন্থকারদিগের মধ্যে দুই পাঁচজন হয়, একখানি অভিধান, না হয় একজন পণ্ডিত সঙ্গে লইয়া লিখিতে বসিতেন।

এই সকল কারণবশতঃ, বলিয়াছিলাম যে, যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাঁহারা ভাল বাঙ্গালা শিখেন নাই। লিখিত বাঙ্গালা ও কথিত বাঙ্গালা এত তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে যে, দুইটাকে

এক ভাষা বলিয়াই বোধ হয় না। দেশের অধিকাংশ লোকেই লিখিত ভাষা বুঝিতে পারে না। এ জন্যই সাধারণ লোকের মধ্যে আজও পাঠকের সংখ্যা এত অল্প। এ জন্যই বহুসংখ্যক সম্বাদ-পত্র ও সাময়িকপত্রিকা জলবুদ্বুদের ন্যায় উৎপন্ন হইয়াই আবার জলে মিশিয়া যায়।

গ্রন্থকারেরা বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়া বাঙ্গালা লিখিতে বসিয়া এবং চলিত শব্দ সকল পরিত্যাগ করিয়া অপ্রচলিত শব্দের আশ্রয় লইয়া ভাষার যে অপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতিকার করা শক্ত। যদি তাঁহাদের সময়ে ইংরেজি ও বাঙ্গালায় বহুল চর্চা না হইত, তাহা হইলে অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রন্থকারদিগের ন্যায় তাঁহাদের নামও কেহ জানিত না। কিন্তু তাঁহাদের সময়ে শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের প্রভাব কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এবং এই কয়বৎসরের মধ্যে ইংরেজির অতিরিক্ত চর্চা হওয়ায় বহুসংখ্যক ইংরেজি শব্দ ও ভাব, বাঙ্গালাময় ছড়াইয়া পড়ায় বিষয়ী লোকের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহার এত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে উহা কিরূপ ছিল, তাহা আর নির্ণয় করিবার যো নাই।

ভট্টাচার্য্য ও কথকদিগের মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা এখনও কতক কতক নির্ণীত হইতে পারে। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোক এত অল্প হইয়া আসিয়াছে যে, সেরূপ নির্ণয় করাও সহজ নহে। গ্রন্থকারদিগের বাঙ্গালা বাঙ্গালা নহে। বিশুদ্ধ বাঙ্গালা কি ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এ অবস্থায় আমাদের মত লেখকের গতি কি? হয়, ইংরেজি, পারসী, বাঙ্গালা, ও সংস্কৃতময় যে ভাষায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনাদি প্রসিদ্ধ ভদ্রসমাজে কথা বার্ত্তা চলে সেই ভাষায় লেখা, না হয়, যাহার যেমন ভাষা যোগায় সেই ভাষায় নিজের ভাব ব্যক্ত করা। এই সিদ্ধান্তের প্রতি যাঁহাদের আপত্তি আছে, তাঁহারা কিরূপ ভাষাকে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা বলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে গরীব লোকের যথেষ্ট উপকার করা হয়। যতদিন না বলিতে পারেন, ততদিন কুঠার আঘাত বিষয়ে তাঁহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই।

গ্রাজুএট—

রত্নরহস্য।

মাণিক্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে "মাণিক্য" সম্বন্ধে অনেক রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট এই প্রস্তাবে সমাপ্ত হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ছায়া অনুসারে একই মাণিক্য পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ছায়া কি? এবং কতপ্রকার? তাহা বলা হয় নাই, কিন্তু তাহা অবশ্য বক্তব্য বিধায় অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ তাহার দোষ, গুণ, পরীক্ষা এবং মূল্যাদির বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইবে।

ছায়া বা বর্ণ।

মুক্তা, মাণিক্য, কি অন্য যে কোন রত্ন হউক, তাহাদের বর্ণ বিশেষই (রঙ্) রত্নশাস্ত্রে "বর্ণ" "ছায়া" "ত্বিট্" "ভাস্" "আভা" প্রভৃতি নানা নামে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাণিক্য রত্নের বর্ণ সম্বন্ধে এইরূপ নির্ব্বাচন করিয়াছেন যে, মাণিক্যরত্নের বহুপ্রকার ছায়া বা বর্ণ থাকিলেও তন্মধ্যে প্রধানতম বর্ণ ১৬ ষোলটী। সেই বর্ণ বা রঙ্ অনুসারে উহা পৃথক্ পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাহাদেরই তারতম্য অনুসারে মাণিক্যরত্নের মূল্যাদির প্রভেদীকৃত হইয়া থাকে। ইহা বিস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য কল্পদ্রুমধৃত যুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল এবং বৃহৎ সংহিতা প্রভৃতির দুই চারিটী প্রমাণও যথাস্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যুক্তিকল্পতরুস্থ প্রমাণ যথা—

"বন্ধুক-গুঞ্জাসকলেন্দ্রগোপ-
জবা-শশাসৃক্-সমবর্ণশোভাঃ।
ভ্রাজিষ্ণবো দাড়িমবীজবর্ণাঃ
তথাপরে কিংশুকপুষ্পভাসঃ॥"
"সিন্দুর পদ্মোৎপল কুঙ্কুমানাং
লাক্ষারসস্যাপি সমানবর্ণাঃ।
সান্দ্রে নিরাগে প্রভয়া স্বয়ৈব
ভান্তি স্বলক্ষ্যা স্ফুটমধ্যশোভাঃ॥"
কুসুম্ভনীলী ব্যতিমিশ্র রাগ-
প্রতাম্র রক্তাম্বরতুল্যভাসঃ।
তথাঽপরেঽক্কস্য কণ্টকারী
পুষ্পত্বিষো হিঙ্গুলকত্বিষোঽন্যে॥"
"চকোর পুংস্কোকিলসারসানাং
নেত্রাবভাসাশ্চ ভবন্তি কেচিৎ।
অন্যে পুনর্ভান্তি বিপুষ্পিতানাং॥
তুল্যত্বিষঃ কোকনদোদরাণাম্॥"

মাণিক্যের "বন্ধূক" বাঁধুলিফুল [১] "গুঞ্জাসকল" গুঞ্জার্দ্ধ অর্থাৎ কাল আধখান ভিন্ন কুঁচ [২] "ইন্দ্রগোপ" বর্ষাকীট [৩] "জবা" জবাফুল [৪] "অসৃক্" শোণিত [৫] এই সকলের সমান বর্ণ এবং ইহাদিগের বর্ণের ন্যায় বর্ণ ও দীপ্তিযুক্ত এবং "দাড়িমবীজ বর্ণ" দাড়িম বীজের বর্ণ (৬) ইহাও প্রায় রক্তবর্ণ "কিংশুক বর্ণ" পলাশ ফুলের বর্ণ [৭] "সিন্দুর" [৮] "পদ্মোৎপল" রক্ত পদ্ম বা রক্তকম্বলনাইল (৯) "কুঙ্কুম" জাফরান (১০) "লাক্ষারস" অলক্তকতুল্যবর্ণ (১১) "কুসুম্ভ" কুসুম ফুল ও "নীলী" নীল রস, এই দুই মিশ্র বর্ণ (১২) "রক্তাম্বর" সায়ংকালের রক্তবর্ণ আকাশ অর্থাৎ সিঁদুরে মেঘের বর্ণ (১৩) "অরুকর পুষ্প" "তেলা" বৃক্ষের ফুল (১৪) "কণ্টকারী পুষ্প" (১৫) "হিঙ্গুল" হিঙ্গুল ধাতুর বর্ণ বা ছায়া (১৬) হইয়া থাকে।

কেহ কেহ বলেন মাণিক্য "চকোর" চকোর পক্ষী, পুরুষ কোকিল ও সারস পক্ষীর চক্ষুর ন্যায় বর্ণযুক্তও হইয়া থাকে। অন্যান্য রত্নতত্ত্ববেত্তারা বলেন অল্প প্রস্ফুটিত কোকনদ অর্থাৎ রক্ত নাইল ফুলের গর্ভস্থ বর্ণের ন্যায় বর্ণও হইয়া থাকে।

বর্ণ অনুসারে মাণিক্যের নাম ও উত্তমাধমাদি ব্যবস্থা।

"সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং
পদ্মরাগ মনুত্তমম্।"
পীতং কানপুরোদ্ভূতং
কুরুবিন্দমিতি স্মৃতম্।"
"অশোকপল্লবচ্ছায়
মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।"
"তুম্বুরে ছায়য়া নীলং
নীলগন্ধি প্রকীর্ত্তিতম্।"
"উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং
নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবম্।"
মধ্যমং মধ্যজং জ্ঞেয়ং
মাণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ।"

সিংহলদেশে যে মাণিক্য জন্মে তাহা রক্তবর্ণ, নাম "পদ্মরাগ" ইহা অপেক্ষা উত্তম কুত্রাপি হয় না। কানপুরদেশজাত* মাণিক্য "পীত" বর্ণ হয় এবং তাহা "কুরুবিন্দ" নামে বিখ্যাত। এই একই মাণিক্য যদি অশোকপল্লবের কান্তির ন্যায় কান্তিযুক্ত হয়, তবে তাহার "সৌগন্ধিক" নাম জানিবে। তুম্বুরদেশজ মাণিক্য কিঞ্চিৎ নীলাভ হয়, তন্নিমিত্ত তাহা "নীল" নামে প্রসিদ্ধ। সিংহলীয় মাণিক্যই অত্যুত্তম। তুম্বুরদেশীয় মাণিক্য অধম এবং কানপুরাদি মধ্যদেশোৎপন্ন মাণিক্য মধ্যম। এইরূপ, ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎ-

* কানপুর? কোন্ কানপুর? যদি আধুনিক কালের সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ কানপুর হয়, তবে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, এখন আর তৎপ্রদেশে কোন রত্নই জন্মে না।

পত্তি স্থানের ভিন্নতা অনুসারে মাণিক্যও বিভিন্ন রূপগুণাদি যুক্ত হইয়া থাকে।

"প্রভাব কাঠিন্য গুরুত্বযোগৈঃ
প্রায়ঃ সমানাঃ স্ফটিকোদ্ভবানাম্।
আনীল রক্তোৎপল চারুভাসঃ
সৌগন্ধিকাখ্যা মণয়ো ভবন্তি॥"

স্ফটিক হইতে একপ্রকার মাণিক্য উৎপন্ন হয়, তাহারা কি প্রভাবে, কি কাঠিন্যে, কি গুরুত্বে সর্ব্বাংশেই জাত্য মাণিক্য তুল্য হইয়া থাকে। সৌগন্ধিক-নামক মণি ঈষৎ নীলাভাযুক্ত রক্তোৎ-পলের ন্যায় মনোহর কান্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

মাণিক্যরত্নের জাতিবিভাগ।

রত্নতত্ত্ববেত্তারা প্রায় সকল রত্নেরই চারিপ্রকার জাতি কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহাও আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি নামে নির্দ্দিষ্ট। এরূপ জাতিকল্পনা করিবার মূল কি? তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, চিন্তা করিয়াও বোধ-গম্য করিতে পারি না। যাহাই হউক, মাণিক্যরত্নের জাতি, যাহা রত্নশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল বৃদ্ধি করিব।

মাণিক্যস্য প্রবক্ষ্যামি
যথা জাতিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ
শূদ্রাশ্চাথ যথাক্রমম্।"
"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্র-
স্তীব্ররক্তস্ত ক্ষত্রিয়ঃ।
রক্ত পীতো ভবেদ্বৈশ্যো
রক্তনীল স্তথান্ত্যজঃ॥"

অর্থ এই যে, যেপ্রকারে মাণিক্যরত্নের চারি জাতি স্থির হয় তাহা বলিতেছি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারিপ্রকার জাতি। যাহা রক্তশ্বেত অর্থাৎ অল্পরক্তিম তাহা ব্রাহ্মণজাতীয় মাণিক্য। যাহা অত্যন্ত লোহিত তাহা ক্ষত্রিয়জাতীয় মাণিক্য, যাহা রক্তপীত অর্থাৎ পীতাভাযুক্ত রক্তিম, তাহা বৈশ্য-জাতীয় এবং যাহা নীল আভাযুক্ত রক্তিম তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয় মাণিক্য।

(এই জাতিবিভাগসাধক বচনাবলীর দ্বারা পূর্ব্বের লিখিত পীতাদি শব্দের অর্থ ইহার অনুরূপ করিয়া লইবেন। অর্থাৎ যেখানে পীতবর্ণ বলা হইয়াছে সেখানে তাহা পরিষ্কার পীত নহে, পীতাভ রক্তিম, এইরূপ অর্থ হইবেক; কেন না রক্তবর্ণ মণিই মাণিক্য ইহা "শোণোপল" প্রভৃতি নামদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।) যুক্তিকল্পতরুগ্রন্থে এই জাতিনির্ব্বাচন সম্বন্ধে বিশেষ উক্তি আছে। যথা—

"পদ্মরাগো ভবেদ্বিপ্রঃ
কুরুবিন্দস্ত বাহুজঃ।
সৌগন্ধিকো ভবেদ্বৈশ্যো
মাংসখণ্ড স্তথাপরে॥"

পূর্ব্বোক্ত পদ্মরাগ-মণিই বিপ্রজাতীয়। কুরুবিন্দনামক মাণিক্য বাহুজ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়জাতীয়। সৌগন্ধিকনামক মা-ণিক্য বৈশ্যজাতীয় এবং মাংসখণ্ডনামক মাণিক্য শূদ্রজাতীয়।

বর্ণের-সাদৃশ্যাদি।

মাণিক্যরত্নের বর্ণের প্রভেদ থাকায় উহা নানা নামে ব্যবহৃত হয় এবং তদনুসারেই জাত্যাদি বিভাগের কল্পনা করা হয়। অতএব মাণিক্যরত্ন সাধারণতঃ রক্তবর্ণ, ইহা স্থির রাখিয়া তাহার প্রভেদ বুঝাইবার জন্য বর্ণান্তরের সহিত সংযোগের কথা বলা হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবেক। যথা—"রক্তশ্বেতো ভবেদ্বিপ্রঃ" ইত্যাদি। সেই মিশ্রবর্ণের যথার্থ ভাব ও অবস্থা বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রক্তিম বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া কোন মাণিক্যের কিরূপ রঙ্ তাহা বুঝান হইয়াছে, পরন্তু রত্নপরীক্ষায় অভ্যাস না থাকিলে কেবল লেখারদ্বারা সে প্রভেদ অনুভব হইতে পারে না! মাণিক্য চেনা সুকঠিন; ব্যবসায়ী ব্যতীত সহস্র লেখাপড়া জানিলেও মাণিক্যের নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হওয়া যায় না। ফল, বচনগুলি উদ্ধৃত না করিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ ও পাঠকবর্গের কুতূহল বিচ্ছিন্ন হইবে বলিয়া সেগুলি লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"শোণপদ্মসমাকারঃ
খদিরাঙ্গারসপ্রভঃ।
পদ্মরাগো দ্বিজপ্রোক্ত-
শ্ছায়াভেদেন সর্ব্বদা।"
"গুঞ্জা সিন্দূর বন্ধূক
নাগরঙ্গসমপ্রভঃ।
দাড়িমী কুসুমাভাসঃ
কুরুবিন্দস্ত বাহুজঃ॥"
"হিঙ্গুলাভা শোকপুষ্পা-
ভমীষৎ পীতলোহিতং।
জবা লাক্ষারস প্রায়ং
বৈশ্যং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।"
"আরক্তঃ কান্তিহীনশ্চ
চিক্কণশ্চ বিশেষতঃ।
মাংসখণ্ডো সমাভাসো-
হন্ত্যজঃ পাপনাশনঃ॥" ইত্যাদি

শোণপদ্ম অর্থাৎ রক্তোৎপল এবং খদিরাঙ্গার (অলন্ত খদিরকাষ্ঠ) সদৃশ ছায়াযুক্ত মাণিক্যের নাম "পদ্মরাগ" এবং তাহা ব্রাহ্মণজাতীয়।

কুঁচ, সিন্দূর, বাঁধলিফুল, নাগরঙ্গ এবং দাড়িমপুষ্পের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত হইলে তাহা "কুরুবিন্দ" ও ক্ষত্রিয়জাতীয়।

হিঙ্গুল, অশোকপুষ্প কি ঈষৎ পীতযুক্ত লোহিত, অথবা জবাপুষ্প কি অলক্তকসদৃশ কান্তিযুক্ত হইলে তাহা "সৌগন্ধিক" ও বৈশ্যজাতি।

অল্প লোহিত, কান্তিবর্জ্জিত কিন্তু চিক্কণগুণযুক্ত মাংসখণ্ডের ন্যায় আভাযুক্ত হইলে তাহা "মাংসখণ্ড" অথবা "নীলগন্ধি" এবং তাহা অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্রজাতীয়।

এতদ্ভিন্ন আটপ্রকার দোষ, চারিপ্রকার গুণ, ষোলপ্রকার ছায়া সমস্তই পূর্ব্ব মাসের বঙ্গদর্শনে বিবৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে সদোষ মাণিক্য ধারণের দুই একটা কলাফল বর্ণন করিয়া পশ্চাৎ পরীক্ষা ও মূল্যাদি নিরূপণ করা যাইবেক।

"যে কর্করা শ্ছিদ্রমলোপদিগ্ধাঃ
প্রভাবিমুক্তাঃ পরুষা বিবর্ণাঃ।
ন তে প্রশস্তা মণয়ো ভবন্তি
সমাসতো জাতিগুণৈঃ সমস্তৈঃ।"
"দোষোপসৃষ্টং মণিমপ্রবোধাৎ
বিভর্ত্তি যঃ কশ্চন কঞ্চিদেকম্।
তং বন্ধুদুঃখায় সবন্ধ বিত্ত-
নাশাদয়ো দোষগণা ভজন্তে।"
"সপত্নমধ্যেঽপি কৃতাধিবাসং
প্রমাদবৃত্তাবপি বর্ত্তমানম্।
ন পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য
ভর্ত্তারমাপৎ সমুপৈতি কাচিৎ॥"
"দোষোপসর্গপ্রভবাশ্চ যে তে
নোপদ্রবা স্তং সমভিদ্রবন্তি।
গুণৈঃ সমুখৈ্যঃ সকলৈরুপেতং
যঃ পদ্মরাগং প্রযতো বিভর্ত্তি।"
[ইত্যাদি]

কর্কর অর্থাৎ কাঁকরযুক্ত, সচ্ছিদ্র, মলিন, বা মললিপ্ত, প্রভাহীন, কর্কশ ও বিবর্ণ হইলে সে মণি অপ্রশস্ত অর্থাৎ ভাল নহে।

যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতও একটি সদোষ মণি ধারণ করে, তাহাকে নানাপ্রকার আপৎ আশ্রয় করে।

শত্রুমধ্যে বাস করিলেও প্রমাদ অবস্থায় অবস্থান করিলেও গুণসম্পন্ন পদ্মরাগমণিধারণকর্ত্তা কদাপি আপদ্‌গ্রস্ত হয় না।

প্রধান প্রধান গুণযুক্ত পদ্মরাগ মণি যদি শুচি ও যত্নবান্ হইয়া ধারণ করা যায়, তাহা হইলে দোষ ও উৎপাত-সম্ভব কোন প্রকার আপদই উপস্থিত হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন আরও অধিক ফলশ্রুতি থাকিলেও বাহুল্যভয়ে পরিত্যক্ত হইল।

পরীক্ষা।

"পদ্মরাগ" প্রভৃতি নামধারী মাণিক্যও একপ্রকার হীরক; সুতরাং হীরক-পরীক্ষাকালে ইহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পরীক্ষা প্রকটিত হইবেক। এক্ষণে সামান্যাকারে কেবলমাত্র জাত্য ও বিজাতীয় এই দুইপ্রকারের ভেদবোধক পরীক্ষা ব্যক্ত করিব। যথা—

"বালার্ককরসংস্পর্শাৎ
যঃ শিখাং লোহিতাং বমেৎ।
রঞ্জয়েদাশ্রয়ং বাপি
স মহাগুণ উচ্যতে।"

নবোদিত সূর্য্যের কিরণস্পর্শে যে পদ্মরাগমণি রক্তবর্ণ শিখা উদ্বমন করে অর্থাৎ যাহা হইতে রক্তিম আভা নিষ্ক্রান্ত হয়, কিম্বা আধারগৃহ রক্তবর্ণে রঞ্জিত করে, সেই পদ্মরাগ মহাগুণশালী।

"দুগ্ধে শতগুণে ক্ষিপ্তো
রঞ্জয়েদ্ যঃ সমন্ততঃ।
বমেচ্ছিখাং লোহিতাং বা
পদ্মরাগঃ স উত্তমঃ।"

শতগুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত করিলে যে পদ্মরাগ সমস্ত দুগ্ধকে রক্তবর্ণ করে কিম্বা রক্তবর্ণ শিখা বমন করে, সেই পদ্মরাগই উৎকৃষ্ট।

"অন্ধকারে মহাঘোরে।
যো ন্যস্তঃ সন্ মহামণিঃ।

প্রকাশয়ন্তি সূর্য্যাত্তঃ
স শ্রেষ্ঠঃ পদ্মরাগকঃ ॥”

যে মহামণি ঘোর অন্ধকারে রাখিলেও সূর্য্যবৎ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় এবং অন্য বস্তুকেও, প্রকাশ করে সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ।

“পদ্মকোষে তু যো ন্যস্তো
বিকাশয়তি তৎক্ষণাৎ।
পদ্মরাগো বরোহ্যেষ
দেবানামপি দুর্লভঃ।”

যাহা পদ্মোদরে স্থাপন করিলে পদ্মটি বিকশিত হয়, সেই পদ্মরাগই শ্রেষ্ঠ ও দেবদুর্লভ।

“চত্বারস্ত ময়োদ্দিষ্টা
গুণিনশ্চ যথোত্তরম্।
সর্ব্বারিষ্টপ্রশমনাঃ
সর্ব্বসম্পত্তিদায়কাঃ ॥”

উল্লিখিত চারিপ্রকার পদ্মরাগ আমি বর্ণন করিলাম, উহারা পর পর অধিক গুণযুক্ত এবং উহারা সকলেই অনিষ্টনাশক ও সকলেই সম্পত্তিবৃদ্ধিকারক।

যো মণির্দৃশ্যতে দূরাৎ
জলদগ্নিসমচ্ছবিঃ।
বংশকান্তিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
সর্ব্বসম্পত্তিকারকঃ ॥”

যে মণি দূর হইতে জলন্ত অগ্নির ন্যায় দৃশ্য হয়, তাহার নাম “বংশকান্তি” এই বংশকান্তি মাণিক্য, ধারণকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি আনয়ন করে।

“পঞ্চ সপ্ত নববিংশতি রাগঃ
শিপ্ত এব সকলং খলু বস্ত্রে।
রঞ্জয়েদ্যমতি বা করজালম্,
উত্তরোত্তর মহাগুণিমন্তে ॥”
“নীলরসং দুগ্ধরসং জলং বা,
যে রঞ্জয়ন্তি দ্বিশতপ্রমাণম্।
তে তে যথাপূর্ব্ব মতিপ্রশস্তাঃ
সৌভাগ্য সম্পত্তি বিধানদায়কাঃ।”

যে মণি আপনার ওজন অপেক্ষা দুই শত গুণিত অধিক পরিমাণ নীলরস, দুগ্ধ, কি জলকে রাগবান্ করিতে পারে সেই সকল মণি পূর্ব্বক্রমে প্রশস্ত অর্থাৎ নীলরসরঞ্জক অধিক উত্তম, দুগ্ধরঞ্জক অপেক্ষাকৃত অনুত্তম,জলরঞ্জক তদপেক্ষা অনুত্তম। ইত্যাদি।

বিশেষ পরীক্ষা।

গত মাসের বঙ্গদর্শনে পরীক্ষাসম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং দুইটিমাত্র সন্দেহনাশক পরীক্ষা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

“অপ্রণশ্যতি সন্দেহে
শিলায়াং পরিঘর্ষয়েৎ।
ঘৃষ্টা যোঽত্যন্তশোভাবান্
পরিমাণং ন মুঞ্চতি ॥”

মাণিক্য দেখিলে তাহা জাত্য কি বিজাতীয় কি কৃত্রিম, যদি কোন প্রকার সন্দেহ দূর না হয়, তাহা হইলে তাহা অন্য এক জাত্য মাণিক্যে ঘর্ষণ করিবেক। ঘর্ষণ করিলে যদি শোভা বৃদ্ধি হয় আর পরিমাণ অর্থাৎ ওজনে না কমে, তাহা হইলে তাহা—

“সজ্ঞেয়ঃ শুদ্ধজাতিস্তু
জ্ঞেয়া স্যান্যো বিজাতয়ঃ।”

—শুদ্ধ জাতি এবং বিপরীত হইলে তাহা বিজাতীয় বুঝিতে হইবেক।

পরিমাণ।

মাণিক্যরত্নের আকারের ও ওজনের উচ্চসীমা কি, তাহা বলা যাইতেছে। দেখিতে কুঁচের সমান একটি মাণিক্য ওজন করিলে দশকুচ, অর্থাৎ দশরতি পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং দেখিতে বিম্ব-ফল সমান একটি মাণিক্য ওজনে দশ তোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। রত্নতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, কি আকারে, কি ওজনে, উহা অপেক্ষা অধিক হয় এরূপ মাণিক্য কেহ কখন লাভ করে নাই। যথা—

"গুঞ্জাফলপ্রমাণস্তু
দশ সপ্ত ত্রিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগ স্তুলয়তি
যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ॥"

যে পদ্মরাগ দেখিতে গুঞ্জাপ্রমাণ, তাহা ১০, ৭, ও ৩ গুঞ্জার তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব ওজনযুক্ত পদ্মরাগই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য। অর্থাৎ একটি গুঞ্জাকার পদ্মরাগ ওজন করিলে যদি ১০ গুঞ্জার সমান হয়, তাহা হইলে তাহা যত ভাল, ৭ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা তত ভাল নহে। এইরূপ ৩ গুঞ্জার সমান হইলে তাহা অপেক্ষা অধম বলিয়া জানিতে হইবেক।

"ক্রোষ্টুকোলফলাকারো
দ্বাদশাষ্টাদিগুঞ্জকান্।
পদ্মরাগস্তুলয়তি
যথাপূর্ব্বং মহাগুণঃ।"

ক্রোষ্টুকোল অর্থাৎ শৃগালবদরী, যাহার বঙ্গভাষা "স্যাকুল।" সেই স্যাকুলের সমান দৃশ্য একটি পদ্মরাগ ১২, ১০, ৮, কি ৭ গুঞ্জার সহিত তুলিত অর্থাৎ ওজন হইতে পারে। তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বক্রমে মহাগুণ বলিয়া গণ্য হইবে। ওজনে ভারি হওয়াই যে একটি মহৎগুণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

"বদরীফলতুল্যো যঃ
স্বরদিক্ বসুমাষকঃ।
তথা ধাত্রীফলত্রিংশ
দ্বিংশতি ষাষ্টমাষকঃ।"

বদরী অর্থাৎ কুল। দেখিতে কুলের মত একটি মাণিক, ওজনে ১৪, ১০, ৮, মাষা হইতে পারে। এই রূপ ধাত্রী অর্থাৎ দেখিতে আমলকী ফলের মত একটি মাণিক ৩০ ও ২০ ও ১৬ মাষা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এখানেও যে যত ভারি সে তত ভাল ইহা বুঝিতে হই-বেক।

"বিম্বীফলসমাকারো
বসুষট্ দশতোলকঃ।
অতঃপরং প্রমাণেন
মানেন চ ন লভ্যতে॥"
"যদি লভ্যেত পুণ্যেন
তদা সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥"

বিম্বফলের সমানাকার একটি মাণিক্য গুরুত্বে ৮, ৬, ও দশ তোলা হইতে

পারে। কি প্রমাণে কি মানে ইহার অধিক হয় এরূপ মাণিক্য লাভ হয় না। যদি কেহ কখন পুণ্যবলে লাভ করিতে পারেন, তবে তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিবেন, বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বচননিচয়ে যে প্রমাণ ও মানের নির্দ্দেশ করা হইল, তাহা কেবল দিক্‌দর্শন মাত্র। ফল, উহার তারতম্যও হইয়া থাকে। বিম্বফল যেমন ছোট বড় হয়, বিম্বফলাকার মাণিক্যও তেমনি কিঞ্চিৎ ছোট বড়, এবং তাহাদের ওজন ৮, ৬, ও ১০ না হইয়া ৮॥০, ৬॥০, ১০॥০ কি তাহারও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক হয়, ইহাও বুঝিতে হইবেক।

মূল্য।

এক্ষণে মূল্যের কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করা যাউক। পরন্তু শাস্ত্রানুযায়ী মূল্যই লিখিত হইবেক। যে সময়ে ভারতবর্ষে রত্নশাস্ত্র সকল লিখিত হইয়াছিল, তৎকালে যে প্রকার মূল্যে ক্রীত বিক্রীত হইত শাস্ত্রকারেরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাহার অনেক অন্যথা হইয়া গিয়াছে। এখন গরজ বুঝিয়া দর; এবং যে যাহার নিকট যত লইতে পারে সে তত লয়। পূর্ব্বে এরূপ অবস্থা ছিল না। প্রায় সকল বস্তুরই এক একটা মূল্যের নিয়ম ছিল। পূর্ব্বকালে কি রূপ নিয়মে ও কি রূপ মূল্যে মাণিক রত্নের ক্রয় বিক্রয় নিষ্পত্তি হইত, তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

"বালার্কাভিমুখং কৃত্বা
দর্পণে ধারয়েন্মণিম্।
তত্র কান্তিবিভাগেন
ছায়া ভাগং বিনির্দ্দিশেৎ।"

প্রাতঃকালে নবোদিত সূর্য্যের অভিমুখে দর্পণের উপর মণিটি রাখিবেক। রাখিয়া মণির কান্তির প্রভেদ স্থির করিবেক; স্থির করিয়া ছায়া বা কান্তি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের তারতম্য নির্ণয় করিবেক। (এ নিয়ম আমরা বিশেষ রূপে জ্ঞাত নহি এবং এক্ষণকার মণিকারেরাও জ্ঞাত আছেন কি না সন্দেহ) নির্দ্দিষ্ট মূল্য কি? তাহা ব্যক্ত করা যাইতেছে। যথা—

"বজ্রস্য যত্তণ্ডুল সংখ্যয়োক্তং
মূল্যং সমুন্মাপিতগৌরবস্য।
তৎ পদ্মরাগস্য গুণান্বিতস্য
স্যাম্মাষকাখ্যা তুলিতস্য মূল্যম্॥"

অর্থ এই যে, এক তণ্ডুল গুরু হীরকের যে মূল্য; এক মাষা পরিমাণ উৎকৃষ্ট পদ্মরাগের সেই মূল্য।

"যন্মূল্যং পদ্মরাগস্য
সগুণস্য প্রকীর্ত্তিতম্
তাবন্মূল্যং তথা শুদ্ধে
কুরুবিন্দে বিধীয়তে॥"

গুণযুক্ত অর্থাৎ উত্তম পদ্মরাগের যে মূল্য বলা হইল, বিশুদ্ধ "কুরুবিন্দ", মণিরও সেই মূল্য বিহিত আছে।

"সগুণে কুরুবিন্দে চ
যাবন্মূল্যং প্রকীর্ত্তিতম্।

তাবন্মূল্য চতুর্থাংশ-
হীনং স্যাদ্বৈ সুগন্ধিকে।”

উৎকৃষ্ট কুরুবিন্দের যে মূল্য বলা হইল, “সৌগন্ধিক” মাণিক্যের মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন হইয়া থাকে।

“যাবন্মূল্যং সমাখ্যাতং
বৈশ্যবর্ণে চ সূরিভিঃ।
তাবন্মূল্যচতুর্থাংশং
হীনং স্যাৎ শূদ্রজন্মনি।”

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা “সৌগন্ধিক” মণির যে মূল্য অবধারিত করিয়াছেন, শূদ্রবর্ণের মণি অর্থাৎ মাংসখণ্ড বা নীলগন্ধি মণির মূল্য তাহার এক চতুর্থাংশ হীন হইয়া থাকে।

“পদ্মরাগঃ পণং যস্তু
ধত্তে লাক্ষারসপ্রভঃ।
কার্ষাপণ সহস্রাণি
ত্রিংশন্মূল্যং লভেত সঃ।”

অলক্তকাভ পদ্মরাগ যদি কর্ষ পরিমাণ গুরুত্ব ধারণ করে, তবে তাহার মূল্য ত্রিশসহস্র কার্ষাপণ।

“ইন্দ্র গোপকসঙ্কাশঃ
কর্ষত্রয় ধৃতো মণিঃ।
দ্বাবিংশতি সহস্রাণাং
তস্য মূল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।”

ইন্দ্রগোপ অর্থাৎ বর্ষাকীটের ন্যায় বিচিত্রচ্ছায় একটি মণি যদি ৩ কর্ষ ভারি হয়, তবে তাহার মূল্য দ্বাবিংশতি সহস্র কার্ষাপণ নির্দ্দেশ করিবেক।

“একোনো নূনকে যস্তু
জবাকুসুম সন্নিভঃ।
কার্ষাপণ সহস্রাণি
তস্য মূল্যং চতুর্দ্দশ।”

জবাপুষ্পের ন্যায় আভাযুক্ত এক মণি যদি ওজনে পাদোন কর্ষ পরিমাণ হয়, তবে তাহার মূল্য চতুর্দ্দশ সহস্র কার্ষাপণ।

“বালাদিত্যদ্যুতিনিভং
কর্ষং যস্তু প্রতুল্যতে।
কার্ষাপণ শতানাস্তু
মূল্যং সদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতম্।”

নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অনতি গাঢ় লোহিত দ্যুতিযুক্ত মাণিক্য যদি ওজনে কর্ষ পরিমিত হয়, তাহা হইলে পণ্ডিতেরা বলেন যে তাহার মূল্য একশত কার্ষাপণ।

“যস্তু দাড়িমপুষ্পাভঃ
কর্ষার্দ্ধেন তু সম্মিতঃ।
কার্ষাপণ শতানাস্তু
বিংশতিং মূল্য মাদিশেৎ।”

দাড়িমপুষ্পের আভার ন্যায় আভাযুক্ত মণি যদি গুরুত্বে অর্দ্ধকর্ষ হয়, তবে তাহার মূল্য দুই সহস্র কার্ষাপণ অবধারিত করিবেক।

“চত্বারো মাষকা যস্তু
রক্তোৎপলদলপ্রভঃ।
মূল্যং তস্য বিধাতব্যং
সূরিভিঃ শতপঞ্চকম্।”

রক্ত পদ্মদলের ন্যায় প্রভাযুক্ত মণি যদি চারি মাষা হয়, তবে রত্নবিৎপণ্ডিতেরা তাহার মূল্য পঞ্চশত কার্ষাপণ স্থির করিবেন।

৮"দ্বিমাষকো যস্তু গুণৈঃ
সর্ব্বৈরেব সমন্বিতঃ।
তস্য মূল্যং বিধাতব্যং
দ্বিশতং তত্ত্ববেদিভিঃ।"

সর্ব্বপ্রকার গুণসম্পন্ন মণি যদি গুরুত্বে দুই মাষা পরিমিত হয়, তাহা হইলে রত্নতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণ তাহার দুইশত কার্ষাপণ মূল্য ব্যবস্থা করিবেন।

"মাষকৈকমিতো যস্তু
পদ্মরাগো গুণান্বিতঃ।
শতৈক সম্মিতং বাচ্যং
মূল্যং রত্নবিচক্ষণৈঃ।"

যে গুণযুক্ত পদ্মরাগ ওজনে এক মাষা পরিমিত হয়, রত্নতত্ত্ববিচক্ষণগণ তাহার এক শত কার্ষাপণ মূল্য বলিবেন।

"অতোন্যূন প্রমাণাস্তু
পদ্মরাগাঃ গুণোত্তরাঃ।
স্বর্ণ দ্বিগুণমূল্যেন
মূল্যং তেষাং প্রকল্পয়েৎ।"

উহা অপেক্ষা ন্যূনপরিমাণ গুণযুক্ত পদ্মরাগের স্বর্ণের দ্বিগুণ মূল্য স্থির করিবেক। অর্থাৎ একরতি স্বর্ণের যে মূল্য, ১ রতি পদ্মরাগের তাহার দ্বিগুণ মূল্য। *

"অন্যে কুসুম্ভ পানীয়
মঞ্জিষ্ঠোদক সন্নিভাঃ।
কাষায়া ইতি বিখ্যাতাঃ
স্ফটিকপ্রভবাশ্চ তে।"
"তেষাং দোষো গুণো বাপি
পদ্মরাগ বদাদিশেৎ।
মূল্য মল্পন্তু বিজ্ঞেয়ং
ধারণেহল্পফলং তথা।"
(ইত্যাদি)।

অন্যান্য যে সকল মণির রঙ্ কুসুমফুলের বা মঞ্জিষ্ঠোদকের ন্যায়, তাহারা স্ফটিক হইতে সমুৎপন্ন এবং তাহাদিগকে "কাষায়" মণি বলে। তাহাদিগেরও দোষ গুণ পদ্মরাগমণির ন্যায় বিচার্য্য কিন্তু তাহাদের মূল্য অতিঅল্প এবং ধারণেও ফল অল্প।

মাণিক্যপরীক্ষা প্রস্তাব সমাপ্ত।

শ্রীরামদাস সেন।

* ৮০ রতি কাঞ্চনকে পূর্ব্বকালে সুবর্ণ বলিত। উহাই তৎকালের মুদ্রা। সে অর্থ এস্থলে গৃহীত হইবেক না।

বঙ্গদর্শন।

৮৯ সংখ্যা।

বহুপতিত্ব।

বহুবিবাহ বলিলে আমরা পুরুষের বহুবিবাহ বুঝি; কেন না বাঙ্গালায় কেবল পুরুষের মধ্যেই বহুবিবাহ প্রচলিত। কিন্তু কোন কোন দেশে স্ত্রীলোকের মধ্যে বহুবিবাহ আছে; আমরা এস্থলে সেই বহুবিবাহের কথার উল্লেখ করিতেছি, এইজন্য বহুপতিত্ব বলিয়া শিরোনামা দিলাম।

এক ভার্য্যার বহুভর্ত্তা। এ কথা শুনিলে আমরা হাসি। হাসিবার দাবি রাখি; কেন না, বঙ্গযুবতীরা বহুবিবাহ করেন না—ইহা তাঁহাদের অনুগ্রহ—কিন্তু যদি বহুবিবাহের প্রথা তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কোন বাঙ্গালি হাসিত? এই যে আমাদের পুরুষবাহাদুরেরা বহুবিবাহ করিতেছেন কে বা তাঁহাদের শ্রীমুখপ্রতি বিস্মিতলোচনে চাহিয়া থাকে? নিত্য দেখিলে রহস্যে আর রস থাকে না।

যেরূপ সময় পড়িয়াছে, বহুপতিত্বের পরিচয় বাঙ্গালায় দিতে কিছু ভয় হয়। তবে এক ভরসা যে সর্ব্বকার্য্যে অগ্রসারী, সর্ব্ববন্ধনচ্ছেদকারী, সর্ব্বভ্রান্তিসংহারকারী মার্কিন সুন্দরীরা বহুপতিত্বের কথা শুনিয়া আগ্রহতাপ্রকাশ করেন নাই; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, একদিকে বহুপতিত্ব আর একদিকে অতিদাসীত্ব। যত ভর্ত্তা, তত প্রভু! অতএব নির্ভয়ে আমরা বহুপতিত্বের কথা উল্লেখ করিতেছি; মার্কিন সুন্দরীরা বিঘ্ন বিনাশ করুন।

অনেকেই জানেন আদিম অবস্থায়

মনুষ্যেরা যথেচ্ছাচারী থাকে। অদ্যাপি দেখা যায় স্থানে স্থানে বন্যজাতিদের মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধ একেবারে নাই, কে পতি, কে পত্নী, তাহার কিছুই স্থির নাই, পশুদের ন্যায় তাহারা পরস্পর পরস্পরের অভিসারী। তাহাদের সন্তান জন্মে, কিন্তু সে সন্তানের কে জনক তাহার স্থিরতা হয় না। তাহাদের সংসার নাই। যেখানে সংসার নাই সুতরাং সেখানে সমাজ হইতে পারে না। সংসার সমাজের আদি।

বন্যদের এই যথেচ্ছাচারিতা হইতে ক্রমে বিবাহের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। তখন একজনের সঙ্গে কেবল একজনের বিবাহ না হইয়া, বহুজনের সঙ্গে বিবাহ প্রচলিত হয়। প্রত্যেক স্ত্রীর বহুস্বামী, প্রত্যেক স্বামীর বহুস্ত্রী। যথেচ্ছাচারিতার পরই একচারী হওয়া অতি কঠিন, তখন বহুবিবাহই সম্ভব ও সঙ্গত; বহুবিবাহ অর্থাৎ বহুপত্নীত্ব এবং বহুপতিত্ব।

বহুপতিত্ব একসময় সকল দেশেই প্রচলিত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস; তাঁহারা বলেন যে, বন্য অবস্থা হইতে উন্নত হইতে গেলে ক্রমে যে যে সোপান উঠিতে হয়, বহুপতিত্ব তাহার মধ্যে প্রথম। সুতরাং এই সোপান উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন জাতিই সভ্য বা উন্নত হয় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

এক্ষণে দেখা যায় যে অসভ্য জাতিদের মধ্যে অনেক দেশে বহুপতিত্ব অদ্যাপি প্রচলিত আছে। বোম্বে অঞ্চলে নায়র নামে একজাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে বহুপতিত্ব আছে। নাগপুর অঞ্চলে গঁদ নামে আর এক জাতি বাস করে, তাহাদেরও যুবতীরা বহুবিবাহ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ অঞ্চলে ও উত্তরাখণ্ডের পর্ব্বতে এইরূপ বহুপতিত্ব সাধারণতঃ না হউক, স্থানে স্থানে আছে। ভারতবর্ষের বহির্ভাগে তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি অনেক দেশে এই রীতি প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ সকল দেশের মধ্যে কোনটিই সভ্যতাপ্রাপ্ত হয় নাই। যে সকল দেশ সভ্যতালাভ করিয়াছে, সে সকল দেশে এক সময় বহুপতিত্ব ছিল কি না তাহা নিরাকরণ করা এক্ষণে কঠিন; সকল দেশের পুরাবৃত্তে এ কথা লিখিত নাই। ইংরেজদের পুরাবৃত্তে পাওয়া যায় যে, যখন তথায় কেবল বন্যরা বাস করিত, তখন তাহাদের মধ্যে বহুপতিত্ব প্রচলিত ছিল। আমাদের বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নাই, কখন তাহা লিখিত হয় নাই; কিন্তু যাহা আমাদের গ্রন্থে নাই তাহা অনেকটা আমাদের ব্যবহারে থাকিয়া গিয়াছে; অতএব বহুপতিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ব্যবহারদ্বারা যতদূর অনুভব করা যাইতে পারে তাহা স্থানে স্থানে চেষ্টা করা যাইবে।

(১) বহুপতিত্ব প্রধানতঃ তিন প্রকার।

তাহার মধ্যে প্রথমপ্রকারের কথা বলা যাইতেছে। যখন স্বেচ্ছাচারিতা ঘুচিয়া বহুপতিত্ব প্রথম আরম্ভ হয়, তখন বিবাহের কোন বাঁধাবাঁধি থাকে না; যুবতীরা যাহাকে ইচ্ছা এবং যত ইচ্ছা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তিকে বিবাহ করে, এই বিবাহ স্বেচ্ছাচারিতার অনুরূপ; তবে এইমাত্র প্রভেদ যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি কাহার সহিত সহবাসের অধিকারী কেবল তাহাই নির্দ্দিষ্ট হয়, স্বেচ্ছাচারিতায় সেরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে না। পূর্ব্বে যে নায়র জাতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই শ্রেণীর বহুপতিত্ব প্রচলিত, তবে কেহ কেহ বলেন যে, নায়র সুন্দরীরা দ্বাদশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, তাহার অধিক পারে না; কিন্তু এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। তাহা যাহাই হউক, এইরূপ বহুপতিত্ব যে দেশে প্রচলিত, সে দেশে বোধ হয় রীতিমত সংসার নাই। কে কাহাকে লইয়া সংসার করিবে? স্ত্রীর বহুস্বামী, স্বামীর বহু স্ত্রী, কে কাহার গৃহে থাকে! তদ্ব্যতীত কে পিতা, কে পুত্র কিছুই স্থির হয় না। সুতরাং পিতাপুত্র বলিয়া তথায় কোন সম্বন্ধ নাই, খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত, জ্ঞাতি গোত্র কিছুই নাই, সংসারবন্ধনীর প্রায় কোন উপকরণ নাই। স্বসম্পর্কীয়ের মধ্যে কেবল, সহোদর সহোদরা, মাতা আর মাতুল। কিন্তু তাহারা সকলে এক গৃহে বাস করে না; কেবল মাতা শৈশব সন্তানগুলিকে লইয়া একা বাস করে। পিতার যত্নে সন্তানের যাহা সম্ভব, কেবল মাতার যত্নে তাহার শতাংশ হয় না; অনেক সন্তানের প্রাণরক্ষা পর্য্যন্ত হয় না।

এই জাতীয় বহুপতিত্ব যে অঞ্চলে প্রচলিত সে অঞ্চলে পিতার সম্পত্তি পুত্র পায় না। কে জনক তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং সন্তান কিরূপে পিতার সম্পত্তি দাবী করিবে? কে পুত্র, পিতার তাহা জানা নাই, সুতরাং পিতা কাহাকে সম্পত্তি দিয়া যাইবে? কিন্তু পুত্রসম্বন্ধে এই যে আপত্তি, ভাগিনেয়সম্বন্ধে সে আপত্তি সম্ভবে না। সহোদরার সন্তানকে সকলেই জানিতে পারে, সুতরাং পুরুষেরা ভাগিনেয়কে উত্তরাধিকারী করে। বন্য অবস্থায় সম্পত্তি কিছুই নাই, তথাপি তীর, ধনুক, চর্ম্ম বা তদ্বৎ সামগ্রী যাহাই থাকে ভাগিনেয় তাহাই পায়।

স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, বহুপতিত্ব নাই অথচ তথায় ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী; এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বহুপতিত্ব একসময় তথায় প্রচলিত ছিল; বহুপতিত্ব লোপ পাইয়াছে, তথাপি তাহার আনুষঙ্গিক দায়ভাগ থাকিয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ অঞ্চলের স্থানে স্থানে পুত্রসত্বেও ভাগিনেয় যে উত্তরাধিকারী হয় তাহার হেতু এই।

(২) ইহার পর আর একজাতীয় বহুপতিত্ব আরম্ভ হয়। যাহাকে ইচ্ছা যত ইচ্ছা বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল তাহার

পরিবর্ত্তে, কেবল স্বসম্পর্কীয় পুরুষদিগকে বিবাহ করিবার প্রথা জন্মে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্রথম অবস্থায় স্বসম্পর্কীয় পুরুষদের মধ্যে কেবল মাতুল আর ভাগিনেয়। সুতরাং যে স্ত্রীলোক বিবাহ করে সে মাতুল আর ভাগিনেয় উভয়কে পতিত্বে বরণ করে। ভাগিনেয়েরা সুতরাং মাতুলানী বিবাহ করে, মাতুল ভাগিনেয়বধূ বিবাহ করে।

এক্ষণে বোধ হয় অনেকে বুঝিতে পারিতেছেন পশ্চিম অঞ্চলে মাতুলানীর সম্বন্ধে আদিরসের রহস্য কেন প্রচলিত। এই জাতীয় বহুপতিত্ব এক সময় পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। মাতুলানী আর স্ত্রী তথায় এক ছিল। পরে এ সম্বন্ধ রহিত হইয়াছে কিন্তু এ ভাব কতকটা অদ্যাপি থাকিয়া গিয়াছে। আমাদের নিজের প্রথাদি আলোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যেন একসময় বাঙ্গালায় এই ঘৃণিত বিবাহের প্রথা আসিবার আশঙ্কা হইয়াছিল, অথবা হয় ত আসিয়াছিল। তাহা উঠাইবার নিমিত্ত মাতুলানীকে শাস্ত্রে মহাগুরু বলা হইয়াছে। ভাগিনেয়বধূ সম্বন্ধে অতি কঠিন নিয়ম করা হইয়াছে, তাহাকে দেখিতেও নাই বলা হইয়াছে। এই নিয়ম এক্ষণে অনর্থক, অনাবশ্যক, কিন্তু একসময় ইহা বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল।

যে জাতীয় বহুপতিত্বের কথা বলা যাইতেছে, এক্ষণে তাহা রহস্যের বিষয় হইলেও একসময় তদ্দ্বারা প্রধান সুফল ফলিয়াছিল। এই বহুপতিত্ব উপলক্ষে গৃহান্তর সংসার প্রথম স্থাপিত হয়, পূর্ব্ব অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল না। তদ্ভিন্ন আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়সংখ্যা এই বহুপতিত্বে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ইহাও আর এক প্রধান লাভ বলিতে হইবে। কেন না স্বসম্পর্কীয়ের সংখ্যা বাড়িলে ক্রমে সমাজের উৎপত্তি হয়।

(৩) তৃতীয়, আর এক জাতীয় বহুপতিত্ব আছে। পরিবারের মধ্যে যত পুরুষ থাকে, তাহাদের সমুদয়কে বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল, অর্থাৎ মাতুল ও ভাগিনেয় বিবাহ করিবার যে প্রথা ছিল, সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র তাহাদের একদলের সহোদরগণকে বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। অর্থাৎ কেবল মাতুলদের বিবাহ করা হয়, নতুবা কেবল ভাগিনেয়দের বিবাহ করা হয়। তাহাদের মধ্যে যাহারা পরস্পর সহোদর কেবল তাহারাই নির্ব্বাচিত হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সুন্দরীকে বিবাহ করে, সেই সুন্দরী কনিষ্ঠদের ভার্য্যা হয়, কনিষ্ঠদের আর স্বতন্ত্র বিবাহ করিতে হয় না। তাহাদের সন্তানেরা এজমালীর বলিয়া গণ্য হয়, এবং তাহারা যত্নে প্রতিপালিত হয়। প্রথমোল্লিখিত বহুপতিত্বে সন্তানদের কোন যত্ন হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর বহুপতিত্বে সন্তানদের কথঞ্চিৎ যত্ন হয়, কিন্তু এই শেষ শ্রেণীর বহুপতিত্বে সন্তানদের প্রতি রীতিমত যত্ন

আরম্ভ হয়। কে পিতা তাহা স্থির নাই সত্য, কিন্তু সহোদরেরা সকলেই পরস্পর জানে সন্তানেরা একান্ত পক্ষে নিজপুত্র না হউক, ভ্রাতুষ্পুত্র নিশ্চয়ই। সুতরাং সন্তানদের প্রতি যত্ন বিশেষরূপে হইয়া থাকে। বিশেষতঃ বহুপিতার উপার্জ্জনে সন্তানদের অন্নকষ্ট একেবারে না থাকিবারই সম্ভাবনা। তবে সন্তানদিগের এইমাত্র দোষ সম্ভবে যে, বহুপিতার উপদেশ কখন কখন পরস্পর বিরোধী হইলে, তাহাদিগের মানসিক পুষ্টিসম্বন্ধে কিছু ব্যাঘাত হইলে হইতে পারে।

সন্তানসম্বন্ধে আর এক কথা আছে, পূর্ব্ব অবস্থায় তাহাদের পিতৃকুল ছিল না, পিতৃ পিতৃব্যের সম্পত্তি উত্তরাধিকারিস্বরূপে তাহারা পাইত না, তৎকালে উত্তরাধিকারিত্ব কেবল মাতৃকুলগত ছিল। এই তৃতীয় প্রকার বহুপতিত্বে তাহা পিতৃকুলগত হইল। এস্থলে পিতা কে স্থির নাই সত্য, কিন্তু পিতৃকুলের স্থিরতা যে থাকে ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

বহুপতিত্বের কথা কেবল একটি মাত্র আমাদের দেশে রাষ্ট আছে—দ্রৌপদীর বহুপতিত্ব। বোধ হয় তৎপূর্ব্বে বা সেই সময়ে ভারতবর্ষে বিস্তর এরূপ সতী ছিলেন, হয় ত একসময় আমাদের বাঙ্গালায়ও এ প্রথা ছিল। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেখা যায় যে পশ্চিমদেশীয় মাতুলানীর ন্যায় জ্যেষ্ঠের স্ত্রীকে লইয়া রসিকতা করা হয়। এ রসিকতার কারণ অন্য কিছু অনুভব হয় না। পূর্ব্ব সম্বন্ধ উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব আলাপন থাকিয়া গিয়াছে।*

তিব্বতদেশে এই জাতীয় বহুপতিত্ব বিশেষ মঙ্গলদায়ক হইয়াছে। উহা বরফের দেশ, শস্য সামান্যমত উৎপন্ন হয়, তথায় প্রজা বৃদ্ধি হইলে, অন্নকষ্ট হয়, সুতরাং তথায় প্রজাবৃদ্ধি না হওয়াই মঙ্গল। এক্ষণে দুই উপায় দ্বারা তথায় প্রজাবৃদ্ধি নিবারিত আছে। এক উপায় সন্ন্যাস আশ্রম, অপর উপায় বহুপতিত্ব। বহুপতিত্বে সন্তান অল্প জন্মে।

যে দেশে রাজশাসন আরম্ভ হয় নাই বা সুশাসন নাই, সে দেশে এই জাতীয় বহুপতিত্ব মঙ্গলদায়ক বলিয়া পরিচিত। একজন ইংরেজ লিখিয়াছেন যে, যখন ব্যবসা উপলক্ষে বা কোন কর্ম্ম উপলক্ষে একজন স্বামী বিদেশে যায় অপর স্বামীরা গৃহে থাকিয়া তত্ত্বাবধারণ করে। সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের আর কোন ভাবনা থাকে না। আরও লাভ এই যে বহুস্বামীর উপার্জ্জনে সংসারের ব্যয়ের

* অনেকে বলিতে পারেন, "শ্যালীর" সহিতও ত এইরূপ রসিকতা প্রচলিত আছে। তাহা সত্য। তাহার হেতু "বহুপত্নীত্ব" প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

সন্তুলান হয়। বোধ হয় আমাদের একান্নবর্ত্তিতার মূল এই বহুপতিত্ব। সহোদরদের এজমালি বিবাহ বাঙ্গালা হইতে বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহার আনুষঙ্গিক একান্নবর্ত্তিতা মঙ্গলদায়ক বলিয়া এদেশে থাকিয়া গিয়াছে। ফলতঃ এবিষয়ে মত ভেদ আছে, তাহার বিস্তারিত বিবরণ যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইবে।*

ত্রিবিধ বহুপতিত্বের কথা বলা হইল। এই পরিচয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পতির সংখ্যা ক্রমে কমিতে থাকে। প্রথম অবারিত পতিত্ব, তাহা অতি অসভ্য অবস্থায় হয়। তাহার পর বিবাহাকাঙ্ক্ষিণীরা যত ইচ্ছা তত পতি আর গ্রহণ করে না, কারণ, তাহাতে ক্ষতি হয়, সন্তান পালন হয় না, সুতরাং যুবতীরা পতির সংখ্যা কমাইতে আরম্ভ করে, যাহারা পরস্পর স্বসম্পর্কীয় ও আত্মীয় অর্থাৎ যাহারা একপরিবারস্থ কেবল তাহাদেরই পতিত্বে বরণ করে। এই দ্বিতীয় বহুপতিত্ব অসভ্য অবস্থায় উৎপত্তি বটে কিন্তু তখন স্রোত ফিরিতেছে। তাহার পর পরিবারস্থ অপর সকলকে বিবাহ করা অপেক্ষা কেবল সহোদরদের বিবাহ করা হয় ইহা তৃতীয় বহুপতিত্ব। ক্রমে এইরূপে শেষ এক পতিত্বের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু দেশের অবস্থা অনুসারে এই সকল নানাবিধ পতিত্ব প্রচলিত থাকে। তিব্বতদেশের অবস্থা একপতিত্বের উপযোগী নহে, তথায় রাজা যদি রাজদণ্ডের ভয় দেখাইয়া একপতিত্ব বিধান করেন, তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া পড়িবে, কিন্তু যুবতীকে বহুপ্রসবিনী দেখিয়া সে দেশের ভূমি কদাপি বহুপ্রসবিনী হইবে না, সুতরাং আহারের অনাটনে সকলে মরিবে। যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, কেবল সেই পরিমাণের প্রতিপাল্য প্রজা জীবিত থাকিবে। তদ্ভিন্ন সেই দেশে যদি রাজশাসন ভাল না থাকে, তাহা হইলে একপতি কখন সংসার রক্ষা করিতে পারিবে না; সুতরাং আবার পূর্ব্বমত বহুপতিত্ব আরম্ভ হইবে।

এই ত্রিবিধ বহুপতিত্ব দেশ কাল পাত্র অনুসারে নিজে উৎপন্ন হয়, স্থায়ী হয়, লয় পায়। কাহার ইচ্ছাধীন নহে। কাহার বক্তৃতারও অধীন নহে, চেষ্টার ও অধীন নহে।

আর এক জাতীয় বহুপতিত্ব আছে; কিন্তু সকল দেশে তাহা বহুপতিত্ব বলিয়া গণ্য নহে। বহুপতিত্বের লক্ষণ বিলাতে একরূপ, বাঙ্গালাদেশে অন্যরূপ। সহপতি না থাকিলে, বিলাতে বহুপতি বলে না। অনেক বিবির দুই বিবাহ, কিন্তু দুই পতি এক সময় জীবিত থাকে না বলিয়া সাহেবেরা বিধবা বিবাহকে বহুপতিত্ব বলেন না। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বিধবাবিবাহ বহুপতিত্বের অন্তর্গত। তাহা সঙ্গত কি না পরে বলা যাইবে।

* সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে একান্নবর্ত্তিতার কথা নিতান্ত আবশ্যক সুতরাং এক সময়ে তাহা আলোচনা করা যাইবে।

ফুলের ভাষা।

আকাশে নক্ষত্র ফোটে; পৃথিবীতে ফুল ফোটে। নক্ষত্র অন্ধকারের ভিতর দিয়া ফুল দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি; ফুল অন্ধকারের ভিতর দিয়া নক্ষত্র দেখিয়া বলে, তুই ফুটিস্ বলিয়া আমি ফুটি। আকাশ বিশ্বের আধখানা; পৃথিবী বিশ্বের আর আধখানা। তাই বলি যখন আকাশে নক্ষত্র ফোটে আর পৃথিবীতে ফুল ফোটে, তখন আর আধাআধি ভাব থাকে না। তখন বিশ্বের উপরার্দ্ধ এবং বিশ্বের নিম্নার্দ্ধ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ফুলের ডোরে উপর নীচে বাঁধা।

আবার ফুলের ডোরে নীচে সব বাঁধা। এখানেও ফুল আর নক্ষত্র একই বস্তু, কেন না নক্ষত্রের কিরণ ডোরে ও নীচে সব বাঁধা। একটু ভাবিয়া দেখ। মনুষ্যের ইতিহাসের যুগযুগান্তরের পিছনে গিয়া দাঁড়াও। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি ভুলিয়া যাও; গ্রীস, রোম, পারশ্য ভুলিয়া যাও; তাজমহল, পার্থিনন, ভুবনেশ্বর, কনারক ভুলিয়া যাও। সব ভুলিয়া সভ্যতাবিহীন, শাস্ত্রবিহীন, ইতিহাসবিহীন, অন্নবস্ত্রবিহীন কাল্‌দীয় মেষপালকদিগের মধ্যে গিয়া দেখ তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে ভেড়া চরাইতেছে, রাত্রে নক্ষত্র ভাবিতেছে। অথবা গো-মহিষ-সম্বল ভারতীয় আদিম আর্য্যগণের মধ্যে গিয়া দেখ, তাহারা কি করিতেছে। দেখিবে তাহারা দিনে গো-ধন বাড়াইবার জন্য কত গব্য-কাষ্ঠ জ্বালাইতেছে, রাত্রে আকাশে সপ্তর্ষি দেখিয়া সাধের গো-ধন পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছে। তার পর সেই আদিমকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হও। হইয়া উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষের এক চক্ষু পৃথিবীর জিনিসে আর এক চক্ষু আকাশের নক্ষত্রে! নক্ষত্র মনুষ্যের চিরন্তন চিন্তা, আবহমান আকাঙ্ক্ষা, গূঢ়নিহিত কৌতূহল! আবার পিছাইয়া যাও—সোণা, রূপা, মণি, মুক্তা, বস্ত্র, অলঙ্কার, গৃহ, অট্টালিকা, অর্ণবযান, বাষ্পীয় যান প্রভৃতি সমস্ত বাহ্য সম্পদ এবং সভ্যতাসূচক বস্তু ভুলিয়া, আদিম মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া আদিম মনুষ্যকে দেখ। দেখিবে তোমার যাহা আছে তাহার সে সব কিছুই নাই। কেবল তোমার যে ফুলটি আছে তাহারও সেই ফুলটি আছে। তার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া উনবিংশ শতাব্দীর জেন্নার মধ্যে প্রবেশ কর। বরাবর দেখিবে মানুষ সব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু যে ফুল প্রথমে তুলিয়া পরিয়াছে

এখনও সেই ফুল তুলিয়া পরিতেছে। ফুল মানুষের চিরন্তন সাধ, আবহমান অনুরাগ, গূঢ়-নিহিত ভাব! তাই বলি যে আকাশের নীচে ফুলের ডোরে আর নক্ষত্রের কিরণ-ডোরে সব বাঁধা। সেই জন্যই বুঝি ঐ দুইটি ডোর মিশিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। ফুল! তুমি কি কঠিন! তোমার কল্পনাতীত কমনীয় কান্তিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা! তবে বুঝি বাঁধিতে হইলে কমনীয়তা দ্বারা বাঁধিতে হয়?

ফুল, তুমি মানব-গুরু! মানুষে মানুষ আছে আর পশু আছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা, পশুত্বটুকু নষ্ট করিয়া মনুষ্যত্ব টুকু প্রবল করে। সেই নিমিত্ত মানুষ পৃথিবীতে উদ্ভূত হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কত চেষ্টা করিয়াছে। কত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, কত দর্শনের সৃষ্টি করিয়াছে, কত স্কুল, কালেজ, টোল করিয়াছে, কত দেশ ভ্রমণ করিয়াছে। কিন্তু এই প্রভূত চেষ্টার প্রথম কার্য্য—ফুল তোলা। যে দিন আদিম মনুষ্য আদিম পশুর ন্যায় ক্ষুধার জ্বালায় মহারণ্যে বিচরণ করিয়া পশুবধকরত মধ্যাহ্নে বৃক্ষমূলে বসিয়া কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইয়া সহচর সিংহ ব্যাঘ্রের ন্যায় নিদ্রার দ্বারা ক্লান্ত দেহের শান্তি সম্পাদন করিয়া অপরাহ্নে অস্তাচলগামী সূর্য্যের মৃদুমধুর সুবর্ণজ্যোতিঃ দেখিয়া, কি জানি কেন, বিলম্বিত লতা হইতে একটি সুবর্ণ-জ্যোতিঃ পুষ্প ছিঁড়িয়া মাথার চুলে গুঁজিল, সেই দিন মনুষ্যের বিশাল ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। সেইদিন জানা গেল যে, মহারণ্যনিবাসী সহচর সিংহ ব্যাঘ্র অনন্তকাল মহারণ্যেই বাস করিবে, কিন্তু তাহাদের আদিম সহচর মনুষ্য মহারণ্য বিনষ্ট করিয়া মহা সম্পদ সৃষ্টি করিবে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহ ব্যাঘ্রে কেবল পৃথিবী আছে, কিন্তু মনুষ্যে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই আছে। সেইদিন জানা গেল যে সহচর সিংহব্যাঘ্র চিরকাল নতশিরে পৃথিবীতে বিচরণ করিবে, কিন্তু মনুষ্য অনন্ত আকাশ ভেদ করিয়া বিশ্বের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উঠিবে। সেইদিন মনুষ্যের অনন্ত শিক্ষার, অনন্ত উন্নতির সূত্রপাত হইল। সে শিক্ষা, সে উন্নতির মূলে—ক্ষুদ্র, কোমল, কমনীয় ফুল! কেন না ঊর্দ্ধতম স্বর্গ, অনন্ত নক্ষত্ররূপী ব্রহ্মাণ্ড পৃথিবীর আর কিছুর সহিত বাঁধা নাই, কেবল ফুল-ডোরে বাঁধা। অতএব যদি স্বর্গাভিমুখী হইতে হয়, যদি অনন্ত উন্নতির পথে চলিতে হয়, তবে আদি গুরু ফুল ভুলিও না। আদি ছাড়া অন্ত নাই। ফুলের কোমলতা, ফুলের কমনীয়তা, ফুলের গগনস্পর্দ্ধী নির্ম্মলতা হারাইলে উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে, স্বর্গযাত্রা অকালে বন্ধ হইবে। অতএব, ভাই সকল, আমাদের মহারণ্যবাসী আদিপুরুষ যেমন মাথায় ফুল রাখিতেন, তেমনি করিয়া মাথায় ফুল রাখিয়া অগ্রসর হও।

ফুল, তুমি জগতের গূঢ় রহস্য!

ফুল সর্ব্বত্রই ফোটে। মরুভূমিতেও ফোটে, উদ্যানপ্রদেশেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তর সীমার তুষাররাশির মধ্যেও ফোটে, পৃথিবীর উত্তপ্ত কটিদেশেও ফোটে, মনুষ্যের বাসস্থানেও ফোটে, মনুষ্যের অগম্য প্রদেশেও ফোটে। ফুল সর্ব্বব্যাপী।

আমি এখানে, ওখানে কি আছে জানি না। তুমি ওখানে, এখানে কি আছে জান না। ভারতে ইংলণ্ড নাই, ইংলণ্ডে ভারত নাই। ফ্রান্সে আমেরিকা নাই, আমেরিকায় ফ্রান্স নাই। এ স্থান মৃত্তিকাময়, এখানে সমুদ্র নাই। ওস্থান অগাধ সমুদ্র, ওখানে মৃত্তিকা নাই। তুমি সব জান না, আমি সব জানি না, ভারত ইংলণ্ড জানে না, ইংলণ্ড ভারত জানে না, মৃত্তিকা সমুদ্র জানে না, সমুদ্র মৃত্তিকা জানে না। ফুল সর্ব্বত্র ফোটে। ফুল সব জানে। ফুল সর্ব্বজ্ঞ।

ভারতবর্ষ, পারশ্যদেশ, আরবদেশ, আফরিক মহাদেশ—এই সকল স্থান প্রখর রবির প্রখর রঙ্গভূমি। এই সকল স্থানে প্রখর রবিকিরণে সকলই জ্বলিয়া যায়, পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, জল শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যায়, জলাধার নদীগর্ভ ফাটিয়া বিকটাকার ধারণ করে। কিন্তু এ সকল স্থানে ফুল ফোটে। আবার লাপ্‌লাণ্ড, গ্রীণ্‌লাণ্ড, নোভাজেম্‌লা প্রভৃতি স্থানে হিমের পরিমাণ নাই। উপরে হিম, নীচে হিম, চতুঃপার্শ্বে হিম —যেন হিমাংশুর হিমঋতুর হিমশয্যা—হিমদেহ, হিমপ্রাণ, হিম-আত্মা! সে হিমে কিছুই হয় না, কিছুই বাঁচে না, মানুষ জমাট হইয়া যায়, জল জমাট হইয়া যায়, জগৎ জমাট হইয়া যায়। কিন্তু সে হিমে ফুল ফোটে। ফুল সর্ব্বশক্তিমান। ফুলের কোমলতা শক্তির প্রাণ।

স্বগন্ধিনিশ্বাস বিবৃদ্ধ তৃষ্ণং
বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টি—
র্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী॥

এখন বুঝিতেছি ফুল সর্ব্বত্র ফোটে কেন। একজন কবি-নাম-খ্যাত ইংরেজ বলিয়াছেন :—

Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air.

মরুভূমিতে ফুল ফুটিয়া অপচয় হয় মাত্র! মিথ্যা কথা। অসার কথা। অগভীর আত্মার কথা। প্রশস্ত মরুভূমি—জীবশূন্য, তৃণশূন্য, বারিশূন্য—জ্বালাময়, অগ্নিময়—প্রকৃতির রুদ্র, বিকট, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! যেমন করিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি হইতে কেবল অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে; রুদ্রভাব ফাটিয়া বাহির হইতেছে; কঠোরতা, কঠিনতা, নিষ্ঠুরতা প্রশ্বাসিত হইতেছে। কিন্তু ঐ দেখ ঐ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে একটি ফুল ফুটিয়াছে—ঐ কঠোর, কঠিন, নিষ্ঠুর, রুদ্রমূর্ত্তিতে একটি অনির্ব্বচনীয় কোমলতা অঙ্কিত রহিয়াছে? প্রকৃতি

ঐ কোমলতার অনুপ্রাণিত। ঐ কোমলতা লইয়া প্রকৃতি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতি আপনাকে সার্থক মনে করিতেছে। তুমি দেখ আর নাই দেখ, তুমি বুঝ আর নাই বুঝ, প্রকৃতি ঐ কোমলতার গুণে পূর্ণতার ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে, সজীবতা অনুভব করিতেছে, আপনার প্রাণবায়ু আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছে। ফুল, তুমি মরুভূমিতে ফুটিও, নহিলে মরুভূমি প্রাণশূন্য হইবে এবং মহাশক্তি শক্তিহীন হইবে! বিশ্বনিন্দিত পৌরাণিক কবি ইহা বুঝিতেন। বুঝিয়া বিকটদশনা, ভীমনয়না, খড়্গাধারিণী, অসুরঘাতিনী, রক্তাক্তকলেবরা রণরঙ্গিণীকে কোমলতম নীলোৎপলসদৃশ অপরাজিতায় সুশোভিত করিয়াছেন। মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে মরুভূমি কি পৃথিবীতে থাকিত? না মহাশক্তির প্রকৃতশক্তি বুঝা যাইত? মরুভূমিতে ফুল না ফুটিলে আকাশের নক্ষত্র কেমন করিয়া মরুভূমিকে পৃথিবী বলিয়া চিনিত? তুমি মরুভূমি দেখ আর নাই দেখ, কিন্তু মরুভূমিকে ত নক্ষত্রের কাছে পরিচিত হইতে হইবে। তাই মরুভূমিতে ফুল ফোটে। ফুলডোর ব্যতীত পৃথিবীকে আকাশের সহিত বাঁধা যায় না।

মহারণ্যে মহান্ধকার। কোথাও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না—যেন কোথাও কিছু নাই। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একটি ফুল ফুটিল। আর্য্যকবি গাহিলেন:—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ইত্যাদি।

সেই অবধি আর্য্য ভক্ত মহাশক্তির পদে জবাপুষ্পের অঞ্জলি দিতেছেন।

আর্য্যকবিগণ বুঝিয়াছিলেন যে ফুল জগতের গূঢ়রহস্য। তাঁহাদের মতন ফুলের ভাষা আর কোথাও কেহ বুঝিতে পারে নাই। গ্রীক্ কবিগণ ফুলে যত মানসিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন, তদপেক্ষা শারীরিক সৌন্দর্য্য দেখিতেন। তাঁহারা বেশী ফুল কোরিণ্থিয়ান্-স্তম্ভের শিরোপরি চাপাইতেন। রণপ্রিয় রোমানেরা রাজপথে ফুলের মালা ঝুলাইয়া জয়োল্লাস প্রকাশ করিতেন। ইংলণ্ডে সেক্সপীয়র ফুলের ভিতর প্রবেশ করিয়া অনেক কথা বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল কথাই পৃথিবীসম্বন্ধীয়। Midsummer Night's Dream—এ ও তদপেক্ষা বেশী নাই। কেবল ভারত ফুলে পৃথিবী এবং স্বর্গ দুইই দেখিয়াছে। বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি ফুলে পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখিয়াছেন; পৌরাণিক কবিগণ ফুলে স্বর্গের অথবা বিশ্বরহস্যের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছেন।

ফুল জগতের গূঢ় রহস্য। ফুল জগতের প্রাণ। ফুল-ডোরে স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য বাঁধা। ফুল ছাড়া গতি নাই, ফুল ছাড়িলে স্বর্গের দ্বার খোলা যায় না। অতএব, ভারতসন্তানগণ, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় ফুল মাথায় করিয়া অগ্রসর

হও! কিন্তু ফুলকে শুধু ফুল বলিয়া জানিলে চলিবে না। আরাধ্য পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় ফুলকে জগতের গূঢ় রহস্য, মহাশক্তির শক্তি, প্রকৃতির প্রাণ, স্বর্গদ্বারের চাবি বলিয়া না জানিলে তোমাদের যুগযুগান্তরের ফুলে—মেল ভাঙ্গিয়া যাইবে—তোমরা পৃথিবীর হাড়ী হইয়া পড়িবে।

যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহবাদ।

শৈশবাবধি সকলে যাহা শুনিয়া আসিতেছেন, তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী কোন মত শুনিলে যে অনেকে বিস্ময়ান্বিত হইবেন তাহা কিছুই বিচিত্র নহে বরং সর্ব্বথাই সম্ভব। সেই জন্য অনেকের নিকট এই সন্দেহবাদ বিস্ময়কর হইলে হইতে পারে।

আমরা কোন শাস্ত্র ঈশ্বরপ্রেরিত (Revelation) বলিয়া বিশ্বাস করি না, কেবল যুক্তির দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে যত দূর স্থির করা যাইতে পারেও তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতামত কি তাহাই আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পুরুষগণ যাহা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন তাহাই যে বিনা যুক্তিতে অনুসরণ করিতে হইবে এ কথা সঙ্গত নহে। আমরা নিরীশ্বরবাদী নহি; তবে অন্ধের ন্যায় অযৌক্তিক বিশ্বাসের অনুমোদন করি না।

সাধারণতঃ ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুনিক, নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র হীন বলা হইয়া থাকে। ঈশ্বরের উপাসনা না করিলে পাপী হইতে হয়; নরকে যাইতে হয় ইত্যাদি লোক প্রচলিত চিরাভ্যস্ত উপদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি আছে বলিলেই হয় ত অনেকে আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইবেন। তথাপি নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে আমাদের স্বকপোলকল্পিত নূতন তত্ত্ব অধিক নাই। সর্ব্বপরিচিত মহাত্মাদের ধীশক্তি সমুদ্ভূত এতৎসম্বন্ধীয় তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া আমরা লিখিতেছি।

আমাদের আলোচ্য মূল বিষয় কয়েকটী এইরূপ নির্দ্দেশ করিলাম।

১ম। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তন্মধ্যে যেটি আমাদের বিবেচনায়

সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত বোধ হয়, সেটীর বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

২য়। সকল ধর্ম্মের কেন্দ্রীভূত ঈশ্বরের যে সকল গুণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহার বিচার করা যাইবে। বর্ত্তমান কালের উন্নত বিজ্ঞান ঐ সকল গুণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিতে পারে কি না তাহাও দেখিব।

৩য়। ধর্ম্মে বিশ্বাস (Religious faith) দ্বারা মানবমণ্ডলী যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, বিশ্বাস বিনষ্ট হইলে তাহা অন্তর্হিত হইতে পারে কি না? ধর্ম্ম দ্বারা আমরা এখনও যে সকল উপকার পাইতেছি ও ভবিষ্যতে পাইবার আশা করি, তাহা অন্য কোন সহজ সুদৃঢ় উপায় দ্বারা সাধিত হইতে পারে কি না এই দুইটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

৪র্থ। এই সকল বিচারের পর আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হওয়া উচিত, এবং কার্য্য ক্ষেত্রেই বা কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

প্রথমতঃ। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সাধারণতঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞান-বিরোধী—; সে সকল খণ্ডন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা কেবল বিরক্তিকর হইবে এবং বিশেষ ফলদায়কও হইবে না; তবে যাহা বিজ্ঞান সম্মত কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

কৌশলময়ী কোন ক্রিয়া দেখিলেই তাহার কর্ত্তাকে বুদ্ধিজীবী বলিয়া উপলব্ধি হয়। জীবদেহে যে সকল অদ্ভুত কৌশল দেখিতে পাওয়া যায় ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে একই প্রকার উপায় সংস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে ইহার একজন বুদ্ধিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন পণ্ডিতবর নিউটন ও লাপলাসের পূর্ব্বে, জড় জগতের অদ্ভুত গতিপ্রণালী দেখিয়া গ্যালিলিও, কেপ্লার প্রভৃতি মহাত্মাগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ গতিই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কৃত হইবার পর আর তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইল না; তখন ঈশ্বর যে জড় জগতের গতিতে হস্তক্ষেপ করেন না ইহাই সকলের উপলব্ধি হইল। তদ্রূপ যদি জীবদেহের কৌশল সমুদায় ও কোন কালে অন্ধ জড় নিয়মের ফল বলিয়া স্থিরীকৃত হয় তাহা হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রচলিত প্রমাণ বিচলিত হইবে; কিন্তু, তাহার সম্ভাবনা হইয়াছে। যে Evolution theory এক্ষণে বিলাতে কতকগুলি মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকদের মন আকৃষ্ট করিয়াছে তাহা যাঁহারা বিশেষ অনুশীলন করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন যে প্রকৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণ নিয়মের ফল জীবদেহের সমুদয় কৌশল।

দ্বিতীয়তঃ। ঈশ্বরের গুণসম্বন্ধে সাধারণতঃ এই বিশ্বাস যে, সর্ব্বশক্তিমত্তা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বমঙ্গলময়তা এ তিনটী গুণ না থাকিলে ঈশ্বর ঈশ্বরই নহেন, কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

প্রথম সর্ব্বশক্তিমত্বা, সর্ব্বজ্ঞতা এবং সর্ব্বমঙ্গলময়তা এই তিনটী শব্দের যথার্থ এবং পূর্ণ অর্থ, বোধ হয়, সকলেই বিদিত আছেন, তবে শর্ব্বশক্তিমত্বা শব্দটী আমরা কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি তৎসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

যদি কোন শক্তিসমগ্র মানব জাতির শক্তি সমষ্টির কোটী কোটী গুণ হয় তাহা হইলেই যে সেই শক্তিকে অসীম বলিতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই, যাহাকে অসীম ক্ষমতা বলা যায় তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সে ক্ষমতার সম্মুখে কোন বিঘ্নই বিঘ্ন বলিয়া গণ্য হইবে না। যতই অধিক হউক না কেন যে শক্তি বিঘ্ন ব্যাঘাতের অধীন, তাহাকে কখন অসীম বলিব না। বলা বাহুল্য যে আমরা সর্ব্বশক্তি ও অসীম শক্তি এক অর্থে প্রয়োগ করিতেছি ও এই প্রবন্ধের অন্যান্য স্থানেও সেই রূপ করিব।

প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় পুরুষের কোন কৌশল অবলম্বন করার আবশ্যক নাই। যাহাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ তাহারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার জন্য কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে ও তাহাদের কৌশলময় কার্য্যের কোন কোন অংশ জটিল ও অসম্পূর্ণ হইয়া পড়ে। মনুষ্যের কৌশলের জটিলতার কারণ তাহাদের অল্প জ্ঞান ও অল্প বুদ্ধি। ঈশ্বরের কৌশলময়ী সৃষ্টিতেও অসম্পূর্ণতা ও জটিলতা দৃষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ঐ গুণত্রয় তাঁহাতে যে যুগপৎ অবস্থিত ইহা স্বীকার করিতে আমরা যে কেন প্রস্তুত নহি তাহা দেখাইতেছি।

মনুষ্যদেহের অংশ সকল যে যে কার্য্য সাধন করিবার অভিপ্রায়ে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা সেই সেই কার্য্য করে ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু তৎকার্য্যকারিতা সর্ব্বতোভাবে অসম্পূর্ণতা, দোষবিহীন, বা জটিলতা বিরহিত কি না তাহা দেখুন। কে না স্বীকার করিবে যে "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং?" অল্প কারণেই শরীরস্থ যন্ত্র সকলের বিশৃঙ্খলা হইয়া থাকে। অতএব এই কৌশলময় যন্ত্র একবারে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নহে। ইচ্ছাময়, মঙ্গলময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর মনে করিলে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায়ে অল্প কৌশল অবলম্বন করিয়া, বা একবারে কৌশলবিবর্জ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট এরূপ মানবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, যে তাহা ব্যাধিমন্দির হইত না, এত ক্ষণভঙ্গুরও হইত না। যদি কেহ বলেন ঈশ্বর এরূপ কেন করিয়াছেন, ওরূপ কেন করেন নাই, তাহা আমাদের আলোচনা করিবার অধিকার নাই; যাহা

করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার মহিমা, করুণা, ক্ষমতা সকলই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে, অবশ্য ঈশ্বর তাঁহার যতদূর মহিমা, করুণা, ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারেন তাহা করিয়াছেন ও তাঁহার ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তবে সকল বিঘ্ন ব্যাঘাত তিনি অতিক্রম করিতে পারেন না, তন্নিবন্ধন বিঘ্ন বশবর্ত্তী হইয়া তিনি এই রূপ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত শক্তিমত্ত্বা প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমত্ত্বা প্রকাশ পাইতেছে না, তাঁহার শক্তি সীমিত। তাঁহার করুণা অসীম হইলেও তিনি তাঁহার শক্তির অধিক কিছুই করিতে পারেন নাই। যতদূর চেষ্টা করিতে হয় করিয়াছেন ও যতদূর পারেন ততদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ততদূর পর্য্যন্ত তাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহার মহিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তন্নিমিত্ত তিনি আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র! কিন্তু তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন।

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বজ্ঞ বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হইবে। কিম্বা যদি তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার লেশ মাত্র হীন বলিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান বলা যাইতে পারে না।

যাঁহারা বলেন যে ঈশ্বর তাঁহার বিদ্যমানত্বের চিহ্ন চারি দিকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন ও তদভিপ্রায়েই কৌশল সমুদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কি ইহা চিন্তা করিবার বিষয়ীভূত হইতে পারে না যে; যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার পক্ষে এই অকিঞ্চিৎকর স্বার্থের জন্য এত কৌশল প্রদর্শন করিয়া জীবগণকে এত কষ্ট দিবেন না? যিনি সর্ব্বশক্তিমান তিনি যদি তাঁহার নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অন্য কোন সহজ উপায়েই করিতে পারিতেন। কিন্তু যদি আমরা তাঁহার শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই তাহা হইলে আর তাঁহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয় না, এবং তাঁহার সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া ইহাই অধিক সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবগণকে কষ্ট দিতে উৎসুক নন, তবে যে জীবগণ কষ্ট পায় সে কেবল তাঁহার সৃষ্টিকৌশলের অসম্পূর্ণতা হেতু জীবগণকে যন্ত্রণা দিবার জন্য তাহাদের শরীরের মধ্যে কোন বিশেষ কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে এমত দৃষ্ট হয় না; তবে তাহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করে সে সকল কেবল তাহাদিগকে অধিক যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিবারনিমিত্ত, কিম্বা তাহাদের সাচ্ছন্দ্য বিধানর্থ সৃষ্ট কোন শরীরাংশের অসম্পন্নতা নিমিত্ত। একথা শরীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান না বলিলে তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে কোন বিশেষ আপত্তি নাই, তবে সর্ব্বজ্ঞ বলিলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে

যে তিনি জানিয়া শুনিয়া এরূপ অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না, কারণ তাহা হইলে আমাদের তাঁহাকে একপ্রকারে নিষ্ঠুর বলা হয়, অথচ আমরা অন্যান্য বিষয়ে ও বিশেষতঃ জীবদেহ নির্ম্মাণ কৌশলে দেখিতে পাইতেছি যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক নিষ্ঠুরতা করেন নাই। যদি কেহ বলেন যে তিনি নিষ্ঠুর নহেন কেবল ক্রমশঃ উন্নতি করিবার নিমিত্ত জানিয়াও অসম্পূর্ণ সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই যে, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সৃষ্টি করিতে জানেন না, শিখিবেন বলিয়া চেষ্টা করিতেছেন সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন না।

ফলতঃ যদি ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান হন এবং জড় জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ যদি তাঁহারই সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে এই দুই জগতের যেখানে যে অসম্পূর্ণতা আছে তাহা তাঁহার জ্ঞানকৃত ও স্বেচ্ছাসম্মত কার্য্য। যাঁহারা বলেন যে মনুষ্যের সুখ দুঃখ তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার (Free will) ফল, তাঁহাদিগকে আমরা বলি যে সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনইচ্ছার ফল স্থানে স্থানে যেমন সুখকর হইয়া থাকে তেমনি আবার স্থানে স্থানে বিষময়ও হইয়া থাকে ; ইহা জানিয়াও কেন মনুষ্যকে স্বাধীন ইচ্ছা দেওয়া হইয়াছে ?

তৃতীয়তঃ। ধর্ম্মে বিশ্বাসের কথা। ধর্ম্মে বিশ্বাস বলিলে, সাধারণতঃ লোকে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও পরম কারুণিক ঈশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, পরলোকের অস্তিত্ব ও ইহ- লোকের কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগ এই কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বাস বুঝিয়া থাকেন। আমরাও সেই অর্থেই "ধর্ম্মে বিশ্বাস" পদটি ব্যবহার করিব। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে ধর্ম্মে বিশ্বাসের দ্বারা মনুস্যজাতির কি উপকার হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে পারে।

মনুষ্যের স্বার্থসাধন প্রবৃত্তি (Selfishness) অতীব বলবতী। কিন্তু মনুষ্যের শক্তি যেরূপ অল্প ও নৈসর্গিক নিয়ম সমুদয় যেরূপ অপরিবর্ত্তনীয় তাহাতে স্বতন্ত্র হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিলে একজন বহুকাল পরিশ্রম করিয়াও অধুনাতন সুখ সাচ্ছন্দ্য ও জ্ঞানের শতাংশের এক অংশও লাভ করিতে পারিত না, সুতরাং দলবদ্ধ হইয়া সকলের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করাই নিজ উন্নতির প্রধান উপায় ; কিন্তু সমাজের আদিম অবস্থায় লোকে ইহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারে নাই ; সমাজের ক্রমোন্নতি সহকারে অল্প দিন হইল মনুষ্য এই উপায় বুঝিতে সক্ষম হইয়াছে ; ইহার পূর্ব্বে ধর্ম্মই সকল মনুষ্যকে এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া একত্রে রাখিয়া প্রকারান্তরে সমাজ সৃজন করিয়াছে।

যে সকল পণ্ডিতেরা কেবল প্রয়োজন বলিয়া ধর্ম্মপক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মে বিশ্বাস না থাকিলে লোকে নীতিঅনুযায়ীক কার্য্য-করার আবশ্যকতা বোধ করিতে পারে না। তাঁহাদের মতে পরলোকে পুরস্কার তিরস্কারের ভয় না থাকিলে লোকে যথেচ্ছাচারী হইবে, সমাজবন্ধন এক বারে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহাদিগকে আমরা এই উত্তর দিই যে যদি লোকে বুঝিতে পারে যে নীতির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তি পরলোকে পুরস্কার তিরস্কারের উপর স্থাপিত নহে, তদপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী ও অধিক প্রয়োজনীয় সমাজ বন্ধনে সংস্থাপিত, তাহা হইলে ধর্ম্মে বিশ্বাস বিনষ্ট হইলেও নীতির ভিত্তি বিচলিত হইবার কোন আশঙ্কা নাই, ও মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবারও কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

পরলোকের ভয়ই মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে সত্য। কিন্তু পরলোকের ভয় অপেক্ষা লোকনিন্দার ভয় অধিক কার্য্যকারী। আমরা দেখিতে পাই যে লোকে প্রকাশ্যে সাধারণ সমীপে মিথ্যা কথা কহিতে যে পরিমাণে ভীত ও কুণ্ঠিত হয়, অন্যত্র ও সাধারণতঃ কথাবার্ত্তায় তত পরিমাণে সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু ধর্ম্ম মিথ্যা মাত্রকেই পাপ বলিয়া পরিগণিত করে। আরও আমরা দেখি যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পক্ষে ব্যভিচার সমভাবে ধর্ম্ম-নিষিদ্ধ কিন্তু সমাজ ব্যভিচারিণীকে যেরূপ ঘৃণা করে ও যত দণ্ড দেয় ব্যভিচারীকে তাহার শতাংশের একাংশও দণ্ডার্হ বিবেচনা করে না। ইহার ফলস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই যে ব্যভিচারিণী হইতে স্ত্রীলোক যেরূপ ভীত, ব্যভিচারী হইতে পুরুষ কখনই ততদূর ভীত নয়, সুতরাং ব্যভিচার করণে ভয় যতদূর লোকনিন্দাভীতি হইতে সমুদ্ভূত হয় ধর্ম্মোপদেশ বা পরলোকে নরকযন্ত্রণার ভয় হইতে ততদূর উৎপন্ন নহে।

এদিকে পরলোকে পুরস্কারের আশা অপেক্ষা ইহ জগতে যশোলাভের আশা মনুষ্যকে সৎকার্য্যে উত্তেজিত করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ করিলে যে ফল লাভ হইবে অবস্থানুরূপে অল্পব্যয়ে ঐ শ্রাদ্ধকার্য্য ভক্তি সহকারে সাধন করিলেও ফল, বরং ভক্তির তারতম্য অনুসারে ফলের ন্যূনাধিক্য হয়; কিন্তু যিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধ করেন তিনিই অধিক যশোভাজন হইয়া থাকেন বলিয়া লোকে অনাবশ্যক ঋণ করিয়া—ঋণ-করণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও ঋণ করিয়া—পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে বহু ব্যয় করে। সুতরাং পরলোকে পুরস্কার লাভের আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা ইহ জগতে যশোপার্জ্জনের ইচ্ছা মনুষ্যকে সৎকার্য্যে অধিক পরিমাণে উত্তেজিত করে।

লোকে মনে করে যে মৃত্যু বড় ভয়ানক, মরিতে হইবে ইহা ভাবিতে আমা-

দের হৃদয় যে কম্পিত হয়, উন্নতির চেষ্টা যে দূরে যায়, যাহাদিগকে আমরা জীবন অপেক্ষা অধিক ভাল বাসি তাহাদের সহিত পুনর্মিলনের আশা যে থাকে না, এসকলের হেতু ধর্ম্মে ও পরলোকে অবিশ্বাস, ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, চিরকালের নিমিত্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইব এই চিন্তা তত ভয়ানক নহে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য ও শ্রেষ্ঠ মোক্ষ নির্ব্বাণ, অর্থাৎ জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিনাশ, এই মত এককালে পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক গ্রহণ করিয়াছিল। যদি নির্ব্বাণচিন্তা এত ভয়ানক হইত তাহা হইলে যে ধর্ম্মে নির্ব্বাণই মোক্ষ সে ধর্ম্ম কখনই এত লোকে গ্রহণ করিত না।

ধর্ম্ম এবং কাব্য (poetry) এই দুইটীতে অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই আমাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শধারণ করে, উভয়েই আমাদিগকে অনেক অসীম সুখের আশা প্রদান করে, এই শোকসঙ্কুল, হাহাকাররবপূর্ণ, অন্যায়াচরণ বিধ্বস্ত জগতে যদি লোকের পরকালে সুখভোগের আশা না থাকিত তাহা হইলে দুঃখ প্রপীড়িত জনগণ দিনান্তে বহুশ্রমার্জ্জিত কদন্ন মুষ্টিও উদরস্থ করিতে পারিত না। কাব্যরসাস্বাদন ও ধর্ম্মভাব কেবল মনুষ্যের মনে নানা কাল্পনিক সুখ ও আশ্বাস প্রদান করিয়া কথঞ্চিৎ তাহাদিগকে জীবনভার বহন করিতে সক্ষম করিয়াছে; তবে কাব্য ও ধর্ম্মে বিভিন্নতা এই যে, কাব্যের কল্পনাতে আমরা আনন্দ অনুভব করি বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছু বিশ্বাস থাকে না; কিন্তু ধর্ম্মে আমাদিগকে যে সকল ভাবী সুখের আশ্বাস প্রদান করে তাহাতে আমাদের বিশ্বাস থাকে। যদিও এই সকল বিশ্বাস আপাততঃ সুখদায়ক তথাপি এসকল বিশ্বাস কতদূর যুক্তিমূলক তাহাও আমাদের চিন্তা করা উচিত। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যে রূপ অন্যায়াচরণ হইয়া থাকে ও সাধারণতঃ লোকের যেরূপ কষ্ট তাহাতে পারলৌকিক সুখে বিশ্বাস করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু আমরা আশা করিলে করিতে পারি যে, সময়ে জ্ঞানের উন্নতির সহিত মনুষ্যের ইহলৌকিক সুখসমষ্টি এত বর্দ্ধিত হইবে ও দুঃখভার এত হ্রাস হইবে যে তখন আর বিশ্বাসের অত্যল্পই প্রয়োজন থাকিবে। এবং সমগ্র মানবজাতির সেই জ্ঞানোন্নতি, এবং তাহা হইতে শক্তি ও সুখবৃদ্ধির ও দুঃখনিবারণের আশাকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত করিতে পারি। অনেকেই বলিবেন যে এই নশ্বর মনুষ্যজীবনের সুখের আশা রূপ ধর্ম্ম কি অবিনশ্বর আত্মার চিরন্তন সুখের আশারূপ ধর্ম্মের সহিত তুলিত হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই বলিতে পারি যে যদিও একজন মনুষ্যের জীবন ক্ষণস্থায়ী তাহা বলিয়া সমগ্র মানবজাতির জীবন ক্ষণস্থায়ী নহে, এবং সমগ্র মনুষ্যজাতির সুখের উন্নতির চেষ্টাও সামান্য বিষয় নহে। ফলতঃ

কম্‌টনামক ফরাশীদেশীয় প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতে সমগ্র মনুষ্যজাতির সুখের উন্নতিচেষ্টাই মনুষ্যজাতির প্রধান ও একমাত্র ধর্ম্ম হওয়া উচিত। এই ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত তিনি অনেকের নিকট উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। এই ধর্ম্মের দোষগুণসম্বন্ধে আমরা এক্ষণে অধিক কিছু বলিব না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, সমাজবন্ধন, লোকদিগকে পাপ হইতে নিবৃত্ত রাখা, পরস্পরের উপকার করা ও অপকারী ক্রিয়া হইতে বিরত রাখা প্রভৃতি যে সকল কার্য্য, পরলোকে তিরস্কার ভয় ও পুরস্কার লোভ ইত্যাদির দ্বারা ঐশ্বরিক ধর্ম্ম, সংসাধন করে, সেই সকল কার্য্য লইয়া এই ধর্ম্ম, অধিকন্তু এ ধর্ম্ম ঐশ্বরিক ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক যুক্তিযুক্ত; ইহার আরও একটী গুণ এই যে ঐশ্বরিক ধর্ম্মে স্বার্থ চিন্তা যতদূর নিকটবর্ত্তী ইহাতে তত্তদূর নহে। ঐশ্বরিক ধর্ম্মে পরলোকে সুখলাভের অভিলাষই মনুষ্যকে পুণ্যকার্য্যে উত্তেজিত করে, কিন্তু এধর্ম্মের মতে যদিও নিজের উন্নতির নিমিত্তই সমগ্র মানবজাতির উন্নতি চেষ্টা বিহিত তথাপি সমুদয় মানবজাতির উন্নতিচেষ্টাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং আমরা যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান বলিতে প্রস্তুত নহি অথচ ইহাও জানি যে আমাদের সুখবৃদ্ধি হওয়াই তাঁহার ইচ্ছা তখন তাঁহার সেই ইচ্ছা সফল করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে তাঁহাকে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার প্রধান উপায়। কেহ বলিতে পারেন যে, আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণী কেমন করিয়া তাঁহার সাহায্য করিবে? তদুত্তরে বলি যে সমগ্র মনুষ্যজাতি একত্র হইয়া চেষ্টা করিলে, ও উন্নতিই তাহাদের লক্ষ্য হইলে, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইবার যে অনেক সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ধর্ম্মের বিপক্ষে কেহ কেহ এই মাত্র বলিতে পারেন, যে আত্মার অবিনশ্বরত্বে বিশ্বাস না থাকায় আত্মীয়জনের সহিত পুনর্মিলনের কোন আশা থাকে না, সুতরাং তদুত্তরে এই চিন্তা আমাদের কষ্টকর হয়। আমরা বলি যে এই ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে হইলে আত্মাকে যে নশ্বর বলিতেই হইবে এমত কোন কারণ নাই। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতির নিয়মই এই যে, নিকৃষ্ট প্রকৃতির দ্রব্য হইতে ক্রমশঃ উৎকৃষ্ট প্রকৃতির দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়। জড় পদার্থ হইতে রসগ্রহণ করিয়া সজীব উদ্ভিদ্ বর্দ্ধিত হয়, আবার উদ্ভিজ্জরস গ্রহণ করিয়া সচেতন জীবদেহ পুষ্ট হয় এবং সেই জীবরাজ্যের শ্রেষ্ঠ মনুষ্য; সুতরাং ইহা আমরা ভাবিতে পারি যে মনুষ্যের আত্মা এই সকল অপেক্ষা অধিক সম্পূর্ণ ও নির্দ্দোষ। এবং ইহাও বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর নহে। আমরা যাহা লিখিলাম তাহা যদিও আত্মার অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং সেই কারণে আমাদের আত্মার

অনীশ্বরত্বে বিশ্বাসোৎপাদক হইতে পারে না; তথাপি আমরা আত্মার অবিনশ্বরত্বের আশা করিতে পারি। ইহাও ভাবিতে পারি যে যদিও ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন তথাপি যিনি ক্ষমতাবলে আমাদিগের এই সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিয়াছেন তিনি আমাদের সুখের নিমিত্ত হয় ত আত্মাকে অবিনশ্বর করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতএব ঐশ্বরিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া এধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে আত্মাকে নশ্বর বলিতেই হইবে তাহা নহে। প্রত্যুত যদিও আত্মাকে অবিনশ্বর বলিবার আমাদের কোন বিশেষ প্রমাণ নাই, নশ্বর বলিবারও কোন প্রমাণ নাই, বরং অবিনশ্বরত্বের কিঞ্চিৎ আশা আছে।

এখন আমরা এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে,এককালে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ ও নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রহীন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান কোন প্রমাণ দিতে পারে না, কিন্তু সসীম ক্ষমতাশালী বহুজ্ঞানসম্পন্ন দয়ালু এক ঈশ্বর আছেন, ইহার প্রমাণ কথঞ্চিৎ পাওয়া যায়। এরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা দ্বারা কোন ফল লাভ করিবার আশা করা যাইতে পারে না; কারণ তিনি অপরিবর্ত্তনীয় নৈসর্গিক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন, অথবা হয় ত, তিনিও ঐ সকল নিয়মের অধীন, সুতরাং সমস্ত জগতবাসী সমস্বরে একবিন্দু বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি নৈসর্গিক নিয়ম সকল ভঙ্গ করিয়া প্রার্থয়িতৃগণের মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতির কোন কার্য্যই নিয়মবহির্ভূত নহে। মেঘ না হইলে বৃষ্টি হয় না, সমুদ্র হইতে সূর্য্য কর্তৃক বাষ্প উত্থাপিত না হইলে মেঘ হয় না, আবার সেই মেঘ শীতল না হইলে বৃষ্টি হয় না। অকস্মাৎ একটি পরমাণুও সৃষ্টি করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। উপাসনা অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে আমাদের বিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের মতে মিথ্যা বাক্যব্যয় করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা কার্য্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই প্রকৃত কৃতজ্ঞতা। এবং যখন আমাদের সুখসমৃদ্ধি তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, তখন তাঁহার সেই উদ্দেশ্যসাধনার্থ জীবগণের উপকার ও উন্নতির চেষ্টা করা প্রকৃত কৃতজ্ঞতার কার্য্য। সুতরাং জীবগণের উপকার ও তাহাদের ক্লেশ নিবারণের ও উন্নতির চেষ্টা করাই আমাদের মতে প্রধান ধর্ম্ম।

যদিও পরলোকের কিয়ৎপরিমাণে আশা করি তথাপি আমরা ইহা বলিতে পারি না যে পরলোক পাপপুণ্যের তিরস্কার পুরস্কারের স্থান; কারণ, সে কথা বলিবার কোন প্রমাণ নাই, বরঞ্চ তাহার বিরুদ্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, নৈসর্গিক নিয়মভঙ্গের ফল এই স্থানেই আমরা ভোগ করি; ধর্ম্মের

নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরের অনিষ্ট করিলে এই ধর্ম্মের (Religion of Humanity) মতে প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ও পরোক্ষভাবে নিজের অনিষ্ট ঘটে। ইহা সমধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে যদি পরলোক থাকে, তথায়ও নিয়মানুসারে ও নিজ নিজ কার্য্যানুসারে আমাদের ফলভোগ হইবে, আর এখানকার অধিকাংশ সুখদুঃখ শরীরধারণজনিত, সুতরাং যে লোকে এই শরীর সঙ্গে যাইবে না সে লোকে এখানকার সুখদুঃখ ভোগ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই, তবে যদি নূতনপ্রকারের সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা যে আবার তথায় নূতন কার্য্যক্ষেত্রে নূতন কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিব না তাহারই বা প্রমাণ কি? ইহাও ভাবিতে পারি না যে, যে ঈশ্বরকে পরমকারুণিক, নিষ্ঠুরতার লেশমাত্রহীন বলিতেছি, আবার তাঁহাকেই নরকের স্মৃষ্টিকর্ত্তা মনে করিতে হইলে আমাদের বিচারশক্তিকে অতলস্পর্শ সাগরে অগ্রে নিমগ্ন করিতে হয়; যে পুরুষ নরক স্মৃষ্টি করিতে পারেন, আমরা তাহা অপেক্ষা নিষ্ঠুরলোক এ জগতে দেখিতে পাই না। অতএব আমরা আমাদের ঈশ্বরকে নরকের স্মৃষ্টিকর্ত্তা ও পরলোককে পুরস্কার তিরস্কারের স্থান বলিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের মতে সুখোৎপাদন ও দুঃখোৎপাদন এই দুইটি পাপপুণ্যের পরিমাপক নিজের স্বার্থের জন্য অর্থাৎ পরলোকে দুঃখনিবারণ ও সুখভোগ করিবার জন্য আমরা পুণ্যকার্য্যে রত ও পাপ হইতে বিরত হইতে বলি না। তবে পাপ হইতে বিরত ও পুণ্যকার্য্যানুষ্ঠানে রত হইবার প্রয়োজন এই যে, তদ্দ্বারা সমাজের উপকার হইতে থাকিবে এবং তজ্জন্যই আমরা নিজেও অবশ্য উপকৃত হইতে থাকিব।

শ্রী অঃ

আনন্দ মঠ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জীবানন্দ কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেলে পর, শান্তিদেবী আবার সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু রবে গীত করিতে লাগিলেন।

"প্রলয় পয়োধিজলে, ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

গোস্বামী বিরচিত মধুর স্তোত্র যখন শান্তিদেবী কণ্ঠ নিঃসৃত হইয়া রাগ তাল লয় সম্পূর্ণ হইয়া সেই অনন্ত কাননের অনন্ত নীরব বিদীর্ণ করিয়া, পূর্ণ জলোচ্ছাসের সময়ে বসন্তানিল-তাড়িত তরঙ্গ ভঙ্গের ন্যায় মধুর হইয়া আসিল, তখন তিনি গায়িলেন।

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে।

তখন বাহির হইতে কে অতি গম্ভীর রবে গায়িল, গম্ভীর মেঘ গর্জ্জনবৎ তানে গায়িল,

ম্লেচ্ছ নিবহ নিধনে কলয়সি করবালং
ধূমকেতু মিব কিমপি করালং
কেশব ধৃত কল্কিশরীর
জয় জগদীশ হরে।"

শান্তি গলা চিনিল, বলিল "রহ্ পোড়াকপালীর ছেলে! বুড়ো বয়সে তুমি মেয়েমানুষের সঙ্গে গায়িতে এসো!" এই বলিয়া শান্তি সারঙ্গের তারগুলি আর একটু চড়াইয়া লইয়া, কণ্ঠ আর একটু উচুতে তুলিয়া দিয়া, গায়িল

বেদানুদ্ধরতে, জগন্তি বহতে,
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে, বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে,
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে।
ম্লেচ্ছান্মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।

বলিতে বলিতে সে দীর্ঘ তান সেই উচ্চৈঃরব সে গগন বিদারক তান ছাড়িয়া দিয়া শান্তি গায়িল

শ্রিত কমলা, কুচমণ্ডল
ধৃত কুণ্ডল কলিত ললিত বনমাল
জয় জয় দেব হরে।"

বাহির হইতে যে সঙ্গে গায়িতেছিল সে আর সহ্য করিতে পারিল না। শ্বেত শ্মশ্রু, শ্বেত কান্তি, শ্বেত বসন, শ্বেত পুষ্পাভরণ লইয়া আসিয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল,—বলিল "মা গাও, তোমা হইতে সনাতন ধর্ম্ম উদ্ধার হইবে, গাও" বলিয়া আপনি গাইল,

দিনমণিমণ্ডন, ভবখণ্ডন
মুনিজনমানস হংস—

শান্তি ভক্তিভাবে প্রণত হইয়া সত্যানন্দের পদধূলি গ্রহণ করিল, বলিল "প্রভো! আমি এমন কি ভাগ্য করিয়াছি যে, আপনার শ্রীপাদপদ্ম এখানে দর্শন পাই—আজ্ঞা করুন আমাকে কি করিতে হইবে" বলিয়া সারঙ্গে সুর দিয়া শান্তি আবার গায়িল

"তব চরণ প্রণতাবয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।"

সত্যানন্দ বলিল "মা তোমার কুশলই হইবে।"

শান্তি। "কিসে ঠাকুর—তোমার তো আজ্ঞা আছে আমার বৈধব্য"

সত্যা। "তোমাকে আমি চিনিতাম না, চিনিলে আমি বলিতাম হে জীবানন্দ! আমার নিকট শপথ কর যে তুমি পত্নীসহবাস ত্যাগ করিবে না। মা আমার এক ভিক্ষা আছে, তুমি স্ত্রীবেশ আর গ্রহণ করিও না। সন্তান বেশ গ্রহণ করিয়া অসি চর্ম্ম বল্লম গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তানসেনা মধ্যে প্রবেশ কর।"

শান্তি। "প্রভো এ আজ্ঞা আমায় কেন করেন? আপনার আজ্ঞায় শিবের শত্রু জয় করিয়াছি, বিষ্ণুর শত্রুও জয় করিতে হইবে? বলিয়া শান্তি গায়িল,

"মধু মুর নরক বিনাশন—
গরুড়াসন সুরকুল কেলি নিদান
অমল কমলদল লোচন
ভব মোচন ত্রিভুবন ভবনিধান
জয় জয় দেব হরে।"

বাবা! আপনি চুপ করিয়া রহিয়াছেন কেন, দেখিতেছেন না কি কাণ্ড হইতেছে?

সত্যা। কি কাণ্ড হইতেছে?

শান্তি। আপনি কি জানেন না?

সত্যা। সকল জানি না।

শান্তি। তবে আমি কাল বলিব। কিন্তু একটা কথা আমার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে—আমার স্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণ আমি। মৃত্যুদণ্ড তাঁহার কপালে বিধান। তিনি ধর্ম্মে পতিত হইয়াছেন, তাঁহাকে মরিতে হইবে। সুতরাং আমাকেও মরিতে হইবে। কিন্তু আপনার কার্য্য উদ্ধার হইবে কি? কে কার্য্যোদ্ধার করিবে?"

সত্যা। মা দড়ীর জোর না বুঝিয়া আমি জেয়াদা টানিয়াছি, তুমি আমার অপেক্ষা জ্ঞানী; ইহার উপায় তুমি কর, জীবানন্দকে বলিও না যে আমি সকল জানি। তোমার প্রলোভনে তিনি জীবন রক্ষা করিতে পারেন। এতদিন করিতেছেন। তাহা হইলে আমার কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।"

সেই বিশাল নীল উৎফুল্ল লোচনে নিদাঘ কাদম্বিনী বিরাজিত বিদ্যুতুল্য ঘোর রোষ কটাক্ষ হইল। শান্তি বলিল "কি ঠাকুর! আমি আর আমার স্বামী এক আত্মা, যাহা যাহা তোমার সঙ্গে কথোপকথন হইল সবই বলিব। মরিতে

হয় তিনি মরিবেন, আমার ক্ষতি কি? আমি তো সঙ্গে সঙ্গে মরিব। তাঁর স্বর্গ আছে, মনে কর কি আমার স্বর্গ নাই।

ব্রহ্মচারী বলিল যে "আমি কখন হারি নাই, আজ তোমার কাছে হারিলাম। মা আমি তোমার পুত্র, সন্তানকে স্নেহ কর, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা কর, আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে।"

বিজলী হাসিল। শান্তি বলিল "আমার স্বামীর ধর্ম্ম আমার স্বামীর হাতে; আমি তাঁহাকে ধর্ম্ম হইতে বিরত করিবার কে? ইহলোকে স্ত্রীর পতি দেবতা কিন্তু পরলোকে সবারই ধর্ম্ম দেবতা— আমার কাছে আমার পতি বড়, তার অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম বড়, তার অপেক্ষা আমার কাছে আমার স্বামীর ধর্ম্ম বড়। আমার ধর্ম্মে আমি যেদিন ইচ্ছা জলাঞ্জলি দিতে পারি; আমার স্বামীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিব? মহারাজ! তোমার কথায় আমার স্বামী মরিতে হয় মরিবেন, আমি বারণ করিব না।"

ব্রহ্মচারী তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা মনের কথা সকল তোমায় বলি, জীবানন্দ বল, ভবানন্দ বল, মহানন্দ বল, যে কেহ বল আমার মনের কথা বুঝিবার যোগ্য তুমি ভিন্ন কেহ নহে। এ ঘোর ব্রতে বলিদান আছে। আমাদের সকলকেই বলি পড়িতে হইবে। আমি মরিব জীবানন্দ ভবানন্দ সবাই মরিবে, বোধ হয় মা তুমিও মরিবে; কিন্তু দেখ কাজ করিয়া মরিতে হইবে, বিনা কার্য্যে কি মরা ভাল— আমি কেবল দেশকে মা বলিয়াছি আর কাহাকেও মা বলি নাই, কেন না সেই সুজলা সুফলা ধরণী ভিন্ন আমরা অনন্যমাতৃক। তোমাকে কেবল মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর যাহাতে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হয় তাহা করিও, জীবানন্দের প্রাণরক্ষা করিও, তোমার প্রাণ রক্ষা করিও।"

এই বলিয়া সত্যানন্দ "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গায়িতে গায়িতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ক্রমে সন্তানসম্প্রদায় মধ্যে সম্বাদ প্রচারিত হইল যে সত্যানন্দ আসিয়াছেন, সন্তানদিগের সঙ্গে কি কথা কহিবেন, এই বলিয়া তিনি সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। তখন দলে দলে সন্তান সম্প্রদায় অজয়তীরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল। জ্যোৎস্না রাত্রিতে অজয়সৈকত পার্শ্বে বৃহৎ কানন মধ্যে আম্র, পনস, তাল, তিন্তিড়ী, অশ্বত্থ, বেল, বট, শাল্মলী প্রভৃতি বৃক্ষাদি রঞ্জিত মহা গহনে দশ সহস্র সশস্ত্র সন্তান সমবেত হইল। তখন সকলেই পরস্পরের মুখে সত্যানন্দের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মহা কোলাহলধ্বনি করিতে লাগিল। সত্যানন্দ কি জন্য কোথায়

গিয়াছিলেন, তাহা সাধারণে জানিত না। প্রবাদ এই যে তিনি সন্তানদিগের মঙ্গলকামনায় তপস্যার্থ হিমালয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন। আজ সকলে কানাকানি করিতে লাগিল "মহারাজের তপঃসিদ্ধি হইয়াছে—আমাদের রাজ্য হইবে।" তখন বড় কোলাহল হইতে লাগিল। কেহ চীৎকার করিতে লাগিল "মার মার নেড়ে মার" কেহ বলিল "জয় জয় মহারাজ কি জয়" কেহ গায়িল "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" কেহ গায়িল "বন্দে মাতরং" কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে তুচ্ছ বাঙ্গালি হইয়া রণক্ষেত্রে এ শরীর পাত করিব? কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে মসজিদ ভাঙ্গিয়া রাধামাধবের মন্দির গড়িব? কেহ বলে ভাই এমন দিন কি হইবে আপনার ধন আপনি খাইব? সহস্র নরকণ্ঠের কলকল রব, মধুর বায়ু সন্তাড়িত বৃক্ষপত্ররাশির মর্ম্মররব, সৈকতবাহিনী তরঙ্গিনীর মৃদু মৃদু তর তর রব, নীল আকাশে চন্দ্র তারা শ্বেত মেঘরাশি, শ্যামল ধরণীতলে হরিৎ কানন, নীল নদী, শ্বেত সৈকত, ফুল্ল কুসুমদাম। আর মধ্যে মধ্যে সেই সর্ব্বজন মনোরম "বন্দে মাতরং।" তখন সত্যানন্দ আসিয়া সেই সমবেত সন্তানমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইলেন। তখন সেই সহস্র সহস্র সন্তান মস্তক বৃক্ষবিচ্ছেদ পতিত চন্দ্রকিরণে প্রভাসিত হইয়া শ্যামল তৃণভূমে প্রণত হইল। অতি উচ্চৈঃস্বরে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয় বাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, "শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বনমালী বৈকুণ্ঠনাথ যিনি কেশিমথন মধুমুর মর্দ্দন লোকপালন তিনি তোমাদের মঙ্গল করুন, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন, ধর্ম্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাঁহার মহিমা গীত কর। তখন সেই সহস্র কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে লাগিল

"জয় জগদীশ হরে
প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্র মখেদং
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে।"

তখন সত্যানন্দ তাহাদিগকে পুনরায় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "হে সন্তানগণ, তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ কথা আছে। টমাসনামা এক জন বিধর্ম্মী দুরাত্মা বহুতর সন্তান নষ্ট করিয়াছে। আজ রাত্রে আমরা তাহাকে সসৈন্যে বধ করিব। জগদীশ্বরের আজ্ঞা—তোমরা কি বল?"

ভীষণ হরিধ্বনিতে কানন বিদীর্ণ করিল। "এখনই মারিব—কোথায় তারা দেখাইয়ে দিবে চল" "মার! মার! শত্রু মার!" ইত্যাদি শব্দে দূরস্থ শৈলে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন সত্যানন্দ বলিলেন, "সে জন্য আমাদিগকে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। ইংরেজের কামান আছে—কামান ব্যতীত ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ সম্ভবে না। বিশেষ

বড় বীরজাতি। পদচিহ্নের দুর্গ হইতে ১৭টা কামান আসিতেছে—কামান পৌঁছিলে আমরা যুদ্ধযাত্রা করিব। ঐ দেখ প্রভাত হইতেছে—বেলা চারিদণ্ড হইলেই—ও কিও!

গুড়ুম্—গুড়ুম্—গুম্! অকস্মাৎ চারিদিকে বিশাল কাননে তোপের আওয়াজ হইতে লাগিল। তোপ ইংরেজের। জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তানসম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘেরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

"গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।" ইংরেজের কামান ডাকিল। সেই শব্দ বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম।" অজয়ের বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল। "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" অজয়পারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল "গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্!" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ তোমরা কিসের তোপ। কয়েকজন সন্তান কাননমধ্যে আপনাদের অশ্ব বাঁধিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া দেখিতে ছুটিল, কিন্তু তাহারা কানন হইতে বাহির হইয়া কিছু দূর গেলেই শ্রাবণের ধারার ন্যায় গোলা তাহাদের উপর বৃষ্টি হইল, তাহারা অশ্বসহিত আহত হইয়া সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। দূর হইতে সত্যানন্দ তাহা দেখিলেন। বলিলেন "উচ্চ বৃক্ষে উঠ, দেখ কি।" তিনি বলিবার অগ্রেই জীবানন্দ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিতেছিল, সে বৃক্ষের উপরিস্থ শাখা হইতে ডাকিয়া বলিল "তোপ ইংরেজের।" সত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "অশ্বারোহী না পদাতি।"

জীব। দুই আছে।

সত্য। কত।

জীব। আন্দাজ করিতে পারিতেছি না, এখনও বনের আড়াল হইতে বাহির হইতেছে।

সত্য। গোরা আছে না কেবল সিপাহী।

জীব। রাঙামুখ আছে।

তখন সত্যানন্দ জীবানন্দকে বলিলেন "তুমি গাছ হইতে নাম।"

জীবানন্দ গাছ হইতে নামিল।

সত্যানন্দ বলিলেন "দশহাজার সন্তান উপস্থিত আছে; কি করিতে পার দেখ। তুমি আজ সেনাপতি।" জীবানন্দ সশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উল্লম্ফনে অশ্বে আরোহণ করিলেন। একবার নবীনানন্দ গোস্বামীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া নয়নেঙ্গিতে কি বলিলেন কেহ তাহা বুঝিতে পারিল না। নবীনানন্দ নয়নেঙ্গিতে কি উত্তর করিল তাহাও কেহ বুঝিল না, কেবল তারা দুইজনেই মনে মনে বুঝিল, যে হয় ত এ জন্মের মত এই বিদায়। তখন নবীনানন্দ দক্ষিণ

বাহু উত্তোলন করিয়া সকলকে বলিলেন "ভাই এই সময় গাও 'জয় জগদীশ হরে!' " তখন সেই দশসহস্র সন্তান এককণ্ঠে নদী কানন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, তোপের শব্দ ডুবাইয়া দিয়া সহস্র সহস্র বাহু উত্তোলন করিয়া গায়িল,

"জয় জয় জগদীশ হরে
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং—"

এমন সময়ে সেই ইংরেজের গোলাবৃষ্টি আসিয়া কাননমধ্যে সন্তান সম্প্রদায়ের উপর পড়িতে লাগিল। কেহ গায়িতে গায়িতে ছিন্নমস্তক, ছিন্ন বাহু, ছিন্ন-হৃৎ হইয়া মাটীতে পড়িল, তথাপি কেহ গীত বন্ধ করিল না, সকলে গায়িতে লাগিল "জয় জগদীশ হরে" গীত সমাপ্ত হইলে সকলেই একেবারে নিস্তব্ধ হইল। সেই নিবিড় কানন, সেই নদীসৈকত, সেই অনন্ত বিজন একেবারে গম্ভীর নীরবে নিবিষ্ট হইল, কেবল ইংরেজের সেই অতি ভয়ানক কামানের ধ্বনি আর দূরশ্রুত গোরার সমবেত অস্ত্রের ঝঞ্চনা ও পদধ্বনি।

তখন সত্যানন্দ সেই গভীর নিস্তব্ধ মধ্যে অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "জগদীশ হরি তোমাদিগকে কৃপা করিবেন এই সময় তোমরা তাঁহার কার্য্য কর— তোপ কতদূর?"

উপর হইতে একজন বলিল "এই কাননের অতি নিকট একখানা ছোট মাঠ পার মাত্র।"

সত্যানন্দ বলিল "কে তুমি?"

উপর হইতে উত্তর হইল "আমি নবীনানন্দ।"

তখন সত্যানন্দ বলিলেন "তোমরা দশসহস্র সন্তান আছ, তোমাদেরই জয় হইবে, তোপ কাড়িয়া লও।" তখন অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী জীবানন্দ বলিল "আইস।"

সেই দশসহস্র সন্তান—অশ্ব ও পদাতি, অতিবেগে, জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইল। পদাতির স্কন্ধে বন্দুক, কটীতে তরবারি, হস্তে বল্লম। কানন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবা মাত্র, সেই অজস্র গোলাবৃষ্টি পড়িয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। বহুতর সন্তান বিনা যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূমিশায়ী হইল। একজন জীবানন্দকে বলিল "জীবানন্দ, অনর্থক প্রাণিহত্যায় কাজ কি।"

জীবানন্দ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল ভবানন্দ—জীবানন্দ উত্তর করিল "কি করিতে বল।"

ভব। বনের ভিতর থাকিয়া বৃক্ষের আশ্রয় হইতে আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করি—তোপের মুখে পরিষ্কার মাঠে বিনা তোপে এ সন্তান সৈন্য এক দণ্ড টেঁকিবে না; কিন্তু ঝোপের ভিতর থাকিয়া অনেকক্ষণ যুদ্ধ করা যাইতে পারিবে।"

জীব। তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন তোপ

কাড়িয়া লইতে হইবে, অতএব আমরা তোপ কাড়িয়া লইতে যাইব।

ভব। কার সাধ্য তোপ কাড়ে। কিন্তু যদি যেতেই হবে, তবে তুমি নিরস্ত হও আমি যাইতেছি।

জীব। তা হইবে না—ভবানন্দ! আজ আমার মরিবার দিন।

ভব। আজ আমার মরিবার দিন।

জীব। আমার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভব। তুমি নিষ্পাপ-শরীর—তোমার প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমার চিত্ত কলুষিত—আমাকেই মরিতে হইবে—তুমি থাক, আমি যাই!

জীব। ভবানন্দ! তোমার কি পাপ তাহা আমি জানি না। কিন্তু তুমি থাকিলে সন্তানের কার্য্যোদ্ধার হইবে। আমি যাই।

ভবানন্দ নীরব হইয়া শেষে বলিল "মরিবার প্রয়োজন হয় আজই মরিব, যে দিন মরিবার প্রয়োজন হইবে সেই দিন মরিব, মৃত্যুর পক্ষে আবার কালাকাল কি।"

জীব। তবে এসো।

এই বলিয়া ভবানন্দ সকলের অগ্রবর্ত্তী হইল। তখন দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে গোলা পড়িয়া সন্তান সৈন্য খণ্ড বিখণ্ড করিতেছে, ছিঁড়িতেছে, চিরিতেছে, উল্টাইয়া ফেলিয়া দিতেছে, তাহার উপর ইংরেজের বন্দুকওয়ালা সিপাহী সৈন্য অব্যর্থ লক্ষ্যে সারি সারি সন্তানদলকে ভূমে পাড়িয়া ফেলিতেছে। এমন সময়ে ভবানন্দ বলিল "এই তরঙ্গে আজ সন্তানকে ঝাঁপ দিতে হইবে—কে পার ভাই? এই সময়ে গাও বন্দে মাতরং" তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহস্রকণ্ঠ সন্তান সেনা তোপের তালে গায়িল "বন্দে মাতরং"

বঙ্গদেশের পরাধীনতা।

পাঠশালার ছেলেরা শিখিয়াছে যে, সাতশত বৎসর হইল, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময় হইতে বঙ্গদেশের পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। ছেলেদের বয়স হয়, কিন্তু পাঠশালার কুশিক্ষা তাহাদের অন্তরে থাকিয়া যায়; এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে বঙ্গদেশের পরাধীনতা বহুদিনের। পাঠশালার পুস্তকপ্রণেতা বাহাদুরগণ দীর্ঘায়ু হউন, সি, এস, আই হউন, কিন্তু একবার তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, একবার বুঝিবার চেষ্টা করুন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বখ্‌তিয়ার খিলিজির সময়ে বাঙ্গালা পরাধীন হয় নাই; কোন মুসলমানের সময়ে বাঙ্গালা পরাধীন হয় নাই। ইংরেজেরা যখন দেওয়ানী লন তখনও বাঙ্গালা স্বাধীন, তাঁহারা যখন শাসনের ভার লন, তখনও বাঙ্গালা আপনার খায় আপনার পরে। তাহার পর কপাল ফাটিয়াছে। এই সম্প্রতি,—এই আমাদের সময় বাঙ্গালা পরাধীন হইয়াছে।

ইংলণ্ডেরও পরাধীনতা আরম্ভ হইয়াছে। যে দিন হইতে বিদেশী "সস্তা মাল" ইংলণ্ডের বাজারে স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতে তথাকার স্বাধীনতার আসন টলিয়াছে।

সস্তা বলিয়া লোকে বিদেশী মাল খরিদ করিতে থাকে, দেশী জিনিস সুতরাং আর বিক্রয় হয় না, ইহার প্রথম ফল, দেশী শিল্পের অবনতি; দ্বিতীয় ফল দেশী শিল্পের অন্তর্ধান; শেষ ফল বিদেশের প্রতি নির্ভর। শিল্পসংহারের বীজমন্ত্র আড়াই অক্ষর—"সস্তা"। "সস্তা" করিতে গেলে "ভেল" মিশাইতে হয়, ব্যয় খাট করিতে হয়, জিনিস মন্দ করিতে হয়, পুরুষানুক্রমে শিল্পসম্বন্ধে যে পারিপাট্য শিক্ষা হইয়াছিল তাহার লোপ করিতে হয়। ইহাতে যদি বিদেশী মালকে বাজার ছাড়া করিতে পারা গেল তবেই রক্ষা, নতুবা বিদেশের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে।

যে ব্যক্তি আপনার অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত অন্যের মুখাপেক্ষী হয়—অন্যের প্রতি নির্ভর করে, সে ব্যক্তি পরাধীন: সেই রূপ, যে দেশ অন্নবস্ত্রের নিমিত্ত বা সাংসারিক কোন সামগ্রীর নিমিত্ত অন্য দেশের প্রতি নির্ভর করে সে দেশও পরাধীন। এখনও আমাদের অন্ন জোটে সস্তা, কিন্তু বস্ত্রের নিমিত্ত বঙ্গদেশ পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে—ম্যানচেষ্টারের অধীন হইয়াছে। কয়েক বৎসরমধ্যেই বাঙ্গালির চরকা একেবারে চুপ করিয়াছে, সুতা এখন বিলাত হইতে আসিতেছে। অল্পদিনের মধ্যে শতকরা আশীখানা তাঁত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সাধারণের বস্ত্র এখন বিলাত হইতে আসিতেছে। যে

কয় খানি তাঁত অদ্যাপি আছে তাহা আর অধিক দিনের নিমিত্ত নহে।

ম্যানচেষ্টার এসকল ঘটাইতেছে, কাপাসে. কোষ্টা মিশাইয়া বাঙ্গালার বাজারে "সস্তা" কাপড় পাঠাইতেছে। আর রক্ষা নাই, বাঙ্গালার দুই তিন সহস্র বৎসরের শিল্পশিক্ষা লোপ পাইতে চলিল; বাঙ্গালার তাঁতি পূর্ব্বপুরুষের কারিগরি ভুলিয়াগেল; অন্নাভাবে তাহারা তন্তুবয়ন ছাড়িয়া দিতে লাগিল। যে কয়খানি তাঁত এখানে সেখানে অদ্যাপি শব্দ করে, শীঘ্রই তাহাদের কণ্ঠরোধ হইতে চলিল। এখন সকলকেই বিলাতি কাপড় পরিতেই হইবে। বাঙ্গালার কাপড় ফুরাইল, এখন ম্যানচেষ্টার বাঙ্গালার "আব্রুদার।" সুতরাং আমাদের এখন ম্যানচেষ্টারের মনরক্ষা করিতে হইবে, তাহার রাগ সহ্য করিতে হইবে, তাহাকে বিনতি করিতে হইবে, তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে; পরাধীনের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সকলই করিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ম্যানচেষ্টারের জাহাজ বিপদ্‌গ্রস্ত শুনিলে আমাদের মাথা ঘুরিয়া যাইবে। বিলাতে যুদ্ধ হইবে শুনিলে আমরা ঘর আর বাহির করিব। কিন্তু এ সম্বন্ধ আত্মীয়তার নহে, পরাধীনতার।

বস্ত্রসম্বন্ধে বাঙ্গালার পরাধীনতা ঘটিয়াছে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সেইরূপ ঘটিয়াছে কি না দেখিতে গেলে প্রথমেই চিকিৎসার কথা মনে হয়। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, বহুকালের পরীক্ষাদ্বারা ইহার অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়াছিল। অনেক ইংরেজ আমাদের চিকিৎসাসম্বন্ধে বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। কলিকাতায় দেখা যায় দেশী বিলাতী উভয়বিধ চিকিৎসা একত্র চলিতেছে। বড় ডাক্তারের যেরূপ পসার প্রধান কবিরাজের সেইরূপ পসার। দুই একজন কবিরাজ মাসে অন্ততঃ সহস্রমুদ্রা উপার্জ্জন করেন। যে শাস্ত্রের বলে তাঁহারা বিলাতী ডাক্তারের সমকক্ষ হইয়া এত উপার্জ্জন করিতেছেন, সে শাস্ত্রে যে কিছু পদার্থ নাই এরূপ বলা যায় না। সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারেরা যে রোগ অসাধ্য বলিয়াছেন, কবিরাজেরা সে রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক বিষয়ে ইংরেজি চিকিৎসার প্রাধান্য আছে। এক্ষণে বাঙ্গালায় প্রধান রোগ জ্বর। পূর্ব্বে যে জ্বর বাঙ্গালায় সর্ব্বদা হইত, এ সে জ্বর নহে। কবিরাজেরা যে ঔষধ প্রস্তুত রাখিতেন, ইহার সে ঔষধ নহে; নেপালদেশস্থ নিম্বের পালো ইহার ঔষধ, তাঁহাদের শাস্ত্রে এই ঔষধের ব্যবস্থা বিশেষ করিয়া লিখিত আছে। কিন্তু কবিরাজেরা সে পালো কোথায় পাইবেন? সুতরাং তাঁহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বাঙ্গালির মৃত্যু দেখিতে লাগিলেন। শেষ মার্কিনদেশে আর একরূপ নিম্বের

পালো আবিষ্কার হইল; তাহার নাম কুইনিন। ডাক্তারেরা সেই পালো ব্যবহার করিয়া জ্বর আরোগ্য করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহাদের আদর বাড়িতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে কবিরাজের পসার গেল। আর এক্ষণে সামান্য কবিরাজের অন্ন হয় না, কেহ আর কবিরাজি শিখে না, এতকালের চিকিৎসাশাস্ত্র লোপ পাইল, কত সহস্র বৎসরের দর্শনপরীক্ষা সকলই বৃথা হইল। বাঙ্গালায় এখন ইংরেজি চিকিৎসা প্রধান হইয়া উঠিল।

তাহার পর? তাহার পর,—পরাধীনতা। চিকিৎসা এখানে, ঔষধ বিলাতে। যতদিন কেহ তথা হইতে ঔষধ আনিয়া দিবে, ততদিন বিলাতী চিকিৎসা এ দেশে চলিবে। তাহার পর নেপালী নিম্বের পালোর মত হইবে। ব্যবস্থা ভারতবর্ষে, ঔষধ নেপালে। বিলাতী অর্থশাস্ত্র (Poletical economy) এখানে খাটিল না। নেপাল হইতে নিম্বের পালো এখানে আসিল না।

দেশী চিকিৎসা লোপ পাইতে বসিয়াছে, আর কিছু দিনে একেবারে লোপ পাইবে। দেশী ঔষধ যাহারা আহরণ করে—অর্থাৎ গন্ধবণিক্—তাহারা এখনই অনেক দ্রব্যের নাম ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর পূর্ব্বমত কবিরাজ নাই, পূর্ব্বমত লতামূলের ফরমাইস নাই। কিছুদিন পরে তাহাদের ব্যবসা উঠিয়া যাইবে, আর সে ব্যবসা পুনঃস্থাপিত হইবে না। যেরূপ কবিরাজের শিক্ষা কঠিন, তদপেক্ষা তাঁহাদের সহকারী এই বণিক্‌দের শিক্ষা আরও কঠিন। গ্রন্থ দ্বারা তাহাদের শিক্ষা হয় না, তাহা হইলে সহজ হইত। পুরুষপরম্পরা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ উপদেশ দ্বারা তাহারা লতামূল চিনিয়া আসিতেছে। এক পুরুষ তাহারা এইরূপ চাক্ষুষ উপদেশ না পাইলে আর তাহাদের উপদেশ হইবে না। কে উপদেশ দিবে? যাহারা দ্রব্য চিনিত, তাহারা তখন আর থাকিবে না। কবিরাজ গেল; তাহাদের ঔষধসংগ্রহকারী বণিক্ গেল। সুতরাং বিলাতী চিকিৎসাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন থাকিল। কিন্তু বিলাতী ঔষধ বিলাত হইতে আনিতে হইবে। ঔষধের নিমিত্ত বাঙ্গালা এখন বিলাতের অধীন। বাঙ্গালার পরাধীনতাসম্বন্ধে এই আর একটী গ্রন্থি।

আমাদের ঔষধ আমাদের দেশে ছিল এখন বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইল। অনেকের বিশ্বাস রোগ যে দেশে ঔষধও সেই দেশে। আমরা সে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, যদি পঞ্চপিত্তের পরিবর্ত্তে কড লিভর অইল ঔষধ শিখিলাম তবে সে শিক্ষার ফল পরাধীনতা। পরের দেশ হইতে কড লিবর তৈল আসিবে তবে আমাদের চিকিৎসা চলিবে, নতুবা চিকিৎসা হইবে না। ইহাই পরদেশের অধীনতা।

আহারসম্বন্ধে বাঙ্গালা অদ্যাপি নিতান্ত পরাধীন হয় নাই সত্য, কিন্তু একটা বিষয় স্মরণ হইলে বড় হাসি পায়। আমরা লবণসম্বন্ধে অতি পরাধীন হইয়াছি। ইংরেজেরা বিদেশ হইতে আমাদের লবণ আনিয়া দিবেন, তবে আমরা আহার করিব; নতুবা আমরা আহার করিতে পাইব না। আহারের নিমিত্ত ধান্য, মুগ, মসুরি, ছোলা, কলা, যাহা ইচ্ছা সকলই প্রস্তুত করিয়া খাইতে পাই, তাহাতে আপত্তি নাই কিন্তু লবণ প্রস্তুত করিতে আমাদিগের আর অধিকার নাই। লবণ প্রস্তুত করা মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—ইহার ঘোরতর দণ্ড—প্রায়শ্চিত্ত—জরিমানা—জেল। আহার প্রস্তুত করা পাপ, ইদানীং। লবণ খাও পাপ নাই, কিন্তু লবণ প্রস্তুত কর অমনি পাপ। এখানে স্মার্ত্তগ্রন্থকার ঠকিয়া গিয়াছেন; তিনি স্মৃতিশাস্ত্রে মুরগী খাওয়া পাপ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু লবণ প্রস্তুত করা পাপ লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার অল্প বুদ্ধি! হয় ত তাঁহার চক্ষুলজ্জা ছিল। হয় ত তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। হয় ত তিনি ভবিষ্যৎ রাজনীতিজ্ঞের নিমিত্ত কিছু বাকি রাখিয়া গিয়াছেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক। কিন্তু যাহাই হউক, মুরগি খাইলে পরকাল যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু লবণ প্রস্তুত করিলে ইহকাল যে যায় তাহা নিশ্চয়ই। রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশের পেনালকোড ভাল, কি মেকলি সাহেবদের পেনালকোড ভাল এ বিচার এখানে অপ্রয়োজন। আমাদের এইমাত্র বলিবার প্রয়োজন ছিল যে, লবণসম্বন্ধে বাঙ্গালা পরাধীন। সহস্র সহস্র বৎসর অবধি বাঙ্গালিরা সমুদ্রের জল হইতে লবণ বাহির করিয়া লইত, সমুদ্র তাহাতে রাগ করিত না। কেহ কথা কহিত না। এখন কথা কহিবার লোক দাঁড়াইয়াছে।

এই সম্বন্ধে সাতক্ষীরা অঞ্চলের এক জন দরিদ্র ব্যক্তির গল্প বলি। লেখক সেই সময় সাতক্ষীরায় উপস্থিত ছিলেন। সকল দিন সে ব্যক্তি আপনার বালক বালিকাদের উদর পুরিয়া অন্ন দিতে পারিত না, যেদিন সে অন্নসংগ্রহ করে সেদিন হয় ত ব্যঞ্জন জুটে না। একদিন দেখিল সন্তানেরা শুধু অন্ন খাইতে পারিতেছে না, অন্ন ক্রোড়ে করিয়া চক্ষের জল ফেলিতেছে; একটু লবণ পাইলে তাহারা অন্ন খাইতে পারে কিন্তু লবণের পয়সা নাই। সন্তানদের চক্ষের জল মুছাইয়া সে ব্যক্তি বাহির হইল। কলাগাছের কতকগুলা শুষ্ক বাস্না সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নি দিল, তাহার ভস্ম—এক প্রকার ক্ষার—শেষ তাহাই আনিয়া লবণ বলিয়া সন্তানদের দিল। তাহা কতক মৃত্তিকা, কতক ভস্ম, কিন্তু লবণাক্ত, সন্তানেরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইল। কিছুদিন পরে পুলিষ এ সম্বাদ পাইয়া দরিদ্রকে গ্রেপ্তার করিল। সকলে বলিতে লাগিল, "আহা! কেন তোর এ বুদ্ধি ঘটিল? কেন তুই কলার বাস্না পোড়ালি?. কেন

তুই লবণ করিলি?" একটি বালিকা ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল; "বাবাকে ছেড়ে দেও, আমরা নুণ আর খাব না।" পুলিষ সে ক্রন্দনে কর্ণ দিল না; অপরাধী সাতক্ষীরার মেজেষ্টরীতে আনীত হইল। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নেমকহারাম নন, তিনি দুঃখীকে শক্ত দণ্ড দিলেন, লবণ ক্রয় করিতে যাহার পয়সা ছিল না, তাহার জরিমানা করিলেন; আবার কারাবাসের আজ্ঞা দিলেন, কত দিনের নিমিত্ত তাহা এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। বালক বালিকারা লবণ পাইত না; এই হুকুমের পর হয় ত আর তাহারা অন্নও পাইল না।

আইনের অত্যাচার মধ্যে মধ্যে সকল রাজ্যেই ঘটে, আমরা আইনের দোষ দিই না, যখন বিজ্ঞেরা আইন করিয়াছেন, তখন দোষ দেওয়া বৃথা, আমরা কেবল বলিতেছিলাম যে, লবণসম্বন্ধে বাঙ্গালা এখন পরাধীন হইয়াছে।

এইরূপে একে একে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা অনেক বিষয়ে পরাধীন হইয়াছে; ক্রমে আরও হইতেছে। এই আমি বসিয়া যে কাগজে লিখিতেছি তাহা বিলাত হইতে আসিয়াছে। একসময় বাঙ্গালায় বড় সুন্দর কাগজ হইত, বিলাতী Hand laid কাগজ অপেক্ষা টেকসই হইত, গবর্ণর কেম্বল সাহেব তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এখন সে কাগজ লোপ পাইয়াছে। আমি যে কলমে লিখিতেছি, তাহা বিলাত হইতে আসিয়াছে, যে দুয়াত ব্যবহার করিতেছি তাহাও বিলাতের। যে ছুরিকাদ্বারা কলম কাটিয়াছি তাহাও বিলাতে প্রস্তুত হইয়াছে। আমার চারিদিকে যাহা দেখিতেছি, তাহা সমুদয় বিলাতী দ্রব্য।

কিন্তু এ দেশের সমুদয় অংশ এখনও সমভাবে পরাধীন হয় নাই, পল্লীগ্রামাঞ্চল অপেক্ষা নগরাঞ্চল অধিক পরাধীন হইয়াছে। যদি কেহ কলিকাতায় কোন বাবুর দিনযাপন লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে, বাঙ্গালার মধ্যে কলিকাতা বিশেষ পরাধীন। বাবু প্রাতে উঠিয়া মুখপ্রক্ষালন করিবেন তাহার উপকরণ বিলাতী টুতব্রস, বিলাতী পাউডার। তাহার পর স্নান করিবেন, খানসামা বিলাতী সাবান, বিলাতী টুয়ালিয়া আনিল। বাবু সিক্তবস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, খানসামা বিলাতি কাপড়, বিলাতি সার্ট আনিল, তাহার বোতামগুলি পর্য্যন্ত বিলাতী। তাহার পর কেশবিন্যাসের সময় সম্মুখে দর্পণ আনীত হইল, তাহাও বিলাতী। যাহা দ্বারা কেশবিন্যাসিত হইল—ব্রস— তাহাও বিলাতী। তাহার পর বাবু চা পান করিতে বসিলেন, চার পাত্র বিলাতী, চামচে বিলাতী, লোফ সুগার বিলাতী; যে কেট্‌লিতে তাহা পাক হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলাতী।

তাহার পর বাবু সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিলেন—মনে করুন ইংলিসম্যান—তাহার কাগজ বিলাতী, কালী বিলাতী, লেখক বিলাতী, হয় ত সম্বাদও বিলাতী। তাহার পর বাবুর আহারের কথা আর বলিলাম না।

কলিকাতার বাবু যেরূপ বিলাতের অধীন পল্লীগ্রামের চাষা তত নহে। চাষারা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।

আহার *VERSUS* বিবাহ।

বাঙ্গালার সাহিত্যারণ্যে একই রোদন শুনিতে পাই—বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই। এই অভিনব অভ্যুত্থানকালে বাঙ্গালীর ভগ্নকণ্ঠে একই অস্ফুট বোল—"হায়! বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।" বাঙ্গালীর যত দুঃখ তার একই মূল—বাহুতে বল নাই।

যদি অনুসন্ধান করা যায়, বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই কেন? তাহার একই উত্তর পাইব—বাঙ্গালী খাইতে পায় না—বাঙ্গালায় অন্ন নাই। যেমন এক মার গর্ভে বহু সন্তান হইলে কেহই উদর পুরিয়া স্তন্য পায় না তেমনি আমাদের জন্মভূমি বহু-সন্তান-প্রসবিনী বলিয়া তাঁহার শরীরোৎপন্ন খাদ্যে সকলের কুলায় না। পৃথিবীর কোন দেশই বুঝি বাঙ্গালার মত প্রজাবহুলা নহে। বাঙ্গালার অতিশয় প্রজাবৃদ্ধিই বাঙ্গালার প্রজার অবনতির কারণ। প্রজাবাহুল্য হইতে অন্নাভাব, অন্নাভাব হইতে অপুষ্টি, শীর্ণশরীরত্ব; জ্বরাদি পীড়া এবং মানসিক দৌর্ব্বল্য।

অনেকে বলিবেন, দেখ দেশে অনেক বড় মানুষের ছেলে আছে—তাহাদের আহারের কোন কষ্ট নাই, কিন্তু কই, তাহারা ত অনাহারী চণ্ডাল পোদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল—বড়মানুষের ছেলেরাই প্রকৃত মর্কটাকার। সত্য বটে, কিন্তু একপুরুষে অন্নাভাবের দোষ খণ্ডে না। যাহারা পুরুষানুক্রমে মর্কটাকার, দুই একপুরুষ তাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই মনুষ্যাকার ধারণ করে না। বিশেষ বড়মানুষের ছেলের কথা ছাড়িয়া দাও—তাঁহারা নড়িয়া বসেন না—সুতরাং ক্ষুধাভাবে প্রস্তুত আহার খাইতে পান না—ভুক্ত আহার জীর্ণ

করিতে পারেন না। সকল দেশেই বাবুর দল মর্কটসম্প্রদায়বিশেষ। শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বাহুবল।

আবার অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, "এ রকম কঠিনহৃদয় মালথসি বুলি রাখিয়া দাও! ও ছাই আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। কেন, যদি দেশে খাবার কুলায় না, তবে ভিন্ন দেশে এত চাউল গম রপ্তানি হয় কি প্রকারে?" এসম্প্রদায়ের লোকে বুঝেন না, যে, দেশে অকুলান থাকিলেও বিদেশে জিনিষ রপ্তানি হইতে পারে। যে আমায় বেশী টাকা দিবে তাহাকেই আমি জিনিষ বেচিব।

যদি এ দেশে কোন খাদ্য কুলান হয়, তবে সে চাউল। চাউল জুটিল না বলিয়া খাইতে পাইল না—এরূপ দুরবস্থা যে সকল লোকের ঘটে, তাহাদের সংখ্যা এদেশে নিতান্ত অল্প। অধিকাংশ লোকের আর যাহারই অভাব থাক না কেন চাউলের অপ্রতুল নাই। পেট ভরিয়া প্রায় সকলেই ভাত খাইতে পায়। কিন্তু পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পাইলেই আহার হইল না। শুধু ভাতে জীবন রক্ষা হইলে হইতে পারে—কিন্তু সে জীবনরক্ষা মাত্র। শরীরের পুষ্টি হয় না। চাউলে বলকারক সারপদার্থ শতাংশে সাতভাগ আছে মাত্র। চরবি—যাহা শরীর পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় চাউলে তাহা কিছু মাত্র নাই।

শুধু ভাত খায়, এমন লোক অতি অল্প না হউক, বেশীও নয়। বাঙ্গালার অধিকাংশ লোকে ভাতের সঙ্গে একটু ডালের ছিটা, একটু মাছের বিন্দু, শাক বা আলু কাঁচকলার কনিকা দিয়া ভোজন করে। ইহার নাম "ভাত ব্যঞ্জন।" এই ভাত ব্যঞ্জনের মধ্যে ভাতের ভাগ পনের আনা সাড়ে উনিশ গণ্ডা—ব্যঞ্জনের ভাগ দুই কড়া। সুতরাং ইহাকেও শুধু ভাত বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার চৌদ্দ আনা লোক এই রূপ শুধু ভাত খায়। তাহাতে কোন উপসর্গ না থাকিলে জীবনরক্ষা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কিন্তু এরূপ শরীরে রোগ অতি সহজেই প্রাধান্য স্থাপন করে,—(সাক্ষী ম্যালারিয়া জ্বর)—আর এরূপ শরীরে বল থাকে না। সেই জন্য বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই।

এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেকে বলেন, যত দিন না বাঙ্গালী সাধারণতঃ মাংসাহার করে, তত দিন বাঙ্গালীর বাহুতে বল হইবে না। আমরা সে কথা বলি না। মাংসের প্রয়োজন নাই, দুগ্ধ, ঘৃত, ময়দা, ডাল, ছোলা, ভাজ শবজী ইহাই উত্তম আহার। দৃষ্টান্ত—পশ্চিমে হিন্দুস্থানী। নৈবেদ্যে বিল্বপত্রের মত ভাতের সঙ্গে ইহাদের সংস্পর্শমাত্রের পরিবর্ত্তে অন্নের সঙ্গে ইহাদের যথোচিত সমাবেশ হইলেই বলকারক আহার হইল। বাঙ্গালী যদি ভাতের মাত্রা কমাইয়া দিয়া এই সকলের মাত্রা

বাড়াইতে পারে, তবে একপুরুষে নী-রোগ, দুই তিন পুরুষে বলিষ্ঠকায় হইতে পারে।

আমি এই সকল কথা রামধন পোদকে বুঝাইতে ছিলাম—কেন না রামধন পোদের সাতগোষ্ঠী বড় রোগা। রামধন আমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিল, "মহাশয় যা আজ্ঞা কর্‌লেন, তা সবই যথার্থ—কিন্তু ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা! বাবা, এ সকল পাব কোথায়? এমনই যে শুধু ভাতের খরচ জুটিয়ে উঠিতে পারি না।"

কথাটা দেখিলাম সত্য। আমি রাম-ধনের ঢেকিশালে ঢেঁকির উপর বসি-য়াছিলাম—উঠানে একটা খেও কুকুর পড়িয়াছিল বলিয়া আর আগু হইতে পারিনাই—সেই খান হইতেই রামধনের বংশাবলীর পরিচয় পাইতেছিলাম। রাম-ধন একটি একটি করিয়া দেখাইল যে তাহার চারিটি ছেলে, পাঁচটি মেয়ে, একটি ছেলে আর তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে বাকি আছে—পোদজেতের ছেলের বিয়েতেও কড়ি খরচা, মেয়ের বিয়েতেও বটে—তবে কম। পোদ বলিল যে, "মহাশয় গা! একটু পরিবার ছেঁড়া নেকড়া জুটাইতে পারি না—আবার ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা!" আমি বুঝিলাম কথাটা বড় অসঙ্গত হইয়াছে। বোধ হইল যেন প্রাঙ্গণশায়ী রুগ্ন কুকুরটিও আমার উপর রাগ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার উদ্যোগী—বোধ হইল যেন সে বলিতেছে "একমুঠা ফেলা ভাত পাই না, আবার উনি বুট পায়ে দিয়া ঢেঁকির উপর বসিয়া ঘি ময়দার বাহানা আরম্ভ করিলেন!" একটি রোমশূন্য গৃহমার্জ্জার আমার দিকে পিছন ফিরিয়া, লেজ উচু করিয়া চলিয়া গেল—সেই নীরস রাম-ধনালয়ে ঘৃত দুগ্ধ নবনীতের কথা শুনিয়া সে আমাকে উপহাস করিয়া গেল সন্দেহ নাই।

আমি রামধনকে বলিলাম, "চারিটি ছেলে—তিনটি মেয়ে! আবার তার উপর দুইটি পুত্রবধু বাড়িয়াছে?" রাম-ধন হাত যোড় করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ। আপনার আশীর্ব্বাদে দুইটি পুত্রবধূ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "তাহাদের সন্তান-সন্ততিও হইয়াছে?"

রামধন বলিল, "আজ্ঞা একটির দুই টী মেয়ে, একটির একটি ছেলে।"

আমি বলিলাম, "রামধন শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অনেকগুলি পরিবার বাড়িয়াছে। বহুপরিবার বলিয়া তোমার আগেই খাইবার কষ্ট ছিল, এখন আরও কষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।"

রামধন বলিল, "এখন বড় কষ্ট হই-য়াছে।"

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামধন! কেন এত পরিবার বাড়াইলে?"

রামধন কিছু বিস্মিত হইল। বলিল "সে কি মহাশয়! আমি কি 'পরিবার

বাড়াইলাম? বিধাতা বাড়াইয়াছেন।”

আমি বলিলাম, “গরিব বিধাতাকে অনর্থক দোষ দিও না। ছেলের বিয়ে তুমি দিয়াছ—সুতরাং তুমিই দুইটী পুত্র-বধূ বাড়াইয়াছ। আর ছেলের বিয়ে দিয়েছ বলিয়াই তিনটি নাতি নাতিনী বাড়াইয়াছ।”

রামধন কাতর হইয়া বলিল, “মহাশয় আমাকে অমন করিয়া খুঁড়িবেন না, যমদণ্ডে সে দিন আমার আর একটি নাতি নষ্ট হয়েছে।”

আমি দুঃখ প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “সেটি কিসে গেল রামধন!”

রামধন কিছু উত্তর দেয় না। পীড়াপীড়ি করিয়া, কতকগুলি জেরার সওয়াল করিয়া, বাহির করিলাম যে সেটি অনাহারে মরিয়াছে। মাতা পীড়িত হওয়ায় মাতৃস্তনে দুধ ছিল না। রামধনের গোরু মরিয়া গিয়াছিল—দুধ কিনিবার সাধ্য নাই। ছেলেটী না খাইয়া পেটের পীড়ায় ভুগিয়া * মরিয়া গিয়াছিল।

আমি তখন রামধনকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, “তার পর ছোট ছেলেটির বিয়ে দিবে?”

রামধন বলিল, “টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই দিই।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই যে গুলি জুটিয়েছ, তাই খেতে দিতে পার না আবার বাড়াবে কেন? বিয়ে দিলেই ত আপাততঃ বৌ মা আসবেন—তাঁর আহার চাই। তার পর তাঁর পেটে দুটি চারিটি হবে—তাদেরও আহার চাই। এখনই কুলায় না—আবার বিয়ে?”

রামধন চটিল। বলিল, “বেটার বিয়ে কে না দেয়? যে খেতে পায় সেও দেয়, যে না খেতে পায় সেও দেয়।”

আমি বলিলাম “যে না খেতে পায় তার বেটার বিয়ে টা কি ভাল?”

রামধন বলিল—“জগৎ শুদ্ধ এই হতেছে।”

আমি বলিলাম, “জগৎ শুদ্ধ নয় রামধন, কেবল এই দেশে। এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।”

রামধন উত্তর করিল, “তা দেশ-শুদ্ধ লোক যখন করিতেছে, তখন আমাতেই কি এত দোষ হইল?”

এমন নির্ব্বোধকে কিরূপে বুঝাইব? বলিলাম—“রামধন! দেশশুদ্ধ লোক যদি গলায় দড়ি দেয়, তুমিও কি দিবে?”

রামধন চেঁচাইতে আরম্ভ করিল “তুমি বল কি মশাই? গলায় দড়ি আর বেটার বিয়ে দেওয়া সমান?”

আমিও রাগিলাম, বলিলাম “সমান কে বলে রামধন! এরূপ বেটার বিয়ে দেওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল। আপনার গলায় না পার, ছেলের গলায় দিও।”

এই বলিয়া আমি ঢেঁকি হইতে

* অনাহারের একটি ফল পেটের পীড়া, ইহা সকলের জানা না থাকিতে পারে।

উঠিয়া চলিয়া আসিলাম। ঘরে আসিয়া রাগ পড়িয়া গেলে ভাবিয়া দেখিলাম গরিব রামধনের অপরাধ কি? বাঙ্গালা শুদ্ধ এই রূপ রামধনে পরিপূর্ণ। এ ত গরিব পোদের ছেলে—বিদ্যা বুদ্ধির কোন এলাকা রাখে না। যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন, তাঁহারাও ঘোরতর রামধন। ঘরে খাবার থাক বা না থাক—আগে ছেলের বিয়ে। শুধু ভাতে ডালের ছিটা দিয়া খাইয়া সাত গোষ্ঠী পোড়া কাঠের আকার—জ্বর প্লীহায় ব্যতিব্যস্ত—তবু সেই কদন্ন খাইবার জন্য সেই অনাহারের ভাগ লইবার জন্য—সে জ্বর প্লীহার সাথি হইবার জন্য টাকা খরচ করিয়া পরের মেয়ে আনিতে হইবে। মনুষ্যজন্মে তাহাই তাঁহাদের সুখ। যে বাঙ্গালী হইয়া ছেলের বিয়ে না দিতে পারিল তাহার বাঙ্গালী জন্মই বৃথা। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিলে, ছেলে বেচারি বউকে খাওয়াইতে পারিবে কি না, সে টা ভাবিবার কোন প্রয়োজন আছে এমত বিবেচনা করেন না। এ দিকে ছেলে ইস্কুল ছাড়িতে না ছাড়িতে একটি ক্ষুদ্র পলটনের বাপ—রশদের যোগাড়ে বাপ পিতামহ অস্থির। গরিব বিবাহিত তখন স্কুল ছাড়িয়া পুঁথি পাঁজি টানিয়া ফেলিয়া দিয়া উমেদওয়ারিতে প্রাণ সমর্পণ করিল। যোড় হাত করিয়া ইংরেজের দ্বারে দ্বারে হা চাকরি! হা চাকরি! করিয়া কাতর। হয় ত, সে ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হইতে পারিত। হয় ত, সে সময়ে আপনার পথ চিনিয়া জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে পারিলে, জীবন সার্থক করিতে পারিত। কিন্তু পথ চিনিবার আগেই সে সকল ভরসা ফুরাইল, উমেদওয়ারির যন্ত্রণায় আর চাকরির পেষণে—সংসারধর্ম্মের জ্বালায়,—অন্তর ও শরীর বিকল হইয়া উঠিল। বিবাহ হইয়াছে—ছেলে হইয়াছে, আর পথ খুঁজিবার অবসর নাই—এখন সেই একমাত্র পথ খোলা—উমেদওয়ারি। আর লোকের উপকার করিবার কোন সম্ভাবনা নাই—কেন না আপনার স্ত্রীকন্যা পুত্রের উপকার করিতে কুলায় না—তাহারা রাত্রিদিন দেহি দেহি করিতেছে। আর দেশের হিতসাধনের ক্ষমতা নাই, স্ত্রীপুত্রের হিতের জন্য সর্ব্বস্ব পণ! লেখা পড়া, ধর্ম্মচিন্তা—এ সকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ নাই—ছেলের কান্না থামাইতেই দিন যায়। যে টাকা টা পেট্রিয়টিক আসোসিয়েসনে চাঁদা দিতে পারিত, ছেলে এখন তাহা বধূঠাকুরাণীর বালা গড়াইয়া দিল। অথচ বাঙ্গালার রামধনেরা শৈশবে ছেলের বিবাহ দিতে না পারিলে, মনে করেন ছেলেরও সর্ব্বনাশ নিজেরও সর্ব্বনাশ করিলেন। ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে; আর বাপ মার প্রধান কার্য্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে দেশে সর্ব্বব্যাপী সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে দেশে, বাপ মা

ছেলে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূ-রূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া, ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয় সে দেশের উন্নতি হইবে ?

কমলাকান্তের জোবানবন্দী।

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম। অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া চক্ষু বুজিয়া ডাবার তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরী করিয়াছে—অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরী করিবে না—ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না—কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে কাণ্ডটা কি হয়।

কিছু কাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজলাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া, ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার—পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে—সাক্ষী। মোকদ্দমা গোরুচুরী। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল —"হাস কেন ?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি—যে আমাকে এর ভিতর পুরিলে ?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয়—হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া—"

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব ?

মুহুরি। শুনতে পাও না—"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"।

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাঁধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি—এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের কারণই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম—কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব—সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি, যে পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন—কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না—তখন কেমন করিয়া বলি—আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

ফরিয়াদীর উকীল চটিলেন—তাঁহার মূল্যবান্ সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষীমহাশয়! Theological Lectureটা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না। এখানে আইনের মতে চলিতে মনস্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল (হাসিয়া)। কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে—মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা, মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি—যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, Oh Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন, কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীলবাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না—সুতরাং উকীলবাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটি জাতিভ্রষ্ট—পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন, যে ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে—উহাকে simple affirmation দাও। তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও—বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বল!"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরকশ্।"

উকীলবাবু হাঁকিলেন, "Very distinctive"

কমলাকান্ত (উকীলের প্রতি) "শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি—ভিতরেও চলিবে কি?"

উকীল। শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে তাহা না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও—গোলমালে কাজ নাই।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না—সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ার্থি, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞাপাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীলবাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না—আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল। না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীলবাবু অধিকারী—আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব। যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধ লইবেন না।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা

করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত, তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল। তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুতিক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ'সব Contempt of Court!" হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন্—বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি।"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়?

কমলা। হিন্দুজাতীয়।

উকীল। আঃ! কোন বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল। দূর হোক্ ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানাপ্রকার জাতি আছে জান ত—তুমি তার কোন জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী—ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কিপ্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজলাসে একটা ক্লক ছিল—তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স ৫১ বৎসর, দুই মাস তের দিন চারি ঘণ্টা পাঁচ মিনিট—"

উকীল। কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?

কমলা। কেন এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।

উকীল। তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?

কমলা। আমার নিবাস নাই।

উকীল। বলি, বাড়ী কোথা?

কম। বাড়ী দূরে থাক্, আমার একটা কুঠারীও নাই।

উকীল। তবে থাক কোথা?

কমলা। যেখানে সেখানে।

উকীল। একটা আড্ডা ত আছে?

কম। ছিল, যখন নশীবাবু ছিলেন। এখন আর নাই।

উকীল। এখন আছ কোথা?

কম। কেন, এই আদালতে।

উকীল। কাল ছিলে কোথা?

কম। একখানা দোকানে।

হাকিম বলিলেন, "আর বকাবকিতে কাজ নাই—আমি লিখিয়া লইতেছি নিবাস নাই। তার পর?"

উকীল। তোমার পেশা কি?

কম। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা, যে আমার পেশা আছে?

উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?

কম। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।

উকীল। সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?

কম। ভগবান্ জোটাইলেই জোটে, নইলে জোটে না।

উকীল। কিছু উপার্জ্জন কর?

কম। এক পয়সাও না।

উকীল। তবে কি চুরী কর?

কম। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।

উকীল, তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, "আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না।"

প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, "এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে আহা আমি জানি—কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না—তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বল্‌বে?"

উকীল তখন হাকিমকে বলিল, লিখুন "পেশা ভিক্ষা।"

এবার কমলাকান্ত রাগিল, "কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি আমি কখন কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই নাই।"

প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না—সে বলিল, "সে কি ঠাকুর! কখনও আফিঙ্গ চেয়ে খাও নি?"

কমলা। দূর মাগি ধেমো গয়লার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।

হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "কি লিখিব কমলাকান্ত?"

কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, "লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।" সকলে হাসিল—হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।

তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ফরিয়াদীকে চেন?"

কম। না।

প্রসন্ন হাঁকিল, "সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?"

কমলাকান্ত বলিল, "তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বল্‌তেছি না—তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি একপোওয়া দুধে তিনপোওয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্ন গোয়ালীর দুধ; যখনই দেখিতে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিঁকে, তখনই চিনিতে পারি যে এ প্রসন্নময়ীর দধি। তোমার দুধ দই চিনিনে?

প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, "আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না!"

কমলাকান্ত বলিল, "মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?"

উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিল, "বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন—উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?"

কমলা। মন্দ নয়—এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!

উকীল। তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?

কমলা। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

উকীল। এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর paramour কি না?

কমলা। উকীল মহলে ওটাও কি একটা সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয় না কি? তা না হইলেই বা মোয়াক্কেলেরা আপনাদের কাছে টাকা আনিয়া কথায় কথায় "নিন্"* বলিবে কেন?"

উকীল ও হাকিম, ব্যাকরণের সঙ্গে সম্বন্ধবিরহিত—সুতরাং কেহ কথাটার অপরাধ লইলেন না। উকীল বলিলেন, "বুঝা গেল তোমার সঙ্গে বাদিনীর কোন সম্বন্ধ নাই—একেবারে সাফ বলিলেই হইত—এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?"

কমলা। জানি যে এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী, আর এই নেড়ে আসামী।

উকীল। তা নয়, গোরুচুরীর কি জান?

কমলা। গোরুচুরী আমার বাপ দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?—আমার দুধ দধির বড় দরকার।

উকীল। আঃ—বলি গোরু চুরী দেখিয়াছ?

* (১) লণ্ডন (২) "নিন" প্রত্যয়।

কমলা। একদিন দেখিয়াছিলাম। নশীবাবুর একটা বক্না—এক বেটা মুচি—

উকীল। কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরী যায় তখন তুমি দেখিয়াছ?

কমলা। না—চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরী করে। তাহা হইলে আপনারও কাজের সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।

প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই—তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কানে কানে বলিয়া দিল, "ও বামন সে সব কিছুর সাক্ষী নয়—ও কেবল গোরু চেনে।"

উকীলমহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"

কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞা চিনি বই কি—নহিলে আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—বলিলেন, "ও সব রাখ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল—দেখা যাইতেছিল। ডিপুটিবাবু সেইদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটি চেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি ধর্ম্মাবতার?"

হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সামনে নাই?"

কমলা। আপনি দেখিতেছেন একটি—আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।

হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না—ঐ শামলা?"

কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরীর না কি?"

কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ—Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচটাকা জরিমানা।"

কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"

হাকিম। কেন?

কমলা। কিরূপে আদায় করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।

হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?

কমলা। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই—তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।

হাকিম। জরিমানা না দিতে পার; কয়েদ যাইবে।

কমলা। কতদিনের জন্য ধর্ম্মাবতার?

হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে একমাস কয়েদ।

কমলা। দুই মাস হয় না?

হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?

কমলা। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে—ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়—জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।

এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল—ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"

হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন, যে গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"

কমলা। সিং-ওয়ালা গোরু—তাই বলুন!

উকীল। তুমি বল কি?

কমলা। আমি বলি শামলাওয়ালা—তা যাক্—আমি ও সিং-ওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।

উকীল। ও কার গোরু?

কমলা। আমার।

উকীল। তোমার!!

কমলা। আমারই।

হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিট্‌লে! গোরু তোমার!"

কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি, ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি—ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি—ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটি পালিস্ বল্যে কি তোর বাবার গোরু হলো!"

উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার witness hostile! permission দিন্ আমি ওকে cross করি।

কমলা। কি? আমায় cross করিবে?

উকীল। হাঁ, করিব।

কমলা। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?

উকীল। সে আবার কি?

কমলা। বাবা! কমলাকান্তসাগর পার হও, এত বড় হনুমান্ তুমি আজও হও নাই।

এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়—চাপরাশী ধরিয়া আবার

কাটরায় পুরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল—বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!—আমি অগাধ সমুদ্র পড়িয়া আছি—যে ইচ্ছা সে লম্ফ দাও—'অপামিবাধার মনুত্তরঙ্গং'—উকীলমহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না, আপনি সচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন।"

উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জোবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক।"

হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাতযোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয় দিবেন।"

হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল,

"ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"

কমলা। মৌতাতের আবার সময় কিরে বেটী—অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং মেধাঞ্চ চিন্তয়েৎ।

প্রসন্ন। অং বং এখন রাখ—এখন মৌতাত করিবে?

কমলা। দে!

প্রসন্ন। আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও—তার পর দেব।

কমলা। তবে জলদি জলদি বল—জলদি জলদি জবাব দিই।

প্রসন্ন। বলি, গোরু কার?

কমলা। গোরু তিনজনের; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির; শেষবয়সে, উত্তরাধিকারীর; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।

প্রসন্ন। বলি, ঐ শামলা গাই কার?

কমলা। যে ওর দুধ খায় তার।

প্রসন্ন। ও গোরু আমার কি না?

কমলা। তুই বেটি কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলিনে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটি গোরু চোরকে ছেড়ে দে—গরিবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।

হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে—আদালত মেছো হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"

কমলা। আজ্ঞা, হাঁ।

"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"

কমলা। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।

"ঐ খাওয়ায়?"

কমলা। উভয়কে।

বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে—আমি উহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে চাই না।" এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আশামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"

আশামীর উকীল বলিলেন, "আমি আশামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্ করিব।"

কমলা। একজন ত ক্রস্ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?

উকীল। কুমার বাহাদুর কে?

কমলা। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস করিলেন, পবনাত্মজ মহাশয়! তার পর ক্রস করিলেন কুমার বাহাদুর।*

উকীল। ও সব রাখ—তুমি গোরু চেন বলেছ—কিসে চেন?

কমলা। কখন শিঙ্গে—কখন শামলায়।

উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া, টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন,

"তোমার পাগলামি রাখ—তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?

কমলা। ঐ হাম্বারবে।

উকীল হতাশ হইয়া, বলিলেন, "Hopeless!" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন—আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন বাবা?"

উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, যে কমলাকান্ত খেলে হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে—চারি দিকে লোক জমিয়াছে—প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোল মউনির দিব্য, তোর ফাঁদিনথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?"

কমলাকান্ত বলিল, "Liberty! Individuality! Fraternity! Humanity! মটর স্থুঁটি!"

এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম মানুষ টা, নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোসনবীশ জুনিয়র।

---

* অঙ্গদ।

কৃষিতত্ত্ব।

মাসিক পত্রিকা, শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত শ্রীনৃত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য· ৩৷৴০।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানি দুই তিনবৎসর অবধি প্রকাশ হইতেছে, আমরা মনে করিয়াছিলাম এদেশে সর্ব্বত্র ইহা গৃহীত ও পঠিত হয়। বাঙ্গালা শস্যপ্রসবিনী, বাঙ্গালীরা শস্য উপজীবী, কৃষিতত্ত্ব তাহাদের উপযুক্ত পত্রিকা। কিন্তু এক্ষণে সন্দেহ হইতেছে বুঝি কৃষিতত্ত্ব অদ্যাপি কৃষকদের নিকট পৌঁছে নাই, তাহা হইলে এতদিন কৃষিতত্ত্বের সহস্র সহস্র গ্রাহক হইত। পত্রখানি বোধ হয় কুপথে গিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়িয়াছে। তাহাই বুঝি গত চৈত্রমাসে সম্পাদককে নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপন লিখিতে হইয়াছিল ;—

"কৃষিতত্ত্বের মূল্যজন্য কয়েক মাস হইতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে এবং যাঁহাদিগের নিকট গত বৎসরের মূল্য বাকী আছে, তাঁহাদিগকে আবার স্বতন্ত্র এক এক খানি পত্র লেখা হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই মূল্য দেওয়া দূরে থাকুক ভদ্রতানুসারে আমাদের পত্রের জবাব পর্য্যন্তও দিতেছেন না। আমাদের অপরাধ আমরা নিজের অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে কৃষিতত্ত্ব দিয়া আসিয়াছি। এবং মূল্যজন্য অতি বিনীতভাবে ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহাদিগের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি, তত্রাপি তাঁহারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। মূল্যদান সম্বন্ধে এরূপ গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা যে কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারা একবার বিবেচনা করিবেন। কাগজ লইয়া মূল্য না দেওয়া এ কলঙ্ক শিক্ষিত সম্প্রাদয়ের পক্ষে যার পর নাই লজ্জার বিষয়।"

দোষ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একেবারে নহে, দোষ সম্পাদকের নিজের। যে পত্রিকা চাষার নিমিত্ত সম্পাদিত সে পত্রিকা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সমর্পণ করা বিয়াদবি। সুতরাং গ্রাহকেরা পত্রিকা গ্রহণ করিবেন এবং রাগ করিয়া যে তাহার মূল্য কাটিবেন ইহার আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু একটা কথা বলি; উপরোক্ত বিজ্ঞাপনটি না দিলে বড় ভাল হইত, পত্রিকার মর্য্যাদা রক্ষা হইত, গ্রাহকদেরও মর্য্যাদা থাকিত। এ বিজ্ঞাপন দিয়া কোন ফল নাই, কোন গ্রাহকই এরূপ বিজ্ঞাপন পড়েন না, পড়িয়াও লজ্জিত হন না, বা টাকা পাঠান না। তবে এরূপ বিজ্ঞাপন কেন? ইদানী বিস্তর পত্রিকায় এরূপ বিজ্ঞাপন দেখা যায়। তাহা না দেখিতে পাওয়া গেলেই ভাল।

আর এক কথা, কৃষিতত্ত্ব যাহাতে পঠিত হয় তাহার উপায় করা আবশ্যক। সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা পরে বলিব।

বঙ্গদর্শন।

৯০ সংখ্যা।

আনন্দ মঠ।

দশম পরিচ্ছেদ।

সেই দশসহস্র সন্তান বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে বল্লম উন্নত করিয়া অতি দ্রুতবেগে তোপশ্রেণীর উপর গিয়া পড়িল। গোলাবৃষ্টিতে খণ্ড বিখণ্ড বিদীর্ণ উৎপতিত অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া গেল, তথাপি সন্তানসৈন্য ফেরে না। সেই সময়ে কাপ্তেন টমাসের আজ্ঞায় একদল সিপাহী বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া প্রবলবেগে সন্তানদিগের দক্ষিণপার্শ্বে আক্রমণ করিল। তখন দুইদিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সন্তানেরা একেবারে নিরাশ হইল। মুহূর্ত্তে, শত শত সন্তান বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন জীবানন্দ বলিলেন, "ভবানন্দ তোমারই কথা ঠিক আর বৈষ্ণবধ্বংসে প্রয়োজন নাই; ধীরে ধীরে ফিরি।"

ভব। এখন ফিরিবে কি প্রকারে? এখন যে পিছন ফিরিবে সেই মরিবে।

জীবা। সম্মুখে ও দক্ষিণপার্শ্ব হইতে আক্রমণ হইতেছে। বামপার্শ্বে কেহ নাই, চল অল্পে অল্পে ঘুরিয়া বামদিক্ দিয়া বেড়িয়া সরিয়া যাই।

ভব। সরিয়া কোথায় যাইবে? সেখানে যে অজয় নদী—নূতন বর্ষায় অজয় যে অতি প্রবল হইয়াছে। তুমি ইংরেজের গোলা হইতে পলাইয়া এই সন্তানসেনা অজয়ের জলে ডুবাইবে?

জীবা। অজয়ের উপর একটা পুল আছে আমার স্মরণ হইতেছে।

ভব। এই দশসহস্র সেনা সেই

পুলের উপর দিয়া পার করিতে গেলে এত ভিড় হইবে, যে বোধ হয় একটা তোপেই অবলীলাক্রমে সমুদায় সন্তান-সেনা ধ্বংস করিতে পারিবে।

জীব। এক কর্ম্ম কর, অল্পসংখ্যক সেনা তুমি সঙ্গে রাখ, এই যুদ্ধে তুমি যে সাহস ও চাতুর্য্য দেখাইলে তোমার অসাধ্য কাজ নাই! তুমি সেই অল্প-সংখ্যক সন্তান লইয়া সম্মুখ রক্ষা কর। আমি তোমার সেনার অন্তরালে অবশিষ্ট সন্তানগণকে পুল পার করিয়া লইয়া যাই, তোমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইবে, আমার সঙ্গে যাহা রহিল তাহা বাঁচিলে বাঁচিতে পারিবে।

ভব। আচ্ছা, আমি তাহা করিতেছি।

তখন ভবানন্দ দুইসহস্র সন্তান লইয়া পুনর্ব্বার বন্দে মাতরং শব্দ উত্থিত করিয়া ঘোর উৎসাহসহকারে ইংরেজের গোলন্দাজসৈন্য আক্রমণ করিলেন। সেইখানে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তোপের মুখে সেই ক্ষুদ্র সন্তান-সেনা কতক্ষণ টিকে? ধানকাটার মত তাহাদিগকে ইংরেজেরা ভূমিশায়ী করিতে লাগিল।

এই অবসরে জীবানন্দ অবশিষ্ট সন্তান সেনার মুখ ঈষৎ ফিরাইয়া বামভাগে কানন বেড়িয়া ধীরে ধীরে চলিল। কাপ্তেন টমাসের একজন সহযোগী লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন দূর হইতে দেখিলেন, যে এক-সম্প্রদায় সন্তান ধীরে ধীরে পলাইতেছে, তখন তিনি একদল ফৌজদারী সিপাহী, একদল রাজার সিপাহী আর একদল গোরা লইয়া জীবানন্দের অনুবর্ত্তী হইলেন।

ইহা কাপ্তেন টমাস দেখিতে পাইলেন না। সন্তানসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান ভাগ পলাইতেছে দেখিয়া তিনি কাপ্তেন হে নামা একজন সহযোগীকে বলিলেন, যে "আমি দুই চারিশত সিপাহী লইয়া এই উপস্থিত ভগ্নবিদ্রোহীদিগকে নিহত করিতেছি, তুমি তোপগুলি ও অবশিষ্ট গোরা ও সিপাহী লইয়া উহাদের প্রতি ধাবমান হও, বামদিক্ দিয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন যাইতেছেন, দক্ষিণদিক্ দিয়া তুমি যাও। আর দেখ, আগে গিয়া পুলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে; তাহা হইলে তিনদিক্ হইতে উহাদিগকে বেষ্টিত করিয়া জালের পাখীর মত মারিতে পারিব। উহারা দ্রুতপদ দেশী ফৌজ, সর্ব্বাপেক্ষা পলায়নেই সুদক্ষ, অতএব তুমি উহাদিগকে সহজে ধরিতে পারিবে না, তুমি আগে অশ্বারোহীদিগকে একটু ঘুর পথে আড়াল দিয়া গিয়া পুলের মুখে দাঁড়াইতে বল, তাহা হইলে কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। কাপ্তেন হে তাহাই করিল।"

অতি দর্পে হতা লঙ্কা। কাপ্তেন টমাস সন্তানদিগকে অতিশয় ঘৃণা করিয়া দুইশত মাত্র পদাতিক ভবানন্দের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য রাখিয়া আর সকল হের সঙ্গে পাঠাইলেন। চতুর ভবানন্দ যখন দেখিলেন ইংরেজের তোপ সকলই গেল, সৈন্য সব গেল, যাহা অল্পই রহিল তাহা

সহজেই বধ্য, তখন তিনি নিজ হতাবশিষ্ট দলকে ডাকিয়া বলিলেন যে "এইকয় জনকে নিহত করিয়া জীবানন্দের সাহায্যে আমাকে যাইতে হইবে। আর একবার তোমরা জয় জগদীশ হরে বল।" তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানসেনা জয় জগদীশ হরে বলিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় কাপ্তেন টমাসের উপর লাফাইয়া পড়িল। সেই আক্রমণের উগ্রতা অল্পসংখ্যক ইংরেজ ও তৈলঙ্গীর দল সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা বিনষ্ট হইল। ভবানন্দ তখন নিজে গিয়া কাপ্তেন টমাসের চুল ধরিলেন। কাপ্তেন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেছিল। ভবানন্দ বলিলেন, "কাপ্তেন সাহেব তোমায় মারিব না; ইংরেজ আমাদিগের শত্রু নহে। কেন তুমি মুসলমানের সহায় হইয়া আসিয়াছ? আইস—তোমার প্রাণদান দিলাম। আপাততঃ তুমি বন্দী। ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।" কাপ্তেন টমাস তখন ভবানন্দকে বধ করিবার জন্য সঙ্গীনসহিত একটা বন্দুক উঠাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু ভবানন্দ তাহাকে বাঘের মত ধরিয়াছিল, কাপ্তেন টমাস নড়িতে পারিলেন না। তখন ভবানন্দ অনুচরবর্গকে বলিল যে "ইহাকে বাঁধ।" দুই তিন জন সন্তান আসিয়া কাপ্তেন টমাসকে বাঁধিল। ভবানন্দ বলিল "ইহাকে একটা ঘোড়ার উপর তুলিয়া লও, চল উহাকে লইয়া আমরা জীবানন্দ গোস্বামীর আনুকূল্যে যাই।"

তখন সেই অল্পসংখ্যক সন্তানগণ কাপ্তেন টমাসকে ঘোড়ার উপর বাঁধিয়া লইয়া বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

জীবানন্দের সন্তানসেনা ভগ্নোদ্যম, তাহারা পলায়নে উদ্যত। জীবানন্দ ও ধীরানন্দ, তাহাদিগকে বুঝাইয়া সংযত রাখিলেন, কিন্তু সকলকে পারিলেন না; কতকগুলি পলাইয়া আম্রকাননের আশ্রয় লইল। তাহারা যখন আম্রকাননে প্রবেশ করে, তখন গাছের উপর হইতে একজন বলিল, "গাছে উঠ! গাছে উঠ! নহিলে বনের ভিতর ঢুকিয়া ইংরেজ তোমাদিগকে মারিবে।" ত্রস্ত সন্তানেরা গাছের উপর উঠিল।

গাছের উপর হইতে নবীনানন্দ গোস্বামী কথা কহিতেছিলেন। সকলে গাছে উঠিলে, নবীনানন্দ বলিলেন, "বন্দুক তৈয়ার রাখ—এখান হইতে আমরা নিরাপদে শত্রুসংহার করিব।" সকলে বন্দুক তৈয়ার রাখিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লেপ্টনাণ্ট ওয়াটসন দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলিলেন। দুর্ব্বুদ্ধিই বা কি, জীবানন্দের দক্ষিণে কাপ্তেন হে যাইতেছে দেখিয়া ওয়াটসন মনে করিলেন যে, আমি ঠিক বামে গিয়া ঘেরিব; এই ভাবিয়া আম্রকানন ঘেঁসিয়া চলি-

লেন। তখন অকস্মাৎ হুড় হুড় হুড় হুড় শব্দে গাছের উপর হইতে তাঁহার সৈন্ত-পৃষ্ঠে বন্দুকের গুলি পড়িতে লাগিল। লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন তখন উপরে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, "আকাশ হইতে গুলি পড়ে না কি!" নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে একজন বলিল, "না সাহেব, আমরা গাছ থেকেই মারিতেছি, ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গাছের উপর দুই চারিটা গুলি চালাও না।"

আর একজন বলিল, "সাহেব ঐখানে একটু দাঁড়াইয়া দেখ, শুনিয়াছি জীবানন্দ নাকি যীশুখ্রীষ্ট ভজিবে, ঐ আসছে।"

লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসন দেখিলেন বেগোছ, ইহাদিগের কিছু করিতে পারিব না। সৈন্যগণকে বলিলেন "তোমরা শীঘ্র অগ্রসর হও, একটু দূরে গেলে, গাছের বাঁদরে আর কামড়াইতে পারিবে না।"

তখন গাছের বাঁদরের বন্দুকের দৌড়ের বাহিরে সৈন্য লইয়া ওয়াটসন দ্রুতবেগে জীবানন্দের আক্রমণে চলিলেন।

শান্তি তখন গাছের উপর হইতে বলিল "ভাই বাঁদরের দল, একবার লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া রাঙ্গামুখোদের বাঁদরের কামড়ের জ্বালাটা দেখাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।" শান্তি মনে মনে বলিতে লাগিল যে "যদি মেয়ে মানুষ না হইতাম তো"—সকলটুকু লিখিতে পারিলাম না। আগে নবীনানন্দ গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে ঝুপ ঝাপ করিয়া বৃক্ষস্থ সকল সন্তান লাফাইয়া পড়িল, তখন নবীনানন্দ বলিলেন "ধীরে ভাই, ধীরে, মিলে মিসে, গোল কর না; সার বাঁধ, বন্দুক কাঁধে, বল্লম হাতে, ছুট! দৌড়! বল বন্দে মাতরং।" তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে তাহারা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের ব্যাটেলিয়নের উপর ধাবমান হইল।

শান্তি পিছাইয়া পড়িল—বলিল "ছি! কি করিতেছি? স্ত্রীলোক হইয়া যুদ্ধে যাই কেন? আমার ধর্ম্ম ত এ নয়! আমি গাছের বাঁদর গাছেই থাকি।" এই বলিয়া শান্তি ফিরিয়া আসিয়া গাছের উপর উঠিয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

জীবানন্দ প্রায় পুল পাইয়াছিল, কিন্তু দূর হইতে বন্দে মাতরং কানে গেল। জীবানন্দ বলিল "ভাই দূর হইতে বন্দে মাতরং শুনিতেছি, ভাই মরি মর্‌বো, পুলে কাজ নাই, চল একবার উহাদের সঙ্গে গিয়া বন্দে মাতরং গাই। ঐ যে দেখিতেছ লাল কাল জরদা সবুজ, ও পাঁচরঙ্গা মুগের লাড়ু, উহাতে ফৌজদারী বাদসাহী ইংরেজী আছে, চল ভাই বৈষ্ণব সেবায় সব লাগাই।" জীবানন্দের সেনায় আর প্রাণভয়ে পলান হইল না। বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে সেই হতাবশিষ্ট পঞ্চসহস্র সন্তানসেনা লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের দিকে ধাবমান হইল এবং বজ্রের মত লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনার উপরে পড়িয়া তাহাদিগকে খণ্ড

বিখণ্ড করিল। একদিকে জীবানন্দের সৈন্য আর একদিকে নবীনানন্দের প্রেরিত সৈন্য দুই প্রবল তরঙ্গের আঘাতে দৃঢ়বল পর্ব্বততুল্য ইংরেজ সেনা কম্পিত হইতে লাগিল। ক্ষয় হয় তবু ভাঙ্গেনা! ইংরেজের অতুল বল, অতুল সাহস, অতুল অধ্যবসায়। রাউণ্ডের পর রাউণ্ড, ফায়ারের পর ফায়ার, বৃষ্টির পর বৃষ্টি, মেঘের উপরে আরো মেঘ! পৃথিবী অন্ধকার হইল, গগন প্রতিধ্বনিতে বিদারিত হইতে লাগিল, কাননে ঝড় বহিল, পশু পক্ষী ভয়ে বিবরে লুকাইল, অন্তরে তুফান উঠিল। নবীনানন্দ বৃক্ষ হইতে ডাকিল "মার মার যবন মার। ঐ ওপাশে এই সেনার পরে জীবানন্দ আছে, যাও ফৌজদারী বাদসাহী ভেদ করিয়া যাও ভাই! মার মার ফৌজদারী মার।" তখন দক্ষিণ বামে বিদ্ধ হইয়া, আহত নিহত বিপ্লুত স্থানচ্যুত বিদ্রাবিত হইয়া লেপ্টেনাণ্ট ওয়াটসনের সেনা ছিন্ন ভিন্ন ভাবে দিগ্বিদিকে পলায়ন করিল। মাঝখানে জীবানন্দের দলে এবং নবীনানন্দের প্রেরিত দলে দেখা হইল। তখন শান্তি আর থাকিতে পারিল না "ছি! নারীজন্মেই ধিক্!" এই বলিয়া শান্তি আবার গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িল। যেখানে দুই বিজয়ী সন্তানসেনার সম্মিলন হইয়াছে সেই খানে কুরঙ্গীর ন্যায় শান্তি ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইল। রণক্ষেত্রে মাঝখানে জীবানন্দে নবীনানন্দে দেখা হইল। দুইজনে দুইজনকে আলিঙ্গন করিল। যখন একটু অবসর পাইল তখন জীবানন্দ বলিল "শান্তি, আজ তোমার সমক্ষে মরিলে কি সুখ হইত!"

নবীনানন্দ বলিল "মরিবার এখনও সময় আছে, তুমি পুরুষ মানুষ তোমার তো বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, মরিবার দরকার হলে আমায় বলিও, আমি পথ দেখাইয়া দিব; যাও দেখি যদি ঐ পথে মৃত্যু নামে অমূল্যনিধি খুঁজিয়া পাও।" এই বলিয়া শান্তি কাপ্তেন হের সৈন্য দেখাইয়া দিল, যাইবার সময়ে জীবানন্দের কানে কানে বলিয়া দিল, "আজ মরিতে পাইবে না। সত্যানন্দের আদেশ।"

তখন বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে জীবানন্দ অশ্বারোহণে সসৈন্যে কাপ্তেন হের প্রতি ধাবমান হইলেন। শান্তি বিষণ্ণমনে নারীজন্মকে ধিক্কার করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া গাছে উঠিয়া "গেছো মেয়ে" বলিয়া আপনার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কাপ্তেন হেও দেখিলেন, যে যাহার পলায়ন অবরোধ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, সেই স্বয়ং আমার সম্মুখে আসিতেছে। কাপ্তেন হে ফিরিয়া জীবানন্দকে আক্রমণ করিবার জন্য তাহার অভিমুখী হইলেন। যেমন দুইটী পর্ব্বতনিঃসৃত নদী বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া এক উপত্যকায় এক গহ্বরে পরস্পরকে প্রহত করে—উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালায় ফেণনিচয় আকাশে প্রেরিত করে, শব্দে পর্ব্বতকন্দর বিদীর্ণ করে, তেমনি হে ও জীবানন্দের সেনাদ্বয় তুমুল

সংগ্রামের সংঘর্ষণে সংঘর্ষিত হইল। জয় পরাজয় নাই, শত শত প্রাণী নিহত হইতেছে, একবার ইংরেজসেনা "hurrah" বলিয়া দৌড়িয়া আসিয়া শত শত বৈষ্ণব দলিত করিতেছে; আবার "কলয়সি করবালং" বলিয়া সন্তানের দল ইংরেজের সেনাদলকে দলিত করিতেছে। জয় পরাজয় নাই, কি হয় বলা যায় না। কাপ্তেন হের কাছে ইংরেজের বাছা বাছা সেনা, বিশেষ গোরা, অনেক—পরাজয় কাহাকে বলে তাহারা ইউরোপে বা ভারতবর্ষে কখনও তা জানে না। প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরশ্রেণীবৎ তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহিল। সন্তানেরা যত উদ্যম করিল কিছুতেই গোরার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিল না। তাহারা শত শত সন্তান নিহত করিতেছে কিন্তু একপদ পশ্চাদ্গামী হয় না।

ইংরাজের ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাহাদের তোপগুলি দক্ষিণে আসিয়া পৌছিল। তখন সন্তানের দল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইল, জয়ের আর কোন আশা রহিল না। সন্তানেরা যে যেখানে পাইল পলাইতে লাগিল। জীবানন্দ ধীরানন্দ তাহাদিগের সংযত এবং একত্রিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই পারিলেন না। সেই সময়ে উচ্চৈঃশব্দ হইল "পুলে যাও পুলে যাও! ওপারে যাও। নহিলে অজয়ে ডুবিয়া মরিবে, ধীরে ধীরে ইংরেজসেনার দিকে মুখ রাখিয়া পুলে যাও।"

জীবানন্দ চাহিয়া দেখিল সম্মুখে ভবানন্দ। ভবানন্দ বলিল "জীবানন্দ পুলে লইয়া যাও, রক্ষা নাই।" তখন ধীরে ধীরে পিছে হটিতে হটিতে সন্তানসেনা পুলের দিকে চলিল। পুল নিকটেই ছিল। কিন্তু পুল নিকটে পাইয়া বহুসংখ্যক সন্তান একেবারে পুলের ভিতর প্রবেশ করায় ইংরেজের তোপ সুযোগ পাইল। পুল একেবারে ঝাঁটাইতে লাগিল। সন্তানের দল বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভবানন্দ জীবানন্দ ধীরানন্দ একত্র। একটা তোপের দৌরাত্ম্যে ভয়ানক সন্তানক্ষয় হইতেছিল। ভবানন্দ বলিল, জীবানন্দ, ধীরানন্দ, এস তরবারি ঘুরাইয়া আমরা তিন জন এই তোপটা দখল করি। তখন তিন জনে তরবারি ঘুরাইয়া সেই তোপের নিকবর্ত্তী গোলন্দাজ সেনা বধ করিল। তখন আর আর সন্তানগণ তাহাদের সাহায্যে আসিল। তোপটা ভবানন্দের দখল হইল। তোপ দখল করিয়া ভবানন্দ তাহার উপর উঠিয়া বসিল। করতালি দিয়া বলিল "বল বন্দে মাতরং।" সকলে গায়িল "বন্দে মাতরং।" ভবানন্দ বলিল, "জীবানন্দ এই তোপ ঘুরাইয়া বেটাদের লুচির ময়দা তৈয়ার করি।" সন্তানেরা সকলে ধরিয়া তোপ ঘুরাইল। তখন তোপ উচ্চৈঃনাদে বৈষ্ণবের কর্ণে যেন হরি হরি শব্দে ডাকিতে লাগিল। বহুতর সিপাহী তাহাতে মরিতে লাগিল। ভবানন্দ সেই তোপ টানিয়া আনিয়া পুলের মুখে স্থাপন

করিয়া বলিল "তোমরা দুই জনে সন্তান-সেনা সারি দিয়া পুল পার করিয়া লইয়া যাও আমি একা এই ব্যূহমুখ রক্ষা করিব —তোপ চালাইবার জন্য আমার কাছে জন কয় গোলন্দাজ দিয়া যাও।" কুড়ি জন বাছা বাছা সন্তান ভবানন্দের কাছে রহিল।

তখন অসংখ্য সন্তান পুল পার হইয়া জীবানন্দ ও ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে সারি দিয়া পরপারে যাইতে লাগিল। একা ভবানন্দ কুড়িজন বৈষ্ণবের সাহায্যে সেই এক কামানে বহুতর সেনা নিহত করিতে লাগিল—কিন্তু ইংরেজসেনা জলোচ্ছ্বাসোত্থিত তরঙ্গের ন্যায়! তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ!—ভবানন্দকে সংবেষ্টিত, উৎপীড়িত, নিমগ্নের ন্যায় করিয়া তুলিল। ভবানন্দ অশ্রান্ত, অজেয়, নির্ভীক—কামানে কামানে শব্দে শব্দে কতই সেনা বিনষ্ট করিতে লাগিল। ইংরেজ বাত্যাপীড়িত তরঙ্গাভিঘাতের ন্যায় তাঁহার উপর আক্রমণ করিতে লাগিল কিন্তু কুড়ি জন সন্তান, তোপ লইয়া পুলের মুখ বন্ধ করিয়া রহিল। তাহারা মরিয়াও মরে না—ইংরেজ পুলে ঢুকিতে পায় না। সে বীরেরা অজেয়, সে জীবন অবিনশ্বর। অবসর পাইয়া দলে দলে সন্তানসেনা অপরপারে গেল। আর কিছু কাল পুল রক্ষা করিতে পারিলেই সন্তানেরা সকলেই পুলের পারে যায়—এমন সময়ে কোথা হইতে নূতন তোপ ডাকিল—"গুড়ুম্ গুড়ুম্ বুম্ বুম্।" উভয়দল কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া চাহিয়া দেখিল—কোথায় আবার কামান! দেখিল, বনের ভিতর হইতে কতকগুলি কামান দেশী গোলন্দাজ কর্ত্তৃক চালিত হইয়া নির্গত হইতেছে। নির্গত হইয়া সেই বিরাট কামানের শ্রেণী দপ্তদশ মুখে ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া হে সাহেবের দলের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিল। ঘোর শব্দে বন নদ গিরি সকলই প্রতিধ্বনিত হইল। সমস্ত দিনের রণে ক্লান্ত ইংরেজের সেনা প্রাণভয়ে সিহরিল। অগ্নিবৃষ্টিতে তৈলঙ্গী, মুসলমান, হিন্দুস্থানী পলায়ন করিতে লাগিল। কেবল গোরা খাড়া দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল।

ভবানন্দ রঙ্গ দেখিতেছিল। ভবানন্দ বলিল, "ভাই, ইংরেজ ভাঙ্গিতেছে, চল এক বার উহাদিগকে আক্রমণ করি।" তখন পিপীলিকাস্রোতোবৎ সন্তানের দল, নূতন উৎসাহে পুল পারে ফিরিয়া আসিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিতে ধাবমান হইল। অকস্মাৎ তাহারা ইংরেজের উপর পড়িল। ইংরেজ যুদ্ধের আর অবকাশ পাইল না—যেমন ভাগীরথী গঙ্গা সেই দম্ভকারী বৃহৎ পর্ব্বতাকার মত্ত হস্তীকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্তানেরা তেমনি ইংরেজদিগকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। ইংরেজেরা দেখিল পিছনে ভবানন্দের পদাতিক সেনা, সম্মুখে মহেন্দ্রের কামান। তখন হে সাহেবের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। আর কিছু টিকিল না—বল,

বীর্য্য, সাহস, কৌশল, শিক্ষা, দম্ভ সকলই ভাসিয়া গেল। ফৌজদারী, বাদশাহী, ইংরেজী, দেশী, বিলাতী, কালা গোরা সৈন্য নিপতিত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ইংরেজের দল পলাইল। মার মার শব্দে জীবানন্দ, ভবানন্দ, নবীনানন্দ, ইংরেজসেনার পশ্চাতে ধাবমান হইল। ইংরেজের সব তোপ বৈষ্ণবেরা কাড়িয়া লইল, অসংখ্য ইংরেজ ও সিপাহী নিহত হইল। সর্ব্বনাশ হইল দেখিয়া কাপ্তেন হে ও ওয়াটসন ভবানন্দের নিকট বলিয়া পাঠাইল "আমরা সকলে তোমাদিগের নিকট বন্দী হইতেছি আর প্রাণিহত্যা করিও না।" জীবানন্দ ভবানন্দের মুখপানে চাহিল, ভবানন্দ মনে মনে বলিল "তা হইবে না, আমার যে আজ মরিতে হইবে।" তখন ভবানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হস্তোত্তোলন করিয়া হরিবোল দিয়া বলিল "মার মার।"

আর আর প্রাণী বাঁচিল না—শেষ এক স্থানে ৫০।৬০ জন গোরা সৈন্য একত্রিত হইয়া আত্মসমর্পণে কৃতনিশ্চয় হইয়া অতি ঘোরতর রণ করিতে লাগিল। জীবানন্দ বলিল "ভবানন্দ আমাদের রণজয় হইয়াছে, আর কাজ নাই, এই সাগরতুল্য সৈন্যের মধ্যে এই কয়জন ব্যতীত আর কেহ জীবিত নাই। উহাদিগকে প্রাণদান দিয়া চল আমরা ফিরিয়া যাই।" ভবানন্দ বলিল "একজন জীবিত থাকিতে ভবানন্দ ফিরিবে না—জীবানন্দ তোমায় দিব্য দিয়া বলিতেছি, যে তুমি তফাতে দাঁড়াইয়া দেখ একা আমি এই ৫০ জন ইংরেজকে নিহত করি।"

কাপ্তেন টমাস অশ্বপৃষ্ঠে নিবদ্ধ ছিলেন। ভবানন্দ আজ্ঞা দিলেন "উহাকে আমার সম্মুখে রাখ, আগে ঐ বেটা মরিবে তবে তো আমি মরিব।"

কাপ্তেন টমাস বাঙ্গালা বুঝিত, বুঝিয়া ইংরেজসেনাকে বলিল "ইংরেজ! আমি তো মরিয়াছি, প্রাচীন ইংলণ্ডের নাম তোমরা রক্ষা করিও, তোমাদিগকে খ্রীষ্টের দিব্য দিতেছি, আগে আমাকে মার তার পরে এই বিদ্রোহী কাফ্‌রিকে মার।

ভোঁ করিয়া একটী বুলেট ছুটিল, একজন আইরিসম্যান কাপ্তেন টমাসকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছাড়িয়াছিল। ললাটে নিবিদ্ধ হইয়া কাপ্তেন টমাস প্রাণত্যাগ করিল। ভবানন্দ তখন ডাকিয়া বলিলেন "আমার ব্রহ্মাস্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে, কে এমন পার্থ বৃকোদর নকুল সহদেব আছ যে এসময়ে আমায় রক্ষা করিবে। দেখ বাণাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় গোরা আমার উপর ঝুকিয়াছে, আমি মরিবার জন্য আসিয়াছি, আমার সঙ্গে মরিতে চাও এমন সন্তান কি কেহ আছ।"

আগে ধীরানন্দ অগ্রসর হইল, পিছে জীবানন্দ—সঙ্গে সঙ্গে আর ১০।১৫।২০।৫০ জন বৈষ্ণব আসিল। ভবানন্দ ধীরানন্দকে দেখিয়া বলিল "তুমিও যে আমাদের সঙ্গে মরিতে আসিলে?"

ধীর। কেন, মরা কি কাহারও ইজারা

মহল নাকি? এই বলিতে বলিতে ধীরানন্দ একজন গোরাকে আহত করিলেন।

ভব। তা নয়। কিন্তু মরিলে ত স্ত্রীপুত্রের মুখাবলোকন করিয়া দিনপাত করিতে পারিবে না!

ধীর। কালিকার কথা বলিতেছ? এখন বুঝ নাই? (ধীরানন্দ আহত গোরা বধ করিলেন।)

ভব। না—(এই সময়ে একজন গোরার আঘাতে ভবানন্দের দক্ষিণ বাহু ছিন্ন হইল।)

ধীর। আমার সাধ্য কি যে তোমার ন্যায় পবিত্রাত্মাকে সে সকল কথা বলি। আমি সত্যানন্দের প্রেরিত চর হইয়া গিয়াছিলাম।

ভব। সে কি? মহারাজের আমার প্রতি অবিশ্বাস? (ভবানন্দ তখন এক হাতে যুদ্ধ করিতেছিলেন।) ধীরানন্দ, তাঁহাকে রক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "কল্যাণীর সঙ্গে তোমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা তিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন।"

ভব। কি প্রকারে?

ধীর। তিনি তখন স্বয়ং সেখানে ছিলেন। সাবধান থাকিও! (ভবানন্দ একজন গোরা কর্তৃক আহত হইয়া তাহাকে প্রত্যাহত করিলেন।) তিনি কল্যাণীকে গীতা পড়াইতেছিলেন এমত সময় তুমি আসিলে। সাবধান! (ভবানন্দের বাম বাহুও ছিন্ন হইল।)

ভব। আমার মৃত্যুসম্বাদ তাঁহাকে দিও! বলিও আমি অবিশ্বাসী নহি।

ধীরানন্দ বাষ্পপূর্ণলোচনে, যুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন " তাহা তিনি জানেন। কালি রাত্রির আশীর্ব্বাদ বাক্য মনে কর। আর আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, 'ভবানন্দের কাছে থাকিও। আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।" '

ভবানন্দ বলিলেন "সন্তানের জয় হউক, ভাই! আমার মৃত্যুকালে একবার বন্দে মাতরং শুনাও দেখি।"

তখন ধীরানন্দের আজ্ঞাক্রমে যুদ্ধোন্মত্ত সকল বৈষ্ণব মহাতেজে বন্দে মাতরং গায়িল। তাহাতে তাহাদিগের বাহুতে দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইয়া উঠিল। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত্তে অবশিষ্ট গোরাসৈন্য নিহত হইল। রণক্ষেত্রে আর শত্রু রহিল না।

সেই মুহূর্ত্তে ভবানন্দ মুখে বন্দে মাতরং গায়িতে গায়িতে, মনে বিষ্ণুপদ ধ্যান করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হায়! রমণীরূপ লাবণ্য! ইহ সংসারে তোমাকেই ধিক!

মেঘনাদবধ কাব্যসম্বন্ধে কয়টী কথা।

"মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রূপকপ্রিয় দেশে, কোন লেখক যদি অধুনাতন বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া "ভগবান্ মরীচিমালীর" সহিত ইহার উপমা দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যে, "মেঘনাদই" বঙ্গের "প্রদীপ্ত প্রভাত তারা।" যিনি বাঙ্গালিকে "মেঘনাদবধ কাব্য" বুঝাইতে সক্ষম, তিনি বুঝাইলেন না। ভরসা ছিল, বঙ্কিমবাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তবে এই গুরুতর ব্রতগ্রহণ করিবে? প্রবন্ধলেখকের সে উদ্যম বুঝি কেবল ধৃষ্টতামাত্র। তবে কথা এই যে, "মেঘনাদবধের" রীতিমত সমালোচনার দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি না।

হিন্দুসন্তানমাত্রই রামায়ণের উপাখ্যানভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহত্ব, তাঁহাদের চরিত্রের বীরদর্প; জগতে অতুলনীয়া, দোষমাত্রপরিশূন্যা সীতার কমনীয়তা, তাঁহার পতিভক্তি; লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সেই বীরপুরুষের চিরোজ্জ্বল, নিঃস্বার্থপর বীরভাব;—সংক্ষেপতঃ রামায়ণের সেই স্বর্গীয়ভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসন্তান অহর্নিশ হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একটা বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়া যায়। কবির "সৌধকিরীটিনী" লঙ্কা পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভুক্ রাক্ষসের ভীষণ পাপাচার সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে পড়ে। আর সেই অশোকবনে, চেড়ীদলবেষ্টিতা, চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনীর চিত্র মনে করিয়া তিনি ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় অশ্রুবর্ষণ করেন। ইহাই রামায়ণ! অন্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। "মেঘনাদবধ কাব্য" রামায়ণ মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া রচিত। কিন্তু যেমন কেন পাঠক হউন না, "মেঘনাদবধ" পাঠকালে তাঁহার মনে হইবে, যাহা রামায়ণে নাই, মেঘনাদে তাহা পড়িতেছি। "মেঘনাদের" রাক্ষসকে ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয় না;—সে ভাবই মনে আসে না। প্রতি পদে যেন "জগতের অলঙ্কার" লঙ্কার প্রতি সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বন্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "People here grumble and say that the heart of the poet in মেঘনাদ" is with the Rakshasas! And that is the real truth." অর্থাৎ

এ দেশের লোকেরা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান রাক্ষসদের প্রতি। বাস্তবিকও তাহাই বটে।" জানিয়া শুনিয়া কবি হিন্দুসন্তানের চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধকাব্যের বীজ।

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!—যেন প্রলয়ের স্থানচ্যুতগ্রহ, মিল্টনের সেই সয়তানতুল্য!—নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ্য অনন্ত গাম্ভীর্য্যময় বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের" রাবণ? কতকটা ভক্তি প্রীতির আধার! তিনি নিজহৃদয়ের উচ্ছ্বাসে, সেতুনিগড়বদ্ধ, চিরকল্লোলময়, চিরস্বাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিয়া বলেন—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে
প্রচেতঃ! হা ধিক্, ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায় এই কি হে তোমার ভূষণ
রত্নাকর?"

যখন পুত্রশোকাতুরা, অভিমানিনী, সাধ্বী চিত্রাঙ্গদা দৃপ্ত বাক্যে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,

"হায় নাথ, নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলে আপনি!"

তখন "মহামন্ত্র বলে" নম্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা শুনিয়াছিলেন!—যেন নিরুত্তরে নিজের দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। রামায়ণের রাবণ তাহা পারিতেন কি? অসভ্যাবস্থায় দুর্ব্বৃত্ত নর যেমন নারীমাত্রকে জঘন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তিরই নিদান মাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রকৃতির। "মেঘনাদবধের" রাবণ কতকটা ভক্তি ও প্রীতির আধার। যখন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুসম্বাদ দিয়া রক্ষোদূতবেশী বিরূপাক্ষ চর অদৃশ্য হইলেন, স্বর্গীয় সৌরভে সভা পূর্ণ হইল,

"দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী
ভীষণ ত্রিশূল ছায়া"

তখন মর্ম্মপীড়িত লঙ্কেশ্বর প্রণাম করিয়া ভক্তি গদ্গদস্বরে বলিয়াছিলেন,—শুনিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না,—বলিয়াছিলেন,

"এত দিনে প্রভু,
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে
তোমার? এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব
মূঢ় আমি, মায়াময়? কিন্তু অগ্রে পালি
আজ্ঞা তব হে সর্ব্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!"

ফলতঃ "মেঘনাদবধ কাব্যের" রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়া বড় একটা চেনা যায় না। "মেঘনাদের" রাবণ,—যেন মানুষ অনেক শোক পাইয়া ধৈর্য্যলাভ করিয়াছে;—দুর্ব্বৃত্ত যুবক যেন কতক ঠেকিয়া, কতক

বুঝিয়া শান্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কল্পনাস্থলেও কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য। আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, একথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে কেবলমাত্র "কোমল যে ফুলসম" বলিয়া উড়াইয়া দিতেন না।

আমরা যাহা বুঝাইতে চাই, তাহাতে রাবণচরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে রামায়ণেতর চরিত্র করিয়া গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা বুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য প্রয়োজন ইন্দ্রজিতের চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দেখি।

প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্ত্তা শুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ করিলেন;—ক্রোধে সে কুসুম দাম ছিঁড়িলেন! বলিলেন।

"ধিক্ মোরে।
হা ধিক্ মোরে! বৈরীদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদলমাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

মেঘনাদের পিতৃভক্তি বড় সুন্দর! তাঁহার বীরভাব যেমন সুন্দর, তেমনি সরল! এতদিন তিনি নিশ্চিন্ত মনে, প্রমোদ-উদ্যানে পত্নীসহবাসে আমোদনিরত ছিলেন। পিতার আকস্মিক বিপদবার্ত্তায় অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তৃণ জ্ঞান করেন! সে কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন,—

"হে রক্ষকুল পতি,
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব! এ মায়া, পিতঃ বুঝিতে না পারি!
কিন্তু অনুমতি দেহ, সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা তড়িৎতরঙ্গের মত হৃদয়ে প্রবেশ করে। এই দেখুন—

"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে;
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে!"

ইন্দ্রজিতের মাতৃভক্তি হৃদয়কে স্নিগ্ধ করে! পুত্রবৎসলা মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্ধার্থ মেঘনাদকে বিদায় দিবেন না। রামের দৈববল সৈন্যবলের উল্লেখ করিয়া যুদ্ধযাত্রার অবৈধতা প্রতিপন্ন করিলেন। বিপদ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদায়ার্থী পুত্রের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন। এ সংসারে বীর যিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে

পারেন, কিন্তু মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকন্দরসাকে কখন মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন, কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে।—বলিলেন,

"কি সুখ ভুঞ্জিব
যতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে!
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে?
বিখ্যাত রাক্ষসকুল, দেব দৈত্য নর-
ত্রাস ত্রিভুবনে দেবি! হেন কুলে কালি
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি মা রাবণি
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময়? রথী যত
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে
যাইব সমরে মাতঃ, নাশিব রাঘবে!
ওই শুন কূজনিছে বিহঙ্গম বনে।
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে,
দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস দলে পশিব সমরে
আপন মন্দিরে দেবি, যাও ফিরি এবে।
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদরাজীবযুগ, সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি!
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।"

এ বীরত্ব, এই পিতৃ মাতৃ ভক্তি পত্নীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদের পত্নীবাৎসল্য প্রেমের আদর্শ-স্থল। তাহার মাধুর্য্য ও গম্ভীর্য্যে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। ঊষাসমাগমে কুঞ্জবনগীতে, কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও নিদ্রিতা।—

"প্রমীলার করপদ্ম, করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র মধুর স্বরে, হায়রে যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী ঊষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখিকুল! মীল প্রিয়ে, কমললোচন!
উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকান্তমণি
সম এ পরাণকান্তে; তুমি রবিচ্ছবি;—
তেজোহীন আমি, তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্য বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে
আমার! নয়নতারা! মহার্ঘ রতন।
উঠি দেখ, শশীমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরী করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!"

আবার,—তখন প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে—

"পোহাইল এতক্ষণে তিমির সর্ব্বরী;
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি কমলিনী,
জুড়াতে এ চক্ষুদ্বয়!"

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিষী ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর মুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শীতল করিবেন! তবু প্রমীলা আর একবার স্বামীকে নির্জ্জনে না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। মেঘনাদ "ধীরে ধীরে,"

"কুসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালামুখে" যাইতেছিলেন! "ধীরে ধীরে," কেন না

তখন প্রমীলার চারুমূর্ত্তি হৃদয়ে তাঁহার জাগিতেছিল। এমন সময়ে,

"সহসা নূপুরধ্বনি ধ্বনিল পশ্চাতে।
চির-পরিচিতময়ী, প্রণয়ীর কানে,
প্রণয়িণী পদশব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র,
সুখে বাহুপাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা
প্রমীলারে।"

ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,—তাহাও বড় উন্নত। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।—দেববৈশ্বানর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্ত্তি চিরশত্রু লক্ষ্মণের!—কিন্তু দেবতায় তাঁহার অটল ভক্তি,—

"সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে
কহিলা।"

আবার যখন মূর্ত্তিমান্ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ শক্তিশেলাঘাতে শয়ান, প্রাণ দেহবিচ্যুত হইতে আর বড় দেরি নাই, তখন তাঁহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাঁহার ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে এ শাস্তি হইল ইহাই তাঁহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়-শাসনে সন্দেহ জন্মিল না!

"দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?"

নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারের সেই অপূর্ব্বদৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে দেবভক্তচরিত্রের পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আমরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে।

সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের দেবোপম চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য;—ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনন্ত সৌন্দর্য্যময়! সে হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমানমাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নির্ভীক ইন্দ্রজিৎ আত্ম-চরিত্রের সর্ব্ববিধ বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;—তাঁহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। সকল ভুলিয়া পূজা করিতে ইচ্ছা হয়;—মেঘনাদের বীর দর্প; সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য!

রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়।—মনে হয় অশ্রুদুঃখিনী সীতার উদ্ধারের তবে আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' মেঘনাদের অন্যায়মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারে? 'অন্যায় মৃত্যু?' সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না! সে অন্যায় বোধ, সে দুঃখ সহানুভূতি

কেবল 'মেঘনাদ বধ' পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি?

এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিষ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষসকুল ধ্বংস করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু একের দোষে অন্যে মরে কেন? সর্ব্ব-গুণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন?

'প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে
প্রবাসী আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে
স্নেহপাত্র তার যত—পিতা মাতা ভ্রাতা
দয়িতা—মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!'

তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া গড়িবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কারস্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইবার নহিলে অন্য অর্থ নাই।

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সঙ্কীর্ণ, তাই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে কাব্যের ন্যায় পরতা বা Poetica justice এইরূপ সঙ্কীর্ণতার ফল। উন্নত ক্রমে মনুষ্য দিন দিন বুঝিতে পারিতেছে যে যে সকল নিয়মে জড় জগৎ শাসিত, নিয়মিত সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে। মনের মাধ্যাকর্ষণ কি, আজি জানিনা, ঠিক্ করিয়া বলিতে পারি না বটে, কিন্তু এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা তোমার আমার ধারণায় আইসে নাই—কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথা মাত্র, না কিছু সত্য ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শষ্পোপরি ভানুরশ্মি মাখিয়া মুহূর্ত্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনন্ত শূন্যে অনন্ত পরিমিত অনন্ত সৌর জগৎমণ্ডলী তেমনি নিয়মেরই অধীন।—সর্ব্বত্র নিয়ম! তুমি কবি;—শরতের চাঁদকে অকস্মাৎ জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে অশ্রু বিসর্জ্জন কর; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম; জড় জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ, যখন আপন প্রভাব বিস্তার

করে,তখন ইঁহার গন্তব্য পথে কেহ দাঁড়াইও না। দাঁড়াইও না!—দাঁড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতত্ত্ব কীর্ত্তন করে, "মেঘনাদ বধ" কাব্যেরও বীজ এই তত্ত্ব! সৌন্দর্য্যসার মেঘনাদ দেবদুর্ল্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সর্ব্বজ্ঞ কবির অপূর্ব্ব, অতুল্য, মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।—কিন্তু যে অস্ত্রের শক্তি রক্ষোবংশ ধ্বংস করিতে আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মথিত হইলেন। এজগতে ইহাই নিয়ম—ইহাই সত্য! এ সত্যের ব্যভিচার নাই।

বলিয়াছি ত যে জড় জগৎ বল, অন্ত র্জগৎ বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি রুসিয়া সাম্রাজ্যে বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা অন্তঃশক্তি!—শক্তি এক, তবে মূর্ত্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!—এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সান্ত্বনার কথা এই যে অন্তর্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্য জ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্য পক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তিপ্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বুঝিয়া দেখ কথা এক। সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ 'মেঘনাদবধ কাব্য' অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের অধিকাংশ অমর কাব্যের এই তত্ত্বই মেরুদণ্ড।

'মেঘনাদ বধ কাব্যের' জ্ঞানময় কবি প্রমীলাচরিত্রে কয়েকটী গুরুতর নৈতিক তত্ত্ব নিহিত রাখিয়াছেন। সে গুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। আমাদের সমাজে স্ত্রী পুরুষের সাম্য কখন ছিল কি না ঠিক্ বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রী জাতি লইয়া! কাব্য দেখ, স্ত্রী জাতির প্রধান ধর্ম্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের আকর;—কিন্তু বিধিটা একতরফা করায় ইহার শুভকারিতা অনেক কমি-

য়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য্য নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলে, বিষাদ,—কেন না তাহা হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা ঠিক্ ধর্ম্ম নহে। ফলনিরপেক্ষ ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রী পুরুষের সমবায়ে নির্ম্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, গৌরববিধ্বংসকর!

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী চিত্তময়ী রমণীচরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য্যসমাজে দুই তিনবার সে চেষ্টা হইয়াছে;—তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্য্যকারিতা সমাজ গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদীচরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিত্রা আর্য্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী আবার প্রখর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধর্ম্মিণী!—সখী কিন্তু দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করেন না। আর একবার সে যত্ন হইয়াছিল তন্ত্র শাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্র শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা স্বীকার করিবেন। তন্ত্রপ্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সর্ব্বে সর্ব্বা স্ত্রী বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া—অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য যে সে আসিয়া—অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে যায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী ব্রাহ্মণকুলের চিরোর্ব্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্রশাস্ত্রের কুহক বিস্তৃত হইল। বুঝা গেল যে, দিনকতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই—শেষে আপনিই সাম্য আসিবে। শক্তিরূপিণী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহৃদিবিলাসিনী কালিকার মূর্ত্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! যাহা অনন্ত শক্তি দেবে পারিল না বলিয়া কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্ত্তে তাহা করিল। তন্ত্রশাস্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুষ হইতে প্রবলতর; কখন বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের Odin উপবর্গ অসভ্য ইয়ুরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্র শাস্ত্র, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত হইয়াছিল।

'মেঘনাদ বধ কাব্য' যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চার উন্নতি আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীযুবক, হৃদয়ে যে সাম্য ভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুণ্ঠন-বতী ব্রীড়াসঙ্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রমীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন।

'অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?"

বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্জক আর বড় সাম্যসংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, মিষ্ট লাগে! প্রথমে বুঝি আরো মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্ ষ্টুয়ার্টমিল স্ত্রীজাতির সাম্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন;—আর আমাদের মধুসূদন 'প্রমীলা' চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক।

প্রমীলাচরিত্রের আর একটা ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;—প্রমীলা-চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে চাহিনা। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষস দম্পতীর অতুল মোহ ময় প্রেমের কারণ। যাঁহারা সাম্যকে প্রেমের কারণ বলিতে প্রস্তুত নহেন, একথাটী তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

ফুলের ভাষা।

২

সমস্ত দিন পৃথিবী দগ্ধ করিয়া নিষ্ঠুর রবি নিস্তেজ হইয়া অস্তাচলে চলিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় জ্যোতি অল্পে অল্পে প্রখরতা হারাইয়া অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিণত হইয়াছে। জ্যোতির বর্ণ সুবর্ণ-নিন্দিত, সুবর্ণ-নিন্দিত জ্যোতি ঈষৎ স্নিগ্ধমাণ, যেন ষোড়শীর সুন্দর উজ্জ্বল চক্ষে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের ছায়া পড়িয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী হাস্যময়। সেই হাসিতে ফুলগাছে ফুলের কুঁড়ি একটি একটি করিয়া দেখা দিতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্যের হাসিতে ফুলের জন্ম। ফুলের কুঁড়ি বিশ্বের হাসির উচ্ছ্বাস—বিশ্বের হাসির আকার মূর্ত্তি।

ক্রমে ক্রমে ঐ সুবর্ণমিশ্রিত জ্যোতি মলিন হইয়া আসিতেছে। ক্রমে ক্রমে ফুলের কুঁড়িগুলি ঐ মলিন আবরণে লুকাইয়া পড়িতেছে। এখন আর সে মলিন জ্যোতিও নাই—এখন সব অন্ধকার। এখন সে কুঁড়িগুলির কোথায় কি হইতেছে কে বলিবে? কিন্তু ঐ দেখ আকাশে একটি একটি করিয়া কত নক্ষত্র ফুটিয়া পড়িয়াছে, আর ঐ নক্ষত্ররাশির মধ্যে চতুর্থীর চাঁদ নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাঁসি হাসিতেছে। আর নীচে পৃথিবীতে নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র আলোকরাশির মধ্যে অসংখ্য ফুল ফুটিয়া নির্ম্মল, শীতল, সুমধুর, পবিত্র হাসি হাসিতেছে। এখন আর সে কুঁড়ি নাই। এখন সব কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইয়া গিয়াছে। কেমন করিয়া কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হইল কে বলিবে? কে বুঝিবে? এ রহস্য ভেদ করা কাহার সাধ্য? এ রহস্য কেহ কখন ভেদ করিতে পারে নাই। ভিক্টর হুগো বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন:—

"But yesterday she was a child, today she is an incomprehensible woman."

সূর্য্যের বিশ্ব-উজ্জলকারী আলোক এবং চন্দ্রের হ্লাদকারী আলোক এই দুই রকম আলোকের মধ্যবর্ত্তী অন্ধকারের ভিতর কুঁড়ি ফুটিয়া ফুল হয়। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন পবিত্র শক্তি গোপনে, নির্জ্জনে, নিস্তব্ধভাবে ফুলের কুঁড়ি ফুটাইয়া দেয়। মানুষ সে শক্তি দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না। মানুষ কেবল সেই শক্তির কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হয় আর আপনাকে চরিতার্থ মনে করে। ইহাই ফুল ফুটিবার প্রণালী। সে প্রণালী মানুষের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই মানুষ ফুল দেখিয়া এত মুগ্ধ। পৃথিবীতে মানুষ মুগ্ধ—হৃদয়ের কার্য্যে এবং প্রতিভার কার্য্যে। ফুল, তোমাকে ফুটিতে দেখি, কিন্তু কেমন করিয়া ফোট তাহা বুঝিতে পারি না। তাই বলি তুমি বিশ্বের প্রতিভার কীর্ত্তি। তোমার মতন রহস্য, তোমার মতন কাব্য, তোমার মতন দৃশ্য পৃথিবীতে আর আছে কি?

আবার, ফুল, তুমি বিশ্বের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি। সেই মধ্যাহ্ন রবির প্রখর শাসন মনে কর দেখি। তাপের পরিমাণ নাই। মাটী উত্তপ্ত হইয়া উত্তপ্ত কটাহের ন্যায় স্পর্শমাত্রে স্পর্শকারীর হস্তপদ যেন দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় যে সকল পশু পক্ষী মাঠের উপর বিচরণ করিতেছিল তাহারা আর সেই অগ্নিবৎ ভূমিখণ্ডোপরি বিচরণ করিতে না পারিয়া কেহ বৃক্ষচ্ছায়ায় কেহ বৃক্ষশাখায় নিরাশার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় মুমূর্ষুবৎ বসিয়া আছে বা শয়ন করিয়া রহিয়াছে। এমন কি দুর্দ্ধর্ষ শৃগাল কুকুর এবং বায়সগণ কোথায় লুকাইয়া

পড়িয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। নদ নদী, তড়াগ, পুষ্করিণীর বারিরাশি এমনই উত্তপ্ত হইয়াছে যে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে তথাপি এক গণ্ডূষ জল লইয়া পান করিতে সাহস করিতেছে না এবং মৎস্য কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণ জলক্রীড়া আহারান্বেষণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া বারিরাশির নিম্নতম প্রদেশে পঙ্কের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কোন মতে প্রাণ-রক্ষা করিতেছে। মানুষ সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রবির উত্তাপে মৃতবৎ হইয়া, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রুদ্ধশ্বাস রোগীর ন্যায় ঘরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে। আকাশ এবং পৃথিবী ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া যাইতেছে। আর দেখিতে পারি না—আর সহিতে পারি না—আর বলিয়া জানাইতে পারি না। কাহাকেই বা জানাইব? সকলেই ত আমার মতন পুড়িয়া যাইতেছে। বিশ্বশক্তি কঠিন নিষ্ঠুর সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যেন ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও কণামাত্র দয়া নাই, কৃপা নাই, করুণা নাই! সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে করুণা নাই? সত্যই কি ব্রহ্মাণ্ডে হৃদয় নাই? আছে বৈ কি। ঐ দেখ সেই প্রখর রবি এখন অস্তাচলে মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। বিশ্বশক্তি বিশ্বের ক্লেশে কাতর হইয়া এখন বিশ্বের সমস্ত যন্ত্রণা দূর করিতেছেন। ঐ দেখ অসীম বিশ্ব এখন বিশ্বশক্তির করুণার নিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া সকৃতজ্ঞচিত্তে, মুগ্ধান্তঃকরণে গদ্‌গদ ভাবে বিশ্বের হৃদয়ে ডুবিয়া পড়িতেছে। চারি দিকে শীতল মধুর বায়ু বহিতেছে। নিঃশব্দে নিস্তব্ধভাবে পৃথিবীর বারি-রাশি সুমধুর সুশীতল শ্বাসে দিগ্‌দিগন্ত মধুময়, মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিতেছে। বৃক্ষ, লতা, কোমল তৃণ হইতে কি এক অনুপম কল্পনাতীত মধুরিমা নির্গত হইতেছে। অনুপ্রাণিত জীববৃন্দের প্রাণের প্রাণ হইতে কি এক অপূর্ব্ব রসের লহরী নিঃসৃত হইতেছে। এই সমস্ত মধুরতা চতুর্থীর চাঁদের নির্ম্মল, সুশীতল, সুমধুর চন্দ্রিকায় মিশিয়া যাইতেছে। আর সেই মুগ্ধ চন্দ্রিকার প্রাণের প্রাণ ফুলরূপে ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই বিশ্বের হৃদয়রূপ ফুলের নেশায় মানুষ ভোর হইয়া উঠিতেছে। মানুষ সব ভুলিয়া, সব ছাড়িয়া সেই ফুলের ভিতর গলিয়া যাইতেছে। ফুল রসে ভরিয়া উঠিতেছে। অনন্ত আকাশ সমস্ত রাত্রি সেই কোমল ফুলে কোমল সুধা ঢালিয়া দিতেছে। কোমল উষাকালে ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত ভ্রমর, ক্ষুদ্র ক্ষুধার্ত্ত মধুমক্ষিকা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া সেই হৃদয়রূপ ফুলের হৃদয়গত সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া যাইতেছে। ফুল, এ জগতে ক্ষুদ্রের নিমিত্ত কাহারো হৃদয়ে সুধা নাই, কেবল তোমার আছে। তুমি যথার্থই বিশ্বের হৃদয়ের হৃদয়! তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি রাজার উদ্যা-

নেও ফোট, গৃহস্থের প্রাঙ্গণেও ফোট, দরিদ্র কৃষকের গোময়স্তূপোপরিও ফোট। তোমাকে কেবল জটাজুটধারী সন্ন্যাসী-সদৃশ ঝাউ, দেবদারু, সরলদ্রুম প্রভৃতি গোটাকত গাছে দেখিতে পাই না; এবং বুদ্ধ ও চৈতন্যের ন্যায় বহুলোকাশ্রয় বট, অশ্বত্থ প্রভৃতি দুই চারিটা গাছে দেখিতে পাই না। কিন্তু ঐ সকল গাছের অন্তর খুঁজিলে তোমাকে দেখিতে পাই কি না বলিতে পারি না।

ফুল, তুমি ফোট কেন? আকাশে নক্ষত্র ফোটে বলিয়া? তা ত জানি। কিন্তু আমি জানিতে চাই, ফুটিয়া তোমার কি লাভ? তুমি কি জন্য ফোট? একথা আমি তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। সন্ধ্যার আধঃছায়া আধ-আলোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গভীর নিশীথে অনন্ত আকাশের দিব্য দিয়া, অনন্ত নক্ষত্র-রাজির দিব্য দিয়া, অনন্ত পথের পথিক চন্দ্রের দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি। নিশাবসানে উদয়াচলস্থ রাগরূপী সূর্য্যমণ্ডলের দিকে চাহিয়া, সত্য কথা না বলিলে ঐ অগ্নি-শর্ম্মা তোমাকে পোড়াইয়া মারিবে, এই রূপ ভয় দেখাইয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। তোমাকে কত স্তব স্তুতি করিয়াছি, কত খোসামোদ করিয়াছি, কত তিরস্কার করিয়াছি। কিন্তু তুমি আমাকে কোন উত্তর দাও নাই। কেবল একটিবার মাত্র যখন তোমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম যে, উত্তর না দিলে ঐ যে ক্ষুদ্র মক্ষিকাটি তোমার বুকের অমৃত পান করিতেছে, ঐটিকে মারিয়া ফেলিব, তখন ব্যাকুল হইয়া তুমি আমাকে বলিয়াছিলে—আপনি কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তাই জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিতে তোমার এত অনিচ্ছা কেন? উত্তর দিতে কি তোমার ভয় হয়? তা ত নয়। যখন তোমাকে পোড়াইবার ভয় দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখন ত তোমাকে ভয়ে জড় সড় হইতে দেখি নাই? তখন ত তোমার সেই স্বাভাবিক লজ্জাশীল, বিনয়নম্র, প্রফুল্লতাময় মুখখানি বই আর কিছুই দেখি নাই? কোন কোন কবি বলিয়া থাকেন যে তুমি ফোট কেন, না ফুটিয়াই তোমার সুখ। কিন্তু সে কথাটি আমার মনে লাগে না। সে কথায় আমি তোমার হৃদয়ের তত্ত্ব পাই না। ফুটিয়াই যদি তুমি সুখী হইতে, তাহা হইলে তোমার মুখেই ত সে কথা শুনিতে পাইতাম। যার ফুটিয়াই সুখ সে ত আপনার শক্তি, আপনার তেজ আপনি বুঝে; সে ত আপনার তেজে আপনি তেজস্বী, আপনার তেজে আপনি ফাটিয়া পড়ে; সে ত আপনার সুখের নেশায় আপনি উন্মত্ত; সে ত আপনার মদে আপনি মত্ত; সে ত স্ফূর্ত্তিশীল, বাচাল, দাম্ভিক। সে ত স্তবে তুষ্ট হয়, সুখ নাশের ভয়ে শত্রুর নিকট

হইতে পলায়ন করে। কিন্তু তোমার ত সে রকম প্রকৃতি নয়। তুমি চন্দ্রের শীতল, সুধাময় আলোকে উন্মত্ত হও না, আবার প্রচণ্ড রবির বিশ্বদগ্ধকারী রশ্মিতে অকাতরে তোমার ক্ষুদ্র কোমল বুকটুকু পাতিয়া দাও, সে বুকটুকু সে অগ্নিতে পুড়িয়া গেলেও তুমি দুঃখিত নও। তবে, ফুল, তুমি ফোট কেন? তুমি এ কথার উত্তর দিবে না তা জানি। বুঝিতেছি তুমি এ কথার অর্থ জান না,—কেমন করিয়া উত্তর দিবে? কিন্তু তোমাকে দেখিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে রকম সুখী, তুমি যেমন অকাতরে কি বড় কি ছোট, কি বৃহৎ কি ক্ষুদ্র সকলকেই সমান আদরে তোমার হৃদয়ের সুধা ঢালিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত কর, তুমি যে রকম করিয়া মরুভূমিকেও হাস্যময় করিয়া তোল, তুমি যেমন অকাতরে আপনার কোমল হৃদয় পোড়াইয়া ফেলিতে পার, তাহা ভাবিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারি যে ফুটিয়া তোমার সুখ নয়, ফুটাইয়াই তোমার সুখ। তুমি স্বয়ং এ কথা বলিবে না তা জানি, বলিতে পারিবে না তা জানি, কেন না ফুটাইয়াই যাহার সুখ, সেই জগতে মহৎ, সে আপনাকে আপনি জানে না, সে সব ফুটায় কিন্তু মারিয়া ফেলিলেও আপনি ফুটিতে পারে না। ফুল, এ জগতে ফুটান কেবল তোমারি ধর্ম্ম, তোমারি কর্ম্ম, তোমারি ব্রত। তুমিই এ জগৎ রক্ষা করিতেছ, তুমিই এ জগতের প্রাণ। তুমি পৃথিবীরূপে স্বর্গ!

তাই বুঝি, ফুল, তুমি চিরকাল ভাবরূপী। স্বর্গ কেহ কখন বুঝিল না; স্বর্গ চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, তোমাকেও কেহ কখন জ্ঞানের দ্বারা বুঝিল না; তুমি চিরকালই ভাবময়—ভাবের ভাণ্ডার। ফুল, এমন ভাব নাই যাহা তোমাতে দেখিতে পাই না। গাম্ভীর্য্য বল, প্রফুল্লতা বল, নম্রতা বল, লজ্জাশীলতা বল, সরলতা বল, উল্লাস বল, শোক বল, বিষাদ বল, বিমর্ষ বল, চপলতা বল, সঙ্কোচ বল, সকলই তোমাতে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বটে, কিন্তু কেমন করিয়া বুঝাইতে হয় তাহা জানি না। কেমন করিয়াই বা বুঝাইব? তোমাতে যখন যে ভাব দেখি, তখন সেই ভাবে ভোর হইয়া যাই, তখন সমস্ত জগৎ সেই ভাবে ভোর বলিয়া অনুভূত হয়। তবে কেমন করিয়া বুঝাই? আর বুঝাইলেই বা বুঝিবে কে? সকলেই ত আমার মতন তোমার ভাবে ভোর। তুমি ক্ষুদ্র ফুল, তোমার শক্তি অসীম। যেখানে তুমি, সেখানে আর কিছুই থাকিতে পারে না, সেখানে সবই তুমি। ক্ষুদ্র ফুল, তুমি অমোঘ মন্ত্র। তোমার ভাবরূপ নিশ্বাসে, সকলই গলিয়া ভাবময় হইয়া যায়। পাথরের পাহাড়ে তুমি হাসিলে পাথরের পাহাড়ও হাসির পাহাড় বলিয়া বোধ হয়। ফুল, তুমিই পৃথিবীর ভাবের ছাঁচ! তুমিই পৃথিবীতে ভাবরূপী মন্ত্র!

আর সেই জন্যই, ফুল, তুমি সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। জগতে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। যে দিকে ফিরি সেই দিকেই সৌন্দর্য্য দেখিতে পাই। ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখি আকাশ সৌন্দর্য্যময়। আবার আকাশ অপেক্ষা ঊর্দ্ধতর প্রদেশ, যাহা চক্ষে দেখিতে পাই না, তাহাও ভাবিয়া দেখিলে সৌন্দর্য্যময়, সৌন্দর্য্যের উৎস বলিয়া মনে হয়। এ সৌন্দর্য্যের অর্থ কি? এ সৌন্দর্য্য কিসে হয়? অনেকে ভ্রান্ত হইয়া এই কথার কত ভ্রান্তিমূলক উত্তর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন,যে বর্ণবিশেষের নাম সৌন্দর্য্য —বর্ণ বিশেষ সৌন্দর্য্যের কারণ বা উপাদান। যাহাতে সে বর্ণ আছে তাহা সুন্দর, যাহাতে সে বর্ণ নাই তাহা সুন্দর নয়। ফুল তোমাকে দেখিলে ত এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমাতে কোন্ বর্ণ নাই?—নীল,পীত, হরিৎ, শ্বেত, যত বর্ণ আছে এবং যত রকমে সেই সকল বর্ণের সংযোগ এবং মিশ্রণ হইতে পারে সকলই ত তোমাতে আছে। তবে কেমন করিয়া বলিব যে বর্ণ বিশেষের গুণে সৌন্দর্য্য? আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন যে আকার বিশেষের নাম সৌন্দর্য্য—আকারবিশেষ সৌন্দর্য্যের উপাদান। কিন্তু, ফুল, তোমাকে দেখিলে একথাও ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। তোমার কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, তোমাতে অনেক আকার দেখিয়া থাকি। কিন্তু তোমাকে যে আকারে দেখি তুমি সেই আকারেই সুন্দর। তবে কি, ফুল, তুমি সৌরভের গুণে সুন্দর? তাই বা কেমন করিয়া বলি? কত ফুল ফোটে যাহার সৌরভ নাই, কিন্তু সে ফুলও ত সুন্দর। তাই বলি, ফুল, তুমি কেবল তোমার ভাবের গুণে সুন্দর এবং সৌন্দর্য্য। এবং তুমি, ক্ষুদ্র ফুল, তুমিই জগৎকে এই মহাতত্ত্ব বুঝাইয়া দেও যে স্বর্গে এবং মর্ত্ত্যে যাহা কিছু সুন্দর আছে তাহা কেবল ভাবের গুণেই সুন্দর। একজন ইংরাজ কবি জগদ্বিখ্যাত তাজমহল দেখিয়া বলিয়াছেন—

It is a sigh made stone!

যিনি এ কথা বলিয়াছেন তিনি প্রকৃত সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝিয়াছেন।—তিনি বুঝিয়াছেন যে সৌন্দর্য্য চক্ষে দেখা যায় না, কেবল ভাবের ঘোরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাই বলি, ভাই সকল, যদি সুন্দর হইতে চাও, যদি জগতের প্রকৃত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হও, তবে ফুলের কাছে যাইও, ফুল তোমাকে শিখাইয়া দিবে যে, সৌন্দর্য্য রূপে নাই, সৌন্দর্য্য গুণে; সৌন্দর্য্য আকারে নাই, গঠনে নাই, রঙে নাই, সৌরভে নাই, সৌন্দর্য্য ভাবে। ফুলের কাছে এই শিক্ষা লইয়া ফুলের ভাবে ভরিয়া থাকিও, দেখিবে তোমাদের সুখের সীমা নাই, তোমাদের অদৃষ্টচক্র অনন্ত উন্নতির পথে, অনন্ত সুখধামের দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে।

কিন্তু ফুল, তোমাকে হৃদয়রূপেই দেখি, ভাবরূপেই দেখি, আর সৌন্দর্য্য-রূপেই দেখি তুমি যে কি রহস্য তাহা ত বুঝিয়া উঠিতে পারি না। দেখ, যখন সন্ধ্যার মৃদু-মধুর শোভায় আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেবালয়সম্মুখস্থ শেফালিকা-মূলে উপবেশন করি, তখন আমার ক্ষুদ্র দেহের সামান্য সংঘর্ষে রাশি রাশি শেফালিকা বৃন্তচ্যুত হইয়া চারিদিক্ ছাইয়া ফেলে; অথবা যখন প্রাতঃকালের সঞ্জীবনী সমীরণে উৎসাহিত হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হই, তখন কেবল মাত্র আমার গমনজনিত বায়ু-সঞ্চালনে ঐ প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থ কামিনীবৃক্ষ হইতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামিনীফুল ঝর ঝর করিয়া খসিয়া পড়ে। এ দিকে ত দেখি, ফুল, তুমি এমনি কোমল, এমনি অসহিষ্ণু, এমনি ভঙ্গুর যে শুধু যেন একটু নিশ্বাস গায় লাগিলে, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কি এক রকম হইয়া যাও। কিন্তু আবার ঐ দেখ দেখি ওখানে তোমাকে কি ভিন্ন প্রকৃতির দেখিতেছি। ঐ দেখ আজ মহাসমুদ্রে নিদাঘ-ঝটিকা উঠিয়াছে। অপরাহ্ন-রবি অদৃশ্য হইয়াছে। আকাশ মেঘ-যুদ্ধে সংক্ষুব্ধ। অসংখ্য মেঘখণ্ড ভীমরবে গর্জ্জন করিতে করিতে অনন্ত আকাশে পরস্পরকে তাড়না করিয়া বেড়াইতেছে; এক এক খানা মেঘ ক্রুদ্ধ হইয়া অপর মেঘের প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে, আর অমনি দিগ্‌দিগন্ত ঝলসিয়া উঠিতেছে এবং বিকট শব্দে চমকিয়া পড়িতেছে। সমুদ্রের নীল জল কাল হইয়া উঠিয়াছে। সেই কাল জলে প্রচণ্ড ঝটিকোত্থিত ভীষণ তরঙ্গ সকল নভোমণ্ডলস্থ মেঘখণ্ডের ন্যায় পরস্পরকে তাড়না করিতেছে এবং রাগে ফেণা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গর্জ্জন করিয়া চারি দিকে ধাবিত হইতেছে। আকাশে মেঘ-গর্জ্জন, সমুদ্রে তরঙ্গ-গর্জ্জন, আকাশ-সমুদ্রে ঝটিকা-গর্জ্জন, আর সেই সমস্ত গর্জ্জন-রাশি ভেদ করিয়া ঝটিকা-পক্ষীর উৎকট চীৎকার—যেন এই মহাপ্রলয়ের অন্তরাল হইতে প্রলয়শক্তি প্রলয়-তূর্য্য ধ্বনিত করিতেছে। এই মহাপ্রলয়ে পড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড অর্ণবযান খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে। বড় বড় মোটা মোটা পাল তরঙ্গাঘাতে ছিঁড়িয়া কুটী কুটী হইয়া যাইতেছে, বড় বড় মাস্তুল ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকাকারে ভাসিয়া চলিয়াছে। কিন্তু ঐ দেখ একটী ক্ষুদ্র ফুল কোথা হইতে আসিয়া ঐ ঝটিকা-তাড়িত ভীষণ তরঙ্গোপরি অসীম সাহসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, প্রলয়যন্ত্রণা দেখিয়া ভিজিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু একটীও পাপ্‌ড়ি খসে নাই, একটীও পাপ্‌ড়ি সরে নাই! ফুল, কে বলে তুমি কোমল? তুমি দৃঢ়তম অপেক্ষা দৃঢ়! কে বলে তুমি অসহিষ্ণু? তুমি সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শ! কে বলে তুমি ভয়-কুণ্ঠিত? তুমি সাহসের,

তুমি বীরত্বের জীবন্ত প্রতিমা! তোমার অপেক্ষা মহত্ত্ব এ জগতে আর কি আছে! তুমি বৈপরীত্যের আধার! এই জন্য মানুষ সমাজের প্রারম্ভ হইতে কোমলহৃদয় কবি এবং সাহস সহিষ্ণুতা এবং শক্তির আদর্শরূপী ধর্ম্মবীর এবং কর্ম্মবীর, উভয়েরই শিরোপরি ফুলের মালা চাপাইয়া কোমলতার এবং বীরত্বের পুরস্কার করিয়া আসিতেছে। যে মহাপুরুষ এ জগতে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য, কেবল তিনিই মাথায় ফুল পরিতে পারেন। অতএব, ভারত-সন্তানগণ, যদি তোমরাও মাথায় ফুল পরিতে চাও, তবে দেহ, মন, প্রাণ সংকল্প করিয়া যাহাতে হৃদয়ের কোমলতা-গুণে এবং জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বীরত্বগুণে মনুষ্য সমাজে পুরস্কৃত হইবার যোগ্য হও, তাহার চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমাদের চেষ্টা যেন সফল হয়, বীরভূষণ ফুল যেন তোমাদের শিরে শোভা পায়!

সুবিস্তীর্ণ কাননে সন্ধ্যা-সমীরণ মন্দ মন্দ বহিতেছে। গাছের পাতা অল্প অল্প নড়িতেছে। আকাশে নক্ষত্র মিট্ মিট্ করিতেছে। দুই একখানা পাতলা শাদা মেঘ আস্তে আস্তে উড়িয়া যাইতেছে। সেই মেঘের ভিতর দিয়া এক রাশি ছায়ারূপী জ্যোৎস্না একখানা আবেশময় আবরণে আকাশ, পৃথিবী, দিগ্দিগন্ত ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কাননে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। শরীর আবেশময়, মন আবেশময়, পৃথিবী আবেশময়। কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, বুঝিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। চক্ষে কিছু স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, যেন কি একখানা হইয়া গিয়াছি, যেন এই আবেশময় দৃশ্যে মিশিয়া গিয়াছি। এই এক রকম হইয়া পড়িয়া আছি আর কত কি দেখিতেছি, কত কি শুনিতেছি। শুনিতেছি, কানন, পৃথিবী, অনন্তশূন্য জুড়িয়া এক অপূর্ব্ব, অস্ফুট, সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে। সে সঙ্গীত ক্ষুদ্র তৃণ হইতে নির্গত হইতেছে, কত শত লতা হইতে নির্গত হইতেছে, কত ছোট ছোট, কত বড় বড় গাছ হইতে নির্গত হইতেছে, কত সলিলরাশি হইতে, কত প্রস্তর কত পর্ব্বত হইতে নির্গত হইতেছে, ভূগর্ভ হইতে উর্দ্ধতম আকাশ হইতে নির্গত হইতেছে। যেন তৃণ, লতা, পাতা, গাছ, পাথর পর্ব্বত, জল, জঙ্গল সকলে মাতিয়া একস্বরে একতানে গাহিতেছে—আজ আমরা সব এক হইয়াছি, আজ আমাদের মধ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই, আজ আমরা বিরোধশূন্য, বিদ্বেষশূন্য, বিকারশূন্য, আজ আমরা চক্ষু পাইয়াছি, এক চক্ষে সকলে সকলকে এক-আত্মা দেখিতেছি, আজ আমরা প্রাণ পাইয়াছি, আজ আমরা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণে মিশিয়াছি। এই মোহকর সঙ্গীতে মজিতেছি আর দেখিতেছি কত

অশরীরী, ছায়ারূপী, নির্ম্মল, সুন্দর, হাস্যময় মূর্ত্তি আসিতেছে, যাইতেছে, উড়িতেছে, উঠিতেছে, নামিতেছে, পরস্পর আলিঙ্গন করিতেছে, ফুলের ভিতর লুকাইতেছে, ফুল দেখিতে দেখিতে যেন ঘুমাইয়া পড়িতেছে। কত শান্ত, সুধীর, সরল, ভাবময় মূর্ত্তি ধীরে ধীরে, অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনি করিতে করিতে শূন্য হইতে নামিয়া কত ফুলের গাছ বেষ্টন করিয়া গদ গদ ভাবে ফুল-স্তোত্র গাহিতেছে আর ফুল তুলিয়া ফুলকে অঞ্জলি পুরিয়া উপহার দিতেছে। এক একটী পবিত্র জ্যোৎস্নাময় মূর্ত্তি আস্তে আস্তে ফুলের কাছে আসিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতেছে আর কি জানি কি শুনিয়া উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া অসীম শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, এবং নিমেষ মধ্যে নামিয়া আবদ্ধ মুষ্টি খুলিয়া ফুলটীকে বলিতেছে—এই লও তোমার সাধের বুধগ্রহ লও। তখন সেই সব স্বপ্নময় মূর্ত্তি সেই অপূর্ব্ব আবেশময় পুষ্প-কাননে দাঁড়াইয়া একস্বরে এক তানে এক অশ্রুতপূর্ব্ব ফুল-স্তোত্র পড়িয়া সগর্ব্বে গাহিয়া উঠিল ;—

Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough brier,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire,
We do wander everywhere,
Swifter than the moones sphere.

গান শুনিয়া আমার চমক হইল। আমি বুঝিলাম যে এই সকল মহাপুরুষ ফুলকে কল্পনার চক্ষে কল্পনাময় দেখিয়া অনন্তশক্তি লাভ করিয়াছে, রাগ দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত হইয়া প্রেম-বলে এক-প্রাণ এক-আত্মা হইয়া গিয়াছে, এবং প্রতিভাবলে এই অসম্পূর্ণ জগতে এক অপূর্ব্ব আদর্শ জগৎ স্থাপন করিয়াছে। অতএব, ভাই সকল, তোমরা ফুলকে শুধু হৃদয় বা ভাব বা সৌন্দর্য্য রূপে দেখিয়া ক্ষান্ত হইও না। তাহা হইলে ফুলের সম্পূর্ণ শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে না। তোমরা ফুলকে কল্পনার চক্ষে দেখিও তাহা হইলে ফুল হইতে অনন্ত শক্তি লাভ করিবে এবং যে জগৎ এখন শুধু কল্পনায় রহিয়াছে সত্য সত্যই সেই জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

বাল্মীকির জয়।*

বঙ্গদর্শনে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, পুনর্মুদ্রিত হইলে তাহা বঙ্গদর্শনে সমালোচিত হইয়া থাকে না। "বাল্মীকির জয়" কিয়দংশে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল কিন্তু গ্রন্থের অধিকাংশই বঙ্গদর্শনে বাহির হয় নাই। উহার যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এ অবস্থায়, আমার সমালোচ্য গ্রন্থ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অতএব পাঠক যদি অনুমতি করেন, তবে ইহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সম্পাদকের অনুমতি পাইয়াছি।

দুঃখের বিষয়, সমালোচনা আরম্ভ করিয়া, আমি বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, যে এখানি কোন শ্রেণীর গ্রন্থ। ইহা পদ্যে লিখিত নহে, সুতরাং সমালোচক সম্প্রদায় ইহাকে কাব্য বলিবেন না। ইহা নাটক নহে আমি নিশ্চিত জানি, কেন না ইহা কথোপকথনে বিন্যস্ত নহে। ইহাকে নবেলও বলিতে পারিলাম না, কেন না ইহাতে নায়ক নাই, নায়িকা নাই, ভালবাসা নাই, কোর্টসিপ নাই, বিবাহ নাই, লুকোচুরি মারামারি খুনোখুনি কিছুই নাই। ইহাতে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের কথা আছে—কিন্তু পুরাণ নহে—দিগ্বিজয়ের কথা আছে, কিন্তু ইতিহাস নহে। একটা সৃষ্টির বিবরণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান নহে; নক্ষত্রনীহারিকার কথা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ নহে; মনুষ্যকে পশু করিবার কথা আছে, অথচ "Origin of species" নহে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নিশ্চিত একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ভাল, গ্রন্থের জাতিনির্ব্বাচন করিতে না পারি, একরকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে টাইটেল পেজে এক প্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, "The Three Forces, Physical Intellectual and Moral." ইংরেজি ভাষায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু বুঝিয়া থাকি। Forceত কিছু দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাটমূর্ত্তি—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বাল্মীকি! যদি বল এই তিনটিই আমার Force, আমার উত্তর, তোমার Force লইয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও, আমি এই ত্রিমূর্ত্তির উপাসনা করিব। তোমার মানবদেবী অপেক্ষা আমার দুর্গাঠাকুরাণী অনেক ভাল। দুর্গাঠাকুরা-

---

* বাল্মীকির জয়। শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ প্রণীত। কলিকাতা, ১৭ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন; রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥• আনা।

নীকে গড়িতে পারি, তাই পূজা করিতে পারি। মানুষদেবী কোথায়?

কথা অনেক দিন হইতে দেশে আছে—কোন্ কথা নাই? তিনটি force—physical, intellectual, moral. ত্রিগুণ, সত্ব, রজঃ, তমঃ; অথবা তমঃ, রজঃ, সত্ব, বহুকাল হইতে আছে। ক্রমে তিন গুণ ত্রিমূর্ত্তিতে পরিণত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। কিন্তু এই ত্রিমূর্ত্তিতে আর কাজ চলে না—ইহারা কেবল দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। দুই জন মন্দিরে বসিয়া চাল কলা, মহার্ঘ্য করেন, আর একজন কেবল দুর্গা প্রতিমার চাল চিত্রে। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং—আমরা অন্য ত্রিমূর্ত্তির অনুসন্ধান করি।

যিনি অখণ্ড মণ্ডলাকার চরাচর ব্যাপ্ত, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম যে দেখাইবে, সে গুরুদেব এক্ষণে সাগরপারে। ইউরোপ হইতে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র প্রেরিত হইতেছে, পূজা কর এই ত্রিমূর্ত্তি Physical, Intellectual Moral!—"দেখ Physical—আমাদের এই বাহ্য সম্পদ! এই অতুল ঐশ্বর্য্য! এই অসংখ্য অজেয় সেনা!" Intellectual—সে এই সেক্ষপীয়রের নাটক, এই গেটের কাব্য, এই কাণ্টের দর্শন এই ইউরোপীয় বিজ্ঞানসমুদ্র!! আর Moral? বুঝি শুধু খ্রীষ্ট ধর্ম্ম। এ ত্রিমূর্ত্তিতেও আমাদের মন উঠিল না—আমরা আপনাদের জন্য ত্রিমূর্ত্তি গড়িব। নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং! দেখি চল, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি কি প্রকার।

তুমি যেই হও না কেন, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কর কি? তুমি বলিবে—আমি আপনার অন্নবস্ত্রের যোগাড় করি। কে তোমাকে অন্নবস্ত্র দেয়? সমাজ। তুমি যেই হও, তুমি সমাজের খাটিয়া দাও—সমাজ তোমাকে খাইতে দেয়। যেই যাই করুক, সব পরের কাজ। সকল কাজের শেষ ফল সমাজের উপকার।

এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু সহস্র বৎসর হইতে, সমস্ত মনুষ্যবংশ চেষ্টা করিতেছে। সমাজের অনেক উন্নতিও হইয়াছে। কিন্তু এখনও মানুষের মন উঠে না। অনেকেই বলে সমাজ এখনও বড় অবনত। উন্নতির এক আধটা সোজা উপায় বাহির হয় না কি? সোজা উপায় গোটা কতক প্রথম ফরাসিস রাষ্ট্র বিপ্লবের সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। তাহার একটার বীজমন্ত্র "Faternity!" ভ্রাতৃভাব। যখন মনুষ্যে মনুষ্যে দ্বেষশূন্য হইবে, যখন কেহ কাহারও অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না, যখন সকলেই সকলের উপকারে ব্রতী হইবে, তখন সবাই অপর সবাইকে ভাল বাসিবে, যখন মনুষ্যে মনুষ্যে "ভাই ভাই" সম্বন্ধ হইবে তখনই মনুষ্যসমাজ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইবে। এই "ভাই ভাই" সম্বন্ধ যাহাতে ঘটিয়া উঠে, তাহাই সকলেরই চেষ্টা করা উচিত।

কথাটা বড় পাকা কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। একদেশের অবস্থা আমরা যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে ভ্রাতৃ-

ভাবকে বড় একটা শান্তিময় পদার্থ বলিয়া বোধ হয় নাই। আমাদের ভয় হয়, যে যদি সকল বাঙ্গালীতে ভ্রাতৃভাব ঘটিয়া উঠে—তাহা হইলে ঘরাও বিবাদে আর শরিকী মামলা মোকদ্দমায় দেশটা পয়মাল হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে জেলায় জেলায় হাইকোর্ট আর গ্রামে গ্রামে সব জজ নহিলে চলিবে না। আমাদের দেশী পণ্ডিত চানক্য ঠাকুর ইহার অপেক্ষা সার বুঝিয়াছিলেন; ভ্রাতৃভাবে হইবে না—আত্মভাব চাই। আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু দেখিতে হইবে। আরও মধুর—সর্ব্বভূতেষু!

যাই হউক, আমরা ধরিয়া লই, যে এই গ্রন্থে যেখানে "ভাই ভাই" পড়িব সেখানে মনুষ্যে মনুষ্যে অবিচল, পবিত্র প্রেম বুঝিব। এই পবিত্র প্রেম, এই ভ্রাতৃভাব কি সে হইবে? কেহ বলেন বাহুবলে। সব জয় করিয়া, এক ছত্রাধীন কর, এক খড়্গে শাসিত কর, এক আইনে বদ্ধ কর, সবাই একাচার, কাজেই একপ্রাণ হইবে। সে বৎসর লর্ড সালিসবরি, একটা সভায় বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের এক ছত্রাধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে একীভূত হইতেছে। বৎসর কত হইল, আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ নিগ্রোকে ভাই বলিতেছে না দেখিয়া, উত্তরভাগ তরবারি লইয়া দক্ষিণকে রক্তস্রোতে ডুবাইয়া ভ্রাতৃমন্ত্র জপাইল। আর এক সম্প্রদায় বলেন, পণ্ডিত হও! আমি যাহা শিখাই শিখ, আমি যে শিকল পরাই পর, সকলে এক অবস্থায় দাঁড়াইবে—সকলেই ভাই ভাই হইবে। মধ্যকালে ইউরোপের রোমীয় পাত্রীরা এই সম্প্রদায়ের লোক। যাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষের মর্ম্ম না বুঝেন, তাঁহারা ঐ ব্রাহ্মণগণকে এই দলভুক্ত করেন। আর একদল বলে, "আমাদের বাহুবল নাই, বিদ্যাবল নাই—আছে কেবল বাক্যবল; আমরা পরের জন্য কাঁদিতেছি, তোমরা দাঁড়াইয়া একবার শুন দেখি। তাহা হইলেই তোমরা ভাই ভাই হইবে।" যীশু ও শাক্যসিংহের ন্যায় ধর্ম্মবেত্তা, সোক্রেতিসের ন্যায় নীতিবেত্তা, আর সুকবিগণ এই দলভুক্ত। এই হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ত্রিমূর্ত্তি—এই তাঁহার বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ এবং বাল্মীকি। এই তিনকে "Physical, Intellectual, এবং Moral" নাম দেওয়া ঠিক হইয়াছে—এমত আমাদের বোধ হয় না।

যাহাই হৌক, এক্ষণে গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশ করি। লোকে বলে পুণ্যবান্ মনুষ্য মরিয়া স্বর্গে যায়, কিন্তু বেদমতে তাহারা স্বর্গে যায় না তাহারা ঋভু হয়। ঋভুগণ, কোন দিব্য লোকে বাস করে। গ্রন্থের প্রথমদৃশ্য, ঋভুগণ এক রাত্রে, সংমিলিত হইয়া পৃথিবীদর্শনে আসিতেছেন। কাব্যাংশে বাঙ্গালা ভাষায় এদৃশ্যের তুল্য কোথাও কিছু নাই। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ধিসময়ে এক অমাবস্যার রাত্রে "সহসা ছায়া পথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইল—তাহার মধ্য হইতে অগণিত সংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন।

উক্ত শরৎ অমাবস্যারাত্রে সহসা ছায়াপথ দ্বিধা বিদীর্ণ হইয়া গেল,আর তাহার মধ্য হইতে অগণিতসংখ্যক ঋভুগণ বহির্গত হইলেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের শরীরপ্রভায় আলোকিত হইল। নক্ষত্রের কিরণ অন্তর্হিত হইল, নক্ষত্রগণ চিত্রার্পিতবৎ আকাশপটে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঋভুগণ মুহূর্ত্তমধ্যে আকাশপথ অমিক্রম করিলেন। পক্ষী ঝাঁক বাঁধিয়া বেড়ায়, দেখিতে কতই সুন্দর; কিন্তু যখন তীব্র জ্যোতির্ম্ময় ঋভুগণ শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত করিয়া—আকাশপথ আচ্ছন্ন করিয়া দলে দলে আসিতে লাগিলেন, তখন পৃথিবীস্থ মানববৃন্দ চমৎকৃত হইয়া গেল। কেহ বলিল, ধূমকেতু উঠিয়াছে, কেহ বলিল, নক্ষত্রসমূহ খসিয়া পড়িতেছে।”

ঋভুগণ হিমালয়ে অবতীর্ণ হইলেন। গ্রন্থারম্ভে হিমালয়ের একটি চমৎকার বর্ণনা আছে। তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম না—উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল এ জন্য উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ বর্ণনা পড়িয়া, যে অদ্বিতীয় হিমালয়বর্ণনা আজিও সাহিত্য সাগরে অতুল —তাহা স্মরণ কর। দেখিবে পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষে বা গুণে দেশী ক্লাসিকে আর দেশী আধুনিকে কি প্রভেদ! কুমারসম্ভবের কবি,—জগতের কবিকুলের আদর্শ— অতিপ্রকৃত সৌন্দর্য্যের (Ideal) অবতারণায় অদ্বিতীয়, কেহ তাঁহার নিকটে যাইতে পারে না। কিন্তু আধুনিককবি প্রকৃতের (Real) বর্ণনায় কি সুচতুর! ইউরোপ হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাইতেছি। আমাদের চিরমার্জ্জিত পবিত্র অতিপ্রকৃত চরিত্র পরিত্যাগ করিয়া, আমরা ইউরোপীয় আদর্শ দেখিয়া পার্থিব অপবিত্র প্রকৃত চরিত্রের অনুসরণ করিতেছি। ইহাকে বলে উচ্চশিক্ষা। নীচশিক্ষা কাহাকে বলিব?

ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া গান করিলেন। সে গানে বিশ্ব বিমোহিত হইল। গানের ধূয়া “ভাই! ভাই! ভাই! সকলেই ভাই!” গান করিয়া ঋভুগণ আকাশপথে চলিয়া গেলেন —

“কিয়ৎক্ষণ পরে ঋভুগণ হিমালয়শিখরসমূহ ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠাদির বোধ হইল, রাশিচক্র অন্যপথে ঘুরিতেছে। ক্রমে ঋভুগণ যত দূরবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, বোধ হইতে লাগিল, লক্ষ লক্ষ নূতন নক্ষত্রের আবির্ভাব হইল, ক্রমে আর নক্ষত্রভাবও রহিল না। বোধ হইল, আকাশ প্রকাণ্ড এক শাদা মেঘে আবৃত হইয়া উঠিল, ক্রমে মেঘ ছায়াপথগর্ভে প্রবেশ করিল। বোধ হইতে লাগিল, হরিতালী সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিবে, দ্বাপরের শেষকালে অর্জ্জুন যেমন বিরাটমূর্ত্তি নারায়ণের মুখে বিশ্বসংসার প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়াছিলেন, এ সময়েও সেইপ্রকার বোধ হইতে লাগিল।

ক্রমে সমস্ত শ্বেতমেঘপুঞ্জ হরিতালীগর্ভে নিলীন হইল। হরিতালীর মধ্যগহ্বর পূর্ণ হইল। বিশ্বসংসার আবার যেমন তেমনি হইল, আবার নক্ষত্র জ্বলিল, আবার আকাশ স্থির হইল, আবার আকাশের কোমল নীলিমা বিকাশ হইল। পৃথিবীতে প্রভাত হইল, কাক, কোকিল ডাকিয়া উঠিল।"

গান শুনিয়া পৃথিবীস্থ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনজনের উপর এই গানের বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছিল। একজন বাহুবলে বলী দিগ্বিজয়ী রাজা বিশ্বামিত্র। দ্বিতীয় বিদ্যাবলে বলবান্ ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ। তৃতীয় নরহত্যাকারী দস্যু বাল্মীকি।

বিশ্বামিত্র সেই "ভাই ভাই" স্নেহময় গীত শুনিয়া ভাবিতেছেন, যে তিনি মনুষ্যজাতিকে ভাই ভাই সম্বন্ধে মিলাইতে পারিবেন। "অহহ বিশ্বামিত্র। ভুবন জয় ত করি। তাতে কেহ বাধা দিতে পারিতেছে না। সব হাত ত করি। তার পর মিলাইব। কাণে বাজিল ভাই ভাই। ভাবিলেন পৃথিবীতে এক দিন ঐরূপ গাওয়াইতে পারি তবে আমি বিশ্বামিত্র—কিন্তু পারিব না কি? এ কাজে এ ভুজদ্বয় কি সক্ষম হইবে না?"

—বশিষ্ঠ ভাবিতেছেন:—"বুদ্ধির কি মহিমা! একবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয়দিগকে কি ফাঁকিই দিয়াছি। আবার ভাবিতেছেন, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণে মিলাইয়াছি, এমন কি অন্য জাতি মিলাইতে পারিব না? * * ধর্ম্মশাস্ত্র ত আয়ত্ত করিয়াছি। তেজ কি? শাস্ত্রে ত বলে "স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ" তার আবার মান অবমান কি? পৌরোহিত্য লাঘব সত্য, কিন্তু ক্ষমতা ত সবই ব্রাহ্মণের। খুব খেলাই খেলিয়াছি। আবার সংহিতা করিতেছি। তারও এই মানে। যোগ শাস্ত্র, তারও ঐ মানে। মান হউক, অবমান হউক, কাজ উদ্ধার করিব, পারিব না কি? তেজঃ, সত্য। ধর্ম্ম, সব মিথ্যা। কাজ সত্য। পারিব না কি? ঋভুরা কেন আসিলেন?

বাল্মীকি ভাবিতেছেন, 'কত খুনই করিয়াছি, কত অভাগিনীকে বিধবাই করিয়াছি, এ মহাপাতক কিসে যায়? এ জ্বালা কিসে নিবাই। এই যে ঋভু দেখিলাম। এই যে গান শুনিলাম। তাহাতে হৃদয় জ্বালাইয়া দিল। আমি ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাম না! হায় কেন আমি মানুষ হইয়াছিলাম। কোথায় সব ভাই ভাই হব না আমায় দেখে সবাই পালায়। হে দেব! কেন আমার এ জঘন্য বৃত্তি হইয়াছিল।' "

গোড়াতেই বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রে একটা দ্বন্দ্ব বাঁধিয়া গেল। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র উভয়ে প্রভাতে হিমালয় অবতরণ করিতেছিলেন—সাক্ষাৎ হওয়াতে পরস্পরে পরিচিত হইলেন—এবং প্রথমে মিষ্টালাপ হইল। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নিমন্ত্রণ করিয়া শিবিরে লইয়া গেলেন,—আপনার অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইলেন,

বশিষ্ঠের খুব সমারোহে আতিথ্য-সৎকার করিলেন, এবং রত্নরাশি তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন। বশিষ্ঠ বিদায়কালে, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের তপোবনে নিমন্ত্রণ রাখিতে গেলেন। গিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অপেক্ষাও বশিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য গুরুতর। দেখিয়া :—"বিশ্বামিত্র বলিলেন,

'মহাশয় আপনি ঋষি, বনবাসী, আপনার এ অতুল ঐশ্বর্য্য কোথা হইতে আসিল।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'মহারাজ আমার এক গাভী আছেন, তিনি কামধেনুর কন্যা, তাঁহার নাম নন্দিনী, তিনি আমার সমস্ত ইচ্ছামত দিয়া থাকেন।'

বিশ্বামিত্র বলিলেন, 'তবে অন্য উপঢৌকনে আমার তৃপ্তি হইবে না, আমায় সেই গোরুটি দিতে হইবে।'

বশিষ্ঠ বলিলেন, 'আমি যখন তাহার মার কাছ হইতে তাহাকে লইয়া আসি, তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আসি যে, উহাকে কখন কাহাকেও দিব না।' "

বশিষ্ঠ গোরু দিলেন না—বিশ্বামিত্র আপনার সৈন্যের প্রতি আদেশ করিলেন, যে গোরু কাড়িয়া লইয়া চল। তখন বশিষ্ঠ কি করেন?—ব্রাহ্মণস্য বলং ক্ষমা। কিন্তু নন্দিনীকে কাড়িয়া লইয়া যায়, কার সাধ্য?—নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে অগণিতসংখ্যক সেনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। বিশ্বামিত্র তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া নন্দিনীকে ছাড়িয়া দিয়া পলাইলেন।

বাহুবল, বিদ্যাবলের কাছে পরাজিত হইল। তার পর এখন, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবলের কাছে পরাজিত হইলেই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়—বাল্মীকির অন্ন ঘটিয়া যায়। কিন্তু নবীন গ্রন্থকার—অব্যাহত প্রতিভার বলে মহাবলবান্—এ সোজা পথে যাইতে ঘৃণা করিলেন। আমরা এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে লেখকের গতিকে নৃসিংহের গতির সঙ্গে মনে মনে তুলনা করিয়াছি।

বিশ্বামিত্র দেখিলেন, "ধিক্ বলং ক্ষত্রিয় বলং—ব্রহ্মতেজোবলং বলং"—তিনি তখন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতে গেলেন—তাঁহার কঠোর তপস্যায় দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—ব্রহ্মা বর দিতে আসিলেন। বিশ্বামিত্র চান, "ব্রাহ্মণত্ব"। কিন্তু বশিষ্ঠাদি ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্রেই হউক, আর যাই হউক, ব্রহ্মা কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব দিলেন না। বিশ্বামিত্র কিছুতেই অন্য বর পাইলেন না—ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মর্ষিগণকে হাঁকাইয়া দিলেন। বলিলেন :—

"তোমরা স্তোকবাক্যে প্রবোধ দিয়া আমায় ব্রাহ্মণত্বে বঞ্চিত করিলে। কিন্তু আমি আর ব্রাহ্মণত্বপ্রত্যাশী নহি। আমি ব্রহ্মত্ব চাহি, তোমাদের খোসামোদ ও তপস্যা আর করিব না, আমি নূতন পৃথিবী নির্ম্মাণ করিব, তাহার ব্রহ্মা

হইব। আমার পৃথিবী হইতে দুঃখ দূর করিয়া দিব। ব্রাহ্মণ দূর করিয়া দিব। সাধ দেখি তোমরা কেমন পার।”

তপোবলে বিশ্বামিত্র নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে দুঃখ রহিল না—ব্রাহ্মণ রহিল না। বিশ্বামিত্র তাহার নিয়ন্তা। পাঠক দেখিবেন যে, গ্রন্থকারের বিশ্বামিত্র এখন আর বিশ্বামিত্র নহেন—এখন তিনি বশিষ্ঠ। এখন তিনি বাহুবল নহেন—এখন বিশ্বামিত্র তপোবল, বিদ্যাবল। নন্দিনীর হুঙ্কারে সাগরবৎ সেনা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল—বিশ্বামিত্রের ইচ্ছায় নূতন সৌরজগৎ সৃষ্ট হইল। বিশ্বামিত্রকে বশিষ্ঠ করিয়া, গ্রন্থকার আবার তখনই তাঁহাকে বাল্মীকির পথে আনিতেছেন। বিশ্বামিত্র নূতন জগতের নিয়ন্তা—কিন্তু মনুষ্য। মনুষ্য বলিয়া, জন ষ্টুয়ার্ট মিল, একদিন কাঁদিয়াছিলেন, “সব হইল—কিন্তু সুখ কই?” বিশ্বামিত্রও এখন কাঁদিলেন, “সব হইল, কিন্তু সুখ কই?” সুখের জন্য পৃথিবী হইতে নিজ পুরী ও আত্মীয় স্বজন সহিত কান্যকুব্জনগর উঠাইয়া লইয়া আপনার সৃষ্টিতে চলিলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের তপোবল ফুরাইয়া গিয়াছিল, কিছুদূর গিয়া পুরী আর যায় না—পড়িয়া যায়—ব্রহ্মা ধরিয়া নামাইয়া লইলেন। তার পর, বিশ্বামিত্র নিজে স্বীয় সৃষ্টিতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় শূন্য হইতে পৃথিবীতে পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বাল্মীকি, ঋভুদিগের গান শুনিয়া অবধি দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এখন তিনি পরের দুঃখে বড় কাতর। পরের দুঃখে কাতর বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে পবিত্রতা জন্মিল। সেই কাতরতাই নীতি—তাহার প্রকাশ কবিত্ব। পরের প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া বাল্মীকি হৃদয়ে কবি হইয়াছিলেন—ভারতীর কৃপায় তিনি বাক্যেও কবি হইলেন। যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বাল্মীকিপ্রতিভা”—পড়িয়াছেন, বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বাবুর অনুগমন করিয়াছেন।

বাল্মীকি এখন পৃথিবীর নীতিশিক্ষক—প্রথম কবি। তিনি পৃথিবীময় গান করিয়া বিচরণ করেন—সমবেদনা শিখান—তিনি ভাই ভাই মন্ত্রের প্রকৃত সাধক। সম্প্রতি কৌশাম্বীনগরে রাজা যজ্ঞ করিতেছেন—সেইখানে সমস্ত পৃথিবী আহূত ও সমবেত। একটা গণ্ডগোল বাঁধিয়া উঠিয়াছে—একদল যজ্ঞ করিতে দিবে আর একদল দিবে না। দুইদলে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। নিবারক একা বাল্মীকি। বাল্মীকির অস্ত্র—অশ্রুজল,—বাণীদত্ত বীণা। এই সময় অনন্ত শূন্য হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে চেতনাশূন্য

বিশ্বামিত্র আসিয়া সেই যজ্ঞকুণ্ডে পড়িলেন। তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া লোকে ভীত ও বিস্মিত হইল—বাল্মীকির বাক্যবল বাড়িয়া গেল—তাঁহার সকরুণ গানে সমস্ত চরাচর বিমুগ্ধ হইল—লোকের মন ফিরিল—বিবাদ বিসম্বাদ মিটিয়া গেল—বাল্মীকির জয় হইল।

ব্রহ্মার কৃপায় বিশ্বামিত্র জীবন পাইলেন। বিশ্বামিত্র দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মার স্তুতি ও আপনার অপরাধ স্বীকার করিলেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকিতে মিল হইল। বাহুবল, বিদ্যাবল, ধর্ম্মবল একত্রিত হইল। ব্রহ্মা ঋষিত্রয়কে আদেশ করিলেন যে :—"সর্ব্বলোকমধ্যে ঐক্য স্থাপন মানসে নারায়ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইতেছেন। তোমরা তাঁহার ক্রিয়াপ্রণালী স্থির করিয়া রাখ।" বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ও বাল্মীকি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

তখন তিনজন ঋষি রামায়ণ "Plot" নির্ম্মাণ করিতে বসিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "রামকে ধার্ম্মিক কর।" বিশ্বামিত্র বলিলেন, "তাঁহাকে রাজনীতিজ্ঞ কর।" বাল্মীকি বলিলেন, "আমি রামকে আদর্শ মনুষ্য করিব।"

রামায়ণ প্রণীত হইল। তার পর রাম অবতীর্ণ হইলে রামায়ণ অভিনীত হইল। তার পর রামায়ণ গীত হইল—নারায়ণ বৈকুণ্ঠে গেলেন। শেষ বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার আদেশে দেহত্যাগ করিলেন। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষিমধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন—বিশ্বামিত্র ঋভুদিগের নেতা হইলেন। ব্রহ্মা, বাল্মীকিকেও স্বর্গযাত্রার জন্ম অনুরোধ করিলেন, কিন্তু বাল্মীকি তখন গেলেন না—তাঁহার কার্য্য শেষ হয় নাই, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তখনও জন্মে নাই। শেষে ব্রহ্মার আদেশে তিনি নভোমণ্ডলে বিরাট মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। বাল্মীকি সেই বিরাট মূর্ত্তির স্তুতিবাদ করিলেন।

'নমঃ পুরস্তাদথপৃষ্ঠতস্তে
নমোস্তুতে সর্ব্বতএব সর্ব্ব
অনন্তবীর্য্যো মিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোসি সর্ব্বঃ॥'

"তখন ব্রহ্মা বলিলেন 'বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও পৃথিবীময় এই সাম্য ভ্রাতৃভাব ও একতি গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে, তোমারই জয়।'

বিরাটের মুখ হইতে বিরাটস্বরে ধ্বনি হইল 'জয়!' "

পাঠক গ্রন্থের পরিচয় পাইলেন, এখন ইহাকে যাহা বলিতে হয়, তিনি নিজেই বলুন। অনেকে বোধ হয় বলিবেন, এ সকল কেবল পৌরাণিক কথা—আমাদের জানা আছে। যাঁহারা আরও বাহাদুর তাঁহারা বলিবেন, যে এ—কেবল গাঁজা। ছায়াপথ ফাটিয়া দ্বিধা হইল—নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সহস্র সহস্র সেনা

সৃষ্ট হইতে লাগিল, বিশ্বামিত্র ব্রহ্মার ন্যায় দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এ সকল ধাঁধা নয় ত কি? যাঁহারা আর একটু সুশিক্ষিত, তাঁহারা বলিবেন, এ রূপক। নন্দিনীর প্রতিহুঙ্কারে সৈন্যের সৃষ্টি, ইহার অর্থ সরস্বতীর অনুকম্পায় জড়বলের উপর মনুষ্যের আধিপত্য স্থাপন। নন্দিনীর এক হুঙ্কারে বারুদের সৃষ্টি, আর এক হুঙ্কারে ধূমযন্ত্র ষ্টীমের কল, বাষ্পীয়পোত, রথ, ইত্যাদি, ইত্যাদি। যদি কেহ রূপক বলিতে চান; আমরা তাঁর সঙ্গে বিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিব না। আমরা বলিব, ইহা যদি রূপক হয়, তবে স্পেন্সরের রূপকের মত, রূপক কাব্যে ডুবিয়া গিয়াছে। ইহার রূপকত্ব কেহ দেখিবে না।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক দোষ আছে। কাব্যের গঠন সকল স্থানে কৌশলযুক্ত নহে। যথা, বিদ্যাবলের পরাজয়, বশিষ্ঠে নহে, বিশ্বামিত্রে। বাল্মীকির গীত গুলিতে কারিগরি নাই। কিন্তু আমরা এ সকলের কথা বলিব না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন কিরণে ডুবিয়া যায়, এও তাই। ইহার গুণ সকল বলিয়া উঠি এমন সময়ও নাই। কাব্যের প্রধান উৎকর্ষ—কল্পনায়। ইহার কল্পনা অতিশয় মহিমাময়ী। ঋতুদিগের আগমন, বিশ্বামিত্র, বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, বিশ্বামিত্রের অধঃপাত, কৌশাম্বীর যজ্ঞ, অন্তে বিরাট দর্শন,—যাহা দেখ সকলই মহিমাময়ী কল্পনায় সমুজ্জ্বল। সর্ব্বাপেক্ষা এই বিশ্বামিত্রই ভয়ানক মূর্ত্তি। রাবণ বা বৃত্রাসুর যে ছাঁচে ঢালা এ সে ছাঁচে ঢালা। আমরা রামায়ণের রাবণ বা পুরাণের বৃত্রের কথা বলিতেছি না। মধুসূদনের রাবণ—হেমচন্দ্রের বৃত্রাসুর। সে ছাঁচ বড় ভারি ছাঁচ। কিন্তু মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কাব্যের ধাত্রী ইংরেজি সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের পক্ষে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাপা জোঁকা বেড়া গোড়া। রাবণ ও বৃত্র প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হইলেও মাপা জোকা বেড়া গোড়া। কেবল সেই প্রাচীন পুরাণপ্রণেতারা অপরিমেয়, অনন্ত বিরাটমূর্ত্তি সৃষ্টি করিতে জানিতেন; পৃথিবীতে আর কোথাও এমন কোন জাতি জন্মে নাই যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় মানসিকশক্তি ধরিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইংরেজিতে সুশিক্ষিত হইয়াও প্রাচীন আর্য্যশাস্ত্রে অতিশয় সুপণ্ডিত, তাঁহার মানসিক শক্তির পরিপোষণে পাশ্চাত্য ও আর্য্য উভয়বিধ সাহিত্যই তুল্যরূপে প্রবেশ করিয়াছে। এবং এই বিশ্বামিত্র প্রণয়নকালে তিনি প্রাচীন আর্য্যসাহিত্যের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যাঁহাদের রুচি পাশ্চাত্য সমালোচকদিগের ব্যবস্থানুযায়ী, তাঁহাদের কাছে এ বিশ্বামিত্রের কোন আদর হইবে না।

যেমন কল্পনা, তেমন বর্ণনা। বর্ণনার আমরা অনেক পরিচয় দিয়াছি। ভাষা সম্বন্ধে মতভেদ হইতে পারে কিন্তু

আমরা এই গ্রন্থের বাঙ্গালাকে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বলি। এই বঙ্গদর্শনে অনেকবার এ পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে, সুতরাং সে কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ খানি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় একটি উজ্জ্বলতম রত্ন। আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থকার এত অল্প বয়সে এরূপ প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এমন আমাদের স্মরণ হয় না।

"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?"

"স্বভাবে কি অর্থ নাই"—প্রান্তর সে স্থান
অদূরে ভীষণ মূর্ত্তি বিশাল ভূধর
ভেদিয়া গগনবপু হয়েছে উত্থিত।
গিরি-পদমূলে ভূমি—প্রকাণ্ড প্রান্তর
তৃণহীন—তরুহীন—প্রবাহ বিহীন
মরুময়—ভীমাকৃতি—বিশাল কান্তার।
নিম্নভাগে এই দৃশ্য—উর্দ্ধে ততোধিক
অচল অটল বেশে সায়াহ্ন গগন
অনাদি—অনন্ত—শূন্যে পড়েছে ছড়ায়ে।
সুদীর্ঘ—সুদূর—যেন তা হ'তে অধিক
অবিশ্রাম—অবিরাম—অনাদি অক্ষয়
একটী মহান্ দৃশ্য করিয়া চিত্রিত
দর্শকের নেত্র-পথে করেছে স্থাপিত।
বিস্ফারিত নেত্রে যেন চাহি ক্ষিতি পানে
ছুটেছে অসীম শূন্যে অশ্রান্ত প্রভাবে;
ইঙ্গিতে কহিছে যেন—"হও অগ্রসর
এইরূপে—এইবেশে এমনি প্রভাবে,
দেও চিত্ত ছড়াইয়া—অনন্ত বিস্তারে
সাধনার এই ছবি—এমনি আকার
আকাঙ্ক্ষার শূন্য-পথে এমনি করিয়া
অবিশ্রাম অবিরাম হও অগ্রসর।"
এ হেন মহান দৃশ্যে নয়ন রাখিয়া
ভীষণ কান্তারে সেই দাঁড়াইয়া যুবা
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" কহিল কাতরে।
অস্তমান দিবাকর লোহিত বরণে,
ঢালিয়া কাঞ্চন ভাতি উতরে পশ্চিমে
দেখাইয়া গগনেরে যেন প্রলোভন
কহিছে ইঙ্গিত করি—"কোথা যাও ছুটি
আইস আমার সনে অধঃপাতে যাই
হেম কান্তি অঙ্গে মম ঝরিতেছে যাহা
ঈষৎ প্রভায় যার এত শোভা তব
এ হ'তে কতই রম্য মহার্ঘ রতন
অধঃপাতে রাশি রাশি রয়েছে বিস্তৃত।
এই পদছায়া মম করিয়া ধারণ
এস নভঃ অধঃপাতে ভবনে আমার।"
হাসিয়া ঘৃণায় যেন উগ্রতর বেশে
ছুটেছে গগন শূন্যে অসঙ্কোচ ভাবে।
মলয় সমীর পুন ছড়ায়ে সৌরভ

ঊর্দ্ধ মুখে ছুটিয়াছে নিয়ে গগনের,
কহিছে আদরে যেন মোহিনী ভাষায়
" কোথা যাও রহ রহ দেখ একবার—
কুসুম-ভাণ্ডার লুটি ভূতল হইতে
এনেছি সুগন্ধ কিবা তোমার কারণ,
কত যে কৌশল করি কতই যতনে
কমল কোরক হ'তে এ গন্ধ হরিনু
কি আর কহিব তোমা, কেতকী মালতী
টগর মল্লিকা আর গোলাপ সেফালি
লাজে জড়সড় আহা যন্ন দলে ঢাকি
রেখেছিল লুকাইয়া হৃদয়ের নিধি
দরিদ্র সাধুর গুপ্ত সুখের মতন
তা সবে কতই সাধি কতই ভুলায়ে
হরিয়া এনেছি এই গন্ধ সম্মোহন।
দেখ পুন অঙ্গ মোর আলিঙ্গি বারেক
অকূল অতল সিন্ধু সলিলে ভাসিয়া"
মধ্যস্থল হ'তে তার শীতল পরশ
এনেছি হৃদয়ে তুলি, নির্ম্মল নির্ঝর
নিভৃত পর্ব্বত দেশে বহিছে গোপনে
রমণীর হৃদয়ের প্রেমস্রোতমত,
ভাসিয়া ভাসিয়া তার প্রতি কণা হ'তে
এনেছি এ শীতি ভাব যতনে তুলিয়ে
শীতলিতে অঙ্গ তব,—আইস গগন
"কোথা যাও ছুটি শূন্যে রহ এইখানে
ক্ষণকাল প্রেমালাপ করি দুই জনে।
না হেরি—না শুনি তাহা সমধিক বেগে
ছুটেছে গগন শূন্যে উদ্দেশে আপন।"
বসুন্ধরা খুলি বক্ষ ছড়ায়ে সুষমা
কহিতেছে যেন পুন মোহিনী ভাষায়
""একবার দেখ চেয়ে গগন হেথায়,
সৌন্দর্য্যের চিরবাস হৃদয় আমার
এমন শীতলতোয়া অকূল বারিধি
এমন উদ্যান বন শোভার আধার
শাখায় শাখায় যার পল্লবে পল্লবে
মধুর শীতল ছায়া রয়েছে জড়ান।
বৃন্তে বৃন্তে বৃন্তে যার বিবিধ কুসুম
দলে দলে বিকাশিছে প্রাণ সম্মোহন
এমন ভূধর রাজি জঙ্গমে ভূষিত
এমন প্রান্তর মাঠ দূর্ব্বায় শোভিত।
বীণাবিনিন্দিত স্বরে কল নিনাদিনী
দর্পণ হৃদয়া হেন নির্ঝর তটিনী
ষড় ঋতু রঙ্গভূমি এমন আবাস
নর নারী পশু পক্ষী পূর্ণ এ সংসার
তোমার মানস সুধু তুষিবার তরে
বিপুল এ শোভা বক্ষে করেছি ধারণ
কোথা যাও শূন্য-পথে কি আছে উহায়
মম রাজ্যে ক্ষণকাল করহ বিহার।"
হাসিয়া বিকৃত হাস তীব্র দৃষ্টি করি
উগ্রতম বেগে নভঃ যেন শূন্যে ছোটে।
ধীরে নত করি যুবা অবসন্ন শির,
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" কহিল কাতরে।
মলিন যুবার মুখ, বদন মণ্ডলে
অঙ্কিত হয়েছে গাঢ় বিষাদের ছায়া
রুক্ষ মস্তকের কেশ, শুষ্ক কলেবর
অঙ্গ আবরিত জীর্ণ মলিন বসনে
অতি দরিদ্রের বেশ—কিন্তু অবয়বে
আয়ত উজ্জ্বল শান্ত যুগল নয়নে
গাম্ভীর্য্যে প্রশান্ত সেই কাতর বদনে
ঝরিয়া পড়িছে যেন মহত্বের আভা।
ধনী হও—রাজা হও—জ্ঞানী কিম্বা বীর
শঙ্কিত হইবে তুমি সম্ভাষিতে তায়
ভয় ভক্তি যুগপৎ অন্তরে তোমার

উঠিবে উথলি,—তুমি স্তম্ভিত হইবে।
বিস্মিত নয়নে স্থধু রহিবে চাহিয়া
অদ্ভুত লক্ষণপূর্ণ যুবার বদনে।
ওই দেখ অঙ্গে অঙ্গে এখনো যুবার
বিরাজিছে স্থলক্ষণ অস্ফুট ছায়ায়
হায়রে! যেমতি আজ আর্য্যাবর্ত্ত হৃদে
বিলুপ্ত—চিতোর কিম্বা রাজস্থান ছায়া
অথবা শিবজী কীর্ত্তি দক্ষিণ ভারতে
ক্লেশকর দৃশ্য ধরি করিছে বিরাজ।
"স্বভাবে কি অর্থ নাই ?" বলিতে বলিতে
ত্যজি দীর্ঘ শ্বাস যুবা চাহিল গগনে
নিরখিয়া ক্ষণকাল কহিল কাতরে
"ওই যে প্রকাণ্ড দৃশ্য সম্মুখে আমার
অনাদি—অনন্ত ওই—বিপুলা প্রকৃতি
শিক্ষার জীবন্ত পত্র ভাবিয়া যাহায়
ছুটিলাম আজীবন শূন্য আকাঙ্ক্ষায়—
সেই শিক্ষা পত্র—ওই অশ্রান্ত প্রভাব
কেবলি কি শূন্যে আদি—শূন্যে অন্ত তার!
আমার এ দুর্নিবার আশা অবিশ্রাম
নিরাশাই কেবলি কি তার পরিণাম!
পারিনা দেখিতে আর—পারিনা ভাবিতে
প্রকৃতি তোমার অর্থ—অতৃপ্ত হৃদয়ে।
সহিষ্ণুতা!—সহিষ্ণুতা—বাকি কিবা আর!
ছিন্ন করি—ছিন্ন করি—গ্রন্থি হৃদয়ের
দুস্ত্যাজ্য—দুশ্ছেদ্য—মম স্থত্র মমতার
ছিন্ন করি ভাসিলাম একা পারাবারে
স্থধু ওই অর্থ তব দেখিতে দেখিতে—
ভাসে যথা সিন্ধুনীরে বিপথ নাবিক
স্থদূর গগনে দূর তারা লক্ষ্য করি!
কিন্তু কি করিনু—স্থধু পণ্ডশ্রম সার
কিম্বা নাহি বুঝিলাম প্রকৃতি তোমার
কিবা সে প্রকৃত অর্থ!—কিন্তু যে আমার
দৃষ্টি নাহি চলে আর—হেরি শূন্যময়
শব্দহীন—প্রাণহীন—অর্থহীন শূন্য
না পারি সরিতে আমি না পারি তিষ্ঠিতে
পদতলে শূন্য—ঊর্দ্ধে শূন্য ততোধিক
সম্মুখে নীবিড় শূন্য—পশ্চাতে আবার
কেবলি অনন্ত শূন্য—নহে ফিরিবার।
ভাবি যেন সরিতেছে শূন্য পদমূলে
পতন না হয় তবু! দুর্জ্জেয় বিধাত!
কৃপা করি অনুভূতি কর অপস্থত,
এ চিন্তা হৃদয়ে আর পারিনা বহিতে
নতুবা দেখাও পথ তাপিত সেবকে
ফিরে যাই দুরাশার প্রবাহ আমার
উপজিল যথা হতে—অথবা আমায়
দেহ বল বিশ্বনাথ! শূন্য ভেদ করি
আমার কল্পিত রাজ্য করিব উদ্ধার
অমিত প্রভাবে যথা বিশ্বামিত্র ঋষি
স্থজিল ব্রহ্মাণ্ড নব মথি শূন্য পথ।"
নীরব হইল যুবা—ক্ষণকাল পরে
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস ধীরে নত কৈল শির।
সহসা কঠোর রব জলদ গম্ভীরে
শূন্য-দেশ হ'তে যেন হইল উত্থিত;
সিহরি চকিত নেত্রে চাহিল যুবক
হেরিল চৌদিকে ঘোর শবদ বিকাশে
ক্ষিপ্ত-তেজ-মরুদ্ব্যোম হ'তে সমস্বরে
উঠিছে কঠোর-রব—ভাবিল যুবক
বিশ্ব মগ্ন যেন সেই অদ্ভুত ভাষায়।
ক্রমে স্পষ্টতর রব হইল উত্থিত—
"প্রকৃতি নিরর্থ নহে দেখ নেত্র তুলি
এই যে বিপুল বিশ্ব সম্মুখে তোমার
প্রকাণ্ড এ শূন্য-পথ বিশাল ধরণী

অনন্ত—এ জীবকুল তরু লতাগিরি,
নদ নদী সরোবর অকূল জলধি
এই আলো অন্ধকার—দিবসরজনী
এই ঋতু পরকাশ—ঋতু অবসানে
পরিপূর্ণ অর্থে সব বিশ্ব অর্থময়।
এই গগনেতে লেখা কঠোর সাধনা
ধরণীর বক্ষে ওই লেখা সহিষ্ণুতা
পবনের স্পর্শে লেখা ঘোর উদ্দীপনা
ভূধরের অঙ্গে ওই লেখা দৃঢ়ব্রত
সলিলের অঙ্গে অঙ্গে লেখা আত্মদান
জীবকুল-আস্যে লেখা ওই দেখ আশা
তরুলতা অঙ্গে ওই লেখা সফলতা
দিবস রজনী আর ঋতুর বিকাশে
অবস্থার বিচিত্রতা সতত প্রকাশে।!'
নীরব হইল রব—নীরব প্রান্তর—
হইল নীরবতর—শূন্য নভস্তল
হইল অধিক শূন্য—উর্দ্ধমুখে যুবা
উদাস উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টে তখনো চাহিয়া
শূন্য গগনের তলে, দেখিতে দেখিতে
যুবার কাতর মুখ প্রশান্ত হইল
জ্বলিতে লাগিল নেত্রে জীবন্ত প্রতিভা
উৎসাহে বিশাল বক্ষঃ দীর্ঘবাহুদ্বয়
হইল প্রশস্ততর অস্তমান রবি
নিরখি সে ভীম মুর্ত্তি প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক
নিরাশ্রয়—নিঃসহায়—একাকি যে যুবা
অদ্ভুত দুষ্কর কার্য্য করিবে সাধন
সেই কীর্ত্তিধর—সেই অপূর্ব্ব নরের
নিরখি চৈতন্য-ভয়ে ত্বরিত চরণে
পশিলেন অস্তাচলে—অস্ফুট প্রদোষ
ধীরে ধীরে শূন্যদেশে পড়িল ছড়ায়ে
ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর—গাঢ়তম শেষে
অন্ধকারশূন্যমর্ত্ত্য আবরিল ধীরে
অনন্য আঁধারে ক্রমে ডুবিল জগৎ।
তখনো যুবক উর্দ্ধে উদ্ভ্রান্ত-নয়নে
চেয়েছিল অন্ধময় আকাশের পানে।
দেখিতে দেখিতে দূর—সুদূর আকাশে
ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ—সূক্ষ্ম আলোক বিকাশি
ভাতিল তারকা এক—দুই—তিন—চারি
ক্রমে পুঞ্জ—ক্রমে শত—সহস্র তারকা
উজ্জল—উজ্জলতর—সমুজ্জল হয়ে
চৌদিকে উঠিল জ্বলি—দেখিতে দেখিতে
অস্ফুট নিষ্প্রভ এক অঙ্গ চন্দ্রমার—
প্রকাশিল দূরনভে—ক্রমে স্পষ্টতর
অর্দ্ধাংশ—ত্রয়াংশ—ক্রমে পূর্ণ—আয়তনে
রজত থালার মত—পূর্ণ—জোছনায়
হাসায়ে ভুবন চন্দ্র—ভাসিল গগনে।
হেরিল যুবক শেষে শূন্য নভস্থল—.
গ্রহ—উপগ্রহে পূর্ণ—নহে—শূন্য আর—
তখন একাগ্রদৃষ্টে—তীর্য্যক নয়নে
দেখিতে লাগিল যুবা গগন মণ্ডলে,
বিস্ময়ে পুরিল চিত্ত—ক্ষণকাল আগে
অর্থ-হীন ভাবি যেই নভস্তল হ'তে
সরাইয়াছিল নেত্র—সেই শূন্য এবে
হেরিল যুবক পূর্ণ—গ্রহ উপগ্রহে।
শত সহস্র—অযুত—লক্ষ—কোটী কোটী
গ্রহে পরিপূর্ণ শূন্য বিচিত্র বিস্তার।
এমন সময় এক তাপস প্রাচীন
মুর্ত্তিমান বহ্নিপ্রায় উপনীত তথা।
শ্বেত-শ্মশ্রুরাজি—রজত প্রবাহে
পড়িয়াছে কোটি ঢাকি, গৈরিক বসন,
লোহিত চন্দন লেপ—প্রশস্ত ললাটে
বিশাল দক্ষিণ করে ধৃত কমণ্ডলু'

বাম করে দেহাধিক বিশাল ত্রিশূল
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন নিজে মহাযোগ
তাপসের বেশে আজ সম্মুখে যুবার।
আয়ত লোচন কিন্তু শান্তির সাগর
পলকে পলকে তাঁর ঝরিছে অভয়।
এত যে ভীষণ মূর্ত্তি দীপ্ত উগ্রতেজে
দৃষ্টিতে ঝরিছে কিন্তু "অভয় অভয়।"
"মহেন্দ্র!" গম্ভীরে ডাকি কহিল তাপস
"স্বভাবের অর্থ তুমি বুঝিলে কি এবে?"
মহেন্দ্র চকিতে ফিরি হেরিল তাপসে—
পূর্ণচন্দ্রমার প্রভা পড়িয়া ত্রিশূলে
জ্বলিয়া উঠিছে যেন ত্রিফলা তাহার
গৈরিক বসনে সেই উজ্জ্বল কিরণ
পড়িয়া রক্তাক্ত বেশ হৈল দৃশ্যমান
ললাটে সে পূর্ণজ্যোতি হইয়া পতিত
বহ্নিপ্রায় দীপ্ত হৈল চন্দন প্রলেপ
কাঁপিয়া উঠিল যুবা সে মূর্ত্তি নিরখি।
তাপস কহিল পুন, "বুঝিলে মহেন্দ্র?
"অনন্ত—অদ্ভুত এই সৃষ্টি চতুর্দ্দিকে
সাধনার কার্য্য ইহা—মন্ত্রে সৃষ্ট নয়।
শোক দুঃখ ক্ষোভ আর ছায়া নিরাশার
কর অপসৃত তব হৃদিতল হ'তে।
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর তব সাধনার পথে।
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টি মত
গ্রহ উপগ্রহে শেষে হবে পরিণত।"
দেখিতে দেখিতে ঋষি গেল মিলাইয়া
প্রকৃতির শূন্য অঙ্কে—বিস্ময়ে যুবক
চৌদিকে আগ্রহ নেত্রে করিল দর্শন
কিন্তু তাপসের আর নহিল সন্ধান
ধীরে ধীরে ভূমিতলে বসিয়া তখন
প্রকৃতির চিত্রপটে রহিল চাহিয়া।
গগনে ভূতলে জলে লতায় পাতায়
যেখানে নিরখে যুবা হেরে অর্থ তায়।
তোমরাও বঙ্গবাসি! যুবকের সনে
প্রকৃতির এই অর্থ দেখিতে দেখিতে
হও অগ্রসর সবে আকাঙ্ক্ষার পথে
পুরস্কার তার—শূন্যে ওই সৃষ্টিমত
অনন্ত অসীম রাজ্যে হবে পরিণত।

ঈশান—

পালামৌ।

কোলের নৃত্যসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে, এবার তাহাদের বিবাহের পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কোলের অনেক শাখা আছে। আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় যেন উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোসাদ এই চারি জাতি তাহার মধ্যে প্রধান। ইহার এক জাতির বিবাহে আমি বরযাত্রী হইয়া কতক দূর গিয়াছিলাম। বরকর্ত্তা আমার পাল্‌কি লইয়া গেল, কিন্তু আমায় নিমন্ত্রণ করিল না; ভাবিলাম, না করুক, আমি রবাহূত যাইব। সেই অভিপ্রায়ে অপরাহ্লে পথে দাঁড়াইয়া থাকিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি পাল্‌কিতে বর আসিতেছে। সঙ্গে দশ বার জন পুরুষ আর পাঁচ ছয় জন যুবতী, যুবতীরাও বরযাত্রী। পুরুষেরা আমায় কেহই ডাকিল না, স্ত্রীলোকের চক্ষুলজ্জা আছে, তাহারা হাসিয়া আমায় ডাকিল, আমিও হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে চলিলাম, কিন্তু অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, তাহারা যেরূপ বুক ফুলাইয়া, মুখ তুলিয়া, বায়ু ঠেলিয়া মহাদম্ভে চলিতেছিল আমি দুর্ব্বল বাঙ্গালি আমার সে দম্ভ, সে শক্তি কোথায়? সুতরাং কতক দূর গিয়া পিছাইলাম; তাহারা তাহা লক্ষ্য করিল না, হয় ত দেখিয়াও দেখিল না; আমি বাঁচিলাম। তখন পথপ্রান্তে এক প্রস্তরস্তূপে বসিয়া ঘর্ম্ম মুছিতে লাগিলাম আর রাগভরে পাতুরে মেয়ে গুলাকে গালি দিতে লাগিলাম। তাহাদিগকে সেপাই বলিলাম, সিদ্ধেশ্বরীর পাল বলিলাম, আর কত কি বলিলাম। আর একবার বহু পূর্ব্বে এইরূপ গালি দিয়াছিলাম। একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় টিটাগোড়ের বাগানে "লসিংটন লজ" হইতে গজেন্দ্রগমনে আমি আসিতেছিলাম—তখন রেলওয়ে ছিলনা সুতরাং এখনকার মত বেগে পথ চলা বাঙ্গালির মধ্যে বড় ফেসন হয় নাই—আসিতে আসিতে পশ্চাতে একটা অল্প টক টক শব্দ শুনিতে পাইলাম। ফিরিয়া দেখি গবর্ণর জেনেরল কাউন্‌সলের অমুক মেম্বারের কুলকন্যা একা আসিতেছেন। আমি তখন বালক, ষোড়শ বৎসরের অধিক আমার বয়স নহে, সুতরাং বয়সের মত স্থির করিলাম স্ত্রীলোকের নিকট পিছাইয়া পড়া হইবে না, অতএব যথাসাধ্য চলিতে লাগিলাম। হয় ত যুবতীও তাহা বুঝিলেন। আর একটু অধিক বয়স হইলে এদিকে তাঁহার মন যাইত না। তিনি নিজে অল্পবয়স্কা; আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র বয়োজ্যেষ্ঠা, সুতরাং এই উপলক্ষে বাইচ খেলার আমোদ তাঁহার মনে আসা সম্ভব। সেই জন্য একটু যেন তিনি জোরে বাহিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে মেঘের মত আমা... ছাড়াইয়া

গেলেন, যেন সেই সঙ্গে একটু "ছুয়ো" দিয়া গেলেন,—অবশ্য তাহা মনে মনে, তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসি ছিল তাহাই বলিতেছি। আমি লজ্জিত হইয়া নিকটস্থ বটমূলে বসিয়া সুন্দরীদের উপর রাগ করিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলাম। যাহারা এত জোরে পথ চলে তাহারা আবার কোমলাঙ্গী? খোসামুদেরা বলে তাহাদের অলকদাম সরাইবার নিমিত্ত বায়ু ধীরে ধীরে বহে। কলা গাছে ঝড়, আর সীমুল গাছে সমীরণ?

সে সকল রাগের কথা এখন যাক, যে হারে সেই রাগে। কোলের কথা হইতে ছিল। তাহাদের সকল জাতির মধ্যে এক-রূপ বিবাহ নহে। এক জাতি কোল আছে, তাহারা উরাও কি, কি তাহা স্মরণ নাই, তাহাদের বিবাহপ্রথা অতি পুরা-তন। তাহাদের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করিয়া বড় ঘর থাকে। সেই ঘরে সন্ধ্যার পর একে একে গ্রামের সমুদায় কুমারীরা আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই ঘর তাহাদের ডিপো। বিবাহযোগ্যা হইলে আর তাহারা পিতৃগৃহে রাত্রি যাপন করিতে পায় না। সকলে উপস্থিত হইয়া শয়ন করিলে গ্রামের অবিবা-হিত যুবারা ক্রমে ক্রমে সকলে সেই ঘরের নিকটে আসিয়া রসিকতা আরম্ভ করে; কেহ গীত গায়, কেহ নৃত্য করে, কেহ বা রহস্য করে। যে কুমারীর বিবাহের সময় হয় নাই সে অবাধে নিদ্রা যায়। কিন্তু যাহাদের সময় উপস্থিত তাহারা বসন্তকালের পক্ষিণীর ন্যায় অনি-মেষলোচনে সেই নৃত্য দেখিতে থাকে, একাগ্রচিত্তে সেই গীত শুনিতে থাকে। হয় ত থাকিতে না পারিয়া শেষ ঠাট্টার উত্তর দেয়, কেহ বা গালি পর্য্যন্তও দেয়। গালি আর ঠাট্টা উভয়ে প্রভেদ অল্প, বিশেষ যুবতীর মুখবিনির্গত হইলে যুবার কর্ণে উভয়ই সুধাবর্ষণ। কুমারীরা গালি আরম্ভ করিলে কুমারেরা আনন্দে মাতিয়া উঠে।

এইরূপে প্রতিরাত্রে কুমার কুমারীর বাক্‌চাতুরি হইতে থাকে, শেষ তাহাদের মধ্যে প্রণয় উপস্থিত হয়। প্রণয় কথাটী ঠিক নহে। কোলের প্রেম প্রীতের বড় সম্বন্ধ রাখে না। মনোনীত কথাটি ঠিক্। নৃত্য, হাস্য উপহাস্যের পর পরস্পর মনোনীত হইলে, সঙ্গী সঙ্গিনীরা তাহা কাণাকাণি করিতে থাকে। ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রকথা শুনিয়া উভয় পক্ষের পিতৃকুল সাবধান হইতে থাকে। সাবধানতা অন্য বিষয়ে নহে। কুমারীর আত্মীয় বন্ধুরা বড় বড় বাঁস কাটে, তীর ধনুক সংগ্রহ করে; অস্ত্রশস্ত্রে সান দেয়। আর অন-বরত কুমারের আত্মীয় বন্ধুকে গালি দিতে থাকে। চীৎকার আর আস্ফা-লনের সীমা থাকে না। আবার এদিকে উভয় পক্ষে গোপনে গোপনে বিবাহের আয়োজনও আরম্ভ করে।

শেষ একদিন অপরাহ্নে কুমারী

হাসি হাসি মুখে বেশ বিন্যাস করিতে বসে। সকলে বুঝিয়া চারি পার্শ্বে দাঁড়ায়, হয় ত ছোট ভগিনী বন হইতে নূতন ফুল আনিয়া মাথায় পরাইয়া দেয়, বেশ বিন্যাস হইলে কুমারী উঠিয়া গাগরি লইয়া একা জল আনিতে যায়। অন্য দিনের মত নহে, এ দিনে ধীরে ধীরে যায়, তবু মাথার গাগরি টলে। বনের ধারে জল, যেন কতই দূর! কুমারী যাইতেছে আর অনিমেষলোচনে বনের দিকে চাহিতেছে। চাহিতে চাহিতে বনের দুই একটী ডাল দুলিয়া উঠিল, তাহার পর এক নবযুবা, সখা সুবলের মত, লাফাইতে লাফাইতে সেই বন হইতে বহির্গত হইল, সঙ্গে সঙ্গে হয় ত দুটা চারিটা ভ্রমরও ছুটিয়া আসিল। কোল-কুমারীর মাথা হইতে গাগরি পড়িয়া গেল। কুমারীকে বুকে করিয়া যুবা অমনি ছুটিল। কুমারী সুতরাং এ অবস্থায় চীৎকার করিতে বাধ্য, চীৎকারও সে করিতে লাগিল। হাত পাও আছড়াইল। এবং চড়টা চাপড়টা যুবাকেও মারিল; নতুবা ভাল দেখায় না! কুমারীর চীৎকারে তাহার আত্মীয়েরা "মার মার" রবে আসিয়া পড়িল। যুবার আত্মীয়েরাও নিকটে এখানে সেখানে লুকাইয়াছিল তাহারাও বাহির হইয়া পথরোধ করিল। শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ রুক্মিণীহরণের যাত্রার মত, সকলের তীর আকাশমুখী। কিন্তু শুনিয়াছি দুই একবার নাকি সত্য সত্যই মাথা ফাটাফাটিও হইয়া গিয়াছে। যাহাই হউক শেষ যুদ্ধের পর আপশ হইয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ উভয় পক্ষ একত্র আহার করিতে বসে।

এইরূপ কন্যা হরণ করাই তাহাদের বিবাহ। আর স্বতন্ত্র কোন মন্ত্র তন্ত্র নাই। আমাদের শাস্ত্রে এই বিবাহকে আসুরিক বিবাহ বলে। এক সময় পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই বিবাহ প্রচলিত ছিল। আমাদের দেশে স্ত্রী আচারের সময় বরের পৃষ্ঠে বাউটিবেষ্টিত নানা ওজনের করকমল যে সংস্পর্শ হয় তাহাও এই মারপিট প্রথার অবশেষ। হিন্দুস্থান অঞ্চলে বরকন্যার মাসি পিসি একত্র জুটিয়া নানা ভঙ্গীতে, নানা ছন্দে, মেছুয়াবাজারের ভাষায় পরস্পরকে যে গালি দিবার রীতি আছে তাহাও এই মারপিট প্রথার নূতন সংস্কার। ইংরেজদের বরকন্যা গির্জ্জা হইতে গাড়ীতে উঠিবার সময় পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহাদের অঙ্গে যে জুতাবৃষ্টি হয় তাহাও এই পূর্ব্বপ্রথার অন্তর্গত। *

কোলদের উৎসব সর্ব্বাপেক্ষা বিবাহে। তদুপলক্ষে ব্যয়ও বিস্তর। আট টাকা, দশ টাকা, কখন কখন

* যে আসুরিক বিবাহের পরিচয় দিলাম তাহা Exogamy নহে। কেন না ইহা স্বজাতি বিবাহ।

পনর টাকা পর্য্যন্তও ব্যয় হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অতি সামান্য কিন্তু বন্যের পক্ষে অতিরিক্ত। এত টাকা তাহারা কোথা পাইবে? তাহাদের এক পয়সা সঞ্চয় নাই, কোন উপার্জ্জনও নাই, সুতরাং ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত কর্জ্জ করিতে হয়। দুই চারি গ্রাম অন্তর একজন করিয়া হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে, তাহারাই কর্জ্জ দেয়। এই হিন্দুস্থানীরা মহাজন কি মহাপিশাচ সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তাহাদের নিকট একবার কর্জ্জ করিলে আর উদ্ধার নাই। যে একবার পাঁচ টাকা মাত্র কর্জ্জ করিল সে সেই দিন হইতে আপন গৃহে আর কিছুই লইয়া যাইতে পাইবে না, যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনকে আনিয়া দিতে হইবে। খাতকের ভূমিতে দুই মণ কার্পাস কি চারি মণ যব জন্মিয়াছে; মহাজনের গৃহে তাহা আনীত হইবে; তিনি তাহা ওজন করিবেন, পরীক্ষা করিবেন, কত কি করিবেন, শেষ হিসাব করিয়া বলিবেন যে আশল পাঁচ টাকার মধ্যে এই কার্পাসে কেবল এক টাকা শোধ গেল, আর চারি টাকা বাকি থাকিল। খাতক যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরিবার খায় কি? চাষে যাহা জন্মিয়াছিল মহাজন তাহা সমুদয় লইল। খাতক হিসাব জানে না, এক হইতে দশ গণনা করিতে পারে না, সকলের উপর তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। মহাজন যে অন্যায় করিবে ইহা তাহার বুদ্ধিতে আইসে না। সুতরাং মহাজনের জালে বদ্ধ হইল। তাহার পর পরিবার আহার পায় না, আবার মহাজনের নিকট খোরাকী কর্জ্জ করা আবশ্যক, সুতরাং খাতক জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত হইল। যাহা সে উপার্জ্জন করিবে তাহা মহাজনের। মহাজন তাহাকে কেবল যৎসামান্য খোরাকি দিবে। এই তাহার এ জন্মের বন্দোবস্ত।

কেহ কেহ এই উপলক্ষে "সামকনামা" লিখিয়া দেয়। সামকনামা অর্থাৎ দাসখত। যে ইহা লিখিয়া দিল সে রীতিমত গোলাম হইল। মহাজন গোলামকে কেবল আহার দেন, গোলাম, বিনাবেতনে তাঁহার সমুদয় কর্ম্ম করে; চাষ করে, মোট বহে, সর্ব্বত্র সঙ্গে যায়। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তাহার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সংসারও তাহাদের অন্নাভাবে শীঘ্রই লোপ পায়।

কোলদের এই দুর্দ্দশা অতি সাধারণ, তাহাদের কেবল এক উপায় আছে—পলায়ন। অনেকেই পলাইয়া রক্ষা পায়। যে না পলাইল সে জন্মের মত মহাজনের নিকট বিক্রীত থাকিল।

পুত্রের বিবাহ দিতে গিয়া যে কেবল কোলের জীবনযাত্রা বৃথা হয় এমত নহে, আমাদের বাঙ্গালির মধ্যে অনেকের দুর্দ্দশা পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে অথবা পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ উপলক্ষে। সকলেই মনে মনে জানেন আমি বড় লোক,

আমি "ধুমধাম" না করিলে লোকে আমার নিন্দা করিবে। সুতরাং কর্জ্জ করিয়া সেই বড়লোকত্ব রক্ষা করেন তাহার পর যথাসর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে কর্জ্জ হইতে উদ্ধার হওয়া ভার হয়। প্রায় দেখা যায় "আমি ধনবান্" বলিয়া প্রথমে অভিমান জন্মিলে শেষ দারিদ্র্য-দশায় জীবন শেষ করিতে হয়।

কোলেরা সকলেই বিবাহ করে। বাঙ্গালা শস্যশালিনী, এখানে অল্পেই গুজরান চলে, তাহাই বাঙ্গালায় বিবাহ এত সাধারণ। কিন্তু পালামৌ অঞ্চলে সম্পূর্ণ অন্নাভাব, সেখানে বিবাহ এরূপ সাধারণ কেন, তদ্বিষয়ে সমাজতত্ত্ববিদেরা কি বলেন জানি না। কিন্তু বোধ হয় হিন্দুস্থানী মহাজনেরা তথায় বাস করিবার পূর্ব্বে কোলদের এত অন্নাভাব ছিল না। তাহাই বিবাহ সাধারণ হইয়াছিল। এক্ষণে মহাজনেরা তাহাদের সর্ব্বস্ব লয়। তাহাদের অন্নাভাব হইয়াছে, সুতরাং বিবাহ আর পূর্ব্বমত সাধারণ থাকিবে না বলিয়া বোধ হয়।

কোলের সমাজ এক্ষণে যে অবস্থায় আছে দেখা যায় তাহাতে সেখানে মহাজনের আবশ্যক নাই, যদি হিন্দুস্থানী সভ্যতা তথায় প্রবিষ্ট না হইত তাহা হইলে অদ্যাপি কোলের মধ্যে ঋণের প্রথা উৎপত্তি হইত না। ঋণের সময় হয় নাই। ঋণ উন্নত সমাজের সৃষ্টি। কোলদিগের মধ্যে সে উন্নতির বিলম্ব আছে। সমাজের স্বভাবতঃ যে অবস্থা হয় নাই কৃত্রিম উপায়ে সে অবস্থা ঘটাইতে গেলে, অথবা সভ্য দেশের নিয়মাদি অসময়ে অসভ্য দেশে প্রবিষ্ট করাইতে গেলে, ফল ভাল হয় না। আমাদের বাঙ্গালায় এ কথার অনেক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এক সময় ইহুদি মহাজনেরা ঋণ দানের সভ্য নিয়ম অসভ্য বিলাতে প্রবেশ করাইয়া অনেক অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল। এক্ষণে হিন্দুস্থানী মহাজনেরা কোলদের সেইরূপ অনিষ্ট ঘটাইতেছে।

কোলের নববধূ আমি কখন দেখি নাই। কুমারী এক রাত্রের মধ্যে নববধূ! দেখিতে আশ্চর্য্য! বাঙ্গালায় দুরন্ত ছুঁড়িরা ধূলাখেলা করিয়া বেড়াইতেছে, ভাইকে পিটাইতেছে, পরের গোরুকে গালি দিতেছে, পাড়ার ভালথাগীদের সঙ্গে কোঁদল করিতেছে, বিবাহের কথা উঠিলে ছুঁড়ি গালি দিয়া পলাইতেছে। তাহার পর একরাত্রে ভাবান্তর। বিবাহের পরদিন প্রাতে আর সে পূর্ব্বমত দুরন্ত ছুঁড়ি নাই। এক রাত্রে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমি একটী এইরূপ নববধূ দেখিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হয়।

বিবাহের রাত্রি আমোদে গেল। পর দিন প্রাতে উঠিয়া নববধূ ছোট ভাইকে আদর করিল, নিকটে মা ছিলেন নববধূ মার মুখ প্রতি এক বার চাহিল, মার চক্ষে জল আসিল, নববধূ মুখাবনত করিল, কাঁদিল না। তাহার পর ধীরে ধীরে এক নির্জ্জন

অর্থাৎ জড়ের সাহায্যে জড় হইতে যদি ট্রেণ টেলিগ্রাফ টেলিফোন ইত্যাদি হইতে পারে, তবে সেই নির্জ্জীবকে সজীব করিতে পারিলে কি না হয়? ইংরেজের মত হিন্দুরা ট্রেণ টেলিগ্রাফে পরিতৃপ্ত নহে। তাহাদের মনে শক্তির আদর্শ আরও উন্নত। হিন্দু আকাশপথে চলিতে চায়, চন্দ্রলোকে যাইতে চায়; জড়দেহ হইতে ইচ্ছামত নিষ্ক্রান্ত হইতে চায়, বাক্‌সিদ্ধ হইতে চায়, আরও কত কি হইতে চায়। ইহার সম্ভাবনা-শূন্যতা হিন্দুর মনে একেবারে আইসে না। হিন্দুর মন সর্ব্বশক্তিমান্। মনের সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় হিন্দু পাইয়াছে, পরিচয়ে বিশ্বাস করিয়াছে। কে সে বিশ্বাসের অন্যথা করিবে? হিন্দুকে কে বুঝাইবে যে তোমার আকাঙ্ক্ষা স্বভাব-বিরুদ্ধ, জগতের ক্ষমতাতীত? হিন্দু তৎক্ষণাৎ হাসিবে, বলিবে "বাপু, জগতের ক্ষমতা কি পর্য্যন্ত? কোথায় তাহার সীমা? আজ তুমি যে ব্যাপার জগতের ক্ষমতাতীত বলিতেছ, কাল সে ব্যাপার ক্ষমতার অধীনে আসিতেছে। কাল তুমি বলিয়াছ, তারে সম্বাদ অসম্ভব, আজ তুমি নিজে তারে সম্বাদ দিতেছ। তোমার মন জড়দেহের অধীন, কাম ক্রোধ লোভ লইয়া তোমার মন, তাই তোমার এত ভ্রম। মনের অধীনত্ব ঘুচাও, তাহার জড়ের ভাগ নষ্ট কর, তোমার ক্ষমতা আরম্ভ হইবে। নির্জ্জীব জড়জগৎকে সজীব কর, তোমার ক্ষমতা অসীম হইবে।"

তাঁহারা বলেন, নির্জ্জীব জড়জগৎ সজীব হয় অন্তর্জ্জগতের সংযোগে।

সেই সংযোগের নাম যোগ। যোগীর যোগ।

অন্তর্জ্জগতে বহির্জ্জগতে সংযোগ! অর্থাৎ জগৎসঙ্গম! এ প্রকাণ্ড ব্যাপার হিন্দু ভিন্ন কে বুঝিতে চেষ্টা করিবে? তাঁহারা বলেন, যোগী ভিন্ন কে বা তাহা বুঝাইবে? কিন্তু যোগীরা তাহা গোপন করেন। আপনারাও গোপনে থাকেন। দুই এক জন বিলাতী লোক যাঁহারা এখন যোগ যোগী মানিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাঁহাদেরও এই বিশ্বাস!

অনেক হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, নির্জ্জীব জগৎ নিত্য সজীব হইতেছে। নিত্য আশ্চর্য্য কাণ্ড উদ্ভাবিত হইতেছে। জড় জগতের উপাসকগণ তাহা দেখিতে পায় না, তাহারা দেখিবার অধিকারী নহে, দেখিলে তাহারা ভোজ বাজি মনে করে। ভোজবাজি! যাহা তাহাদের বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত তাহাই ভোজ বাজি। যাহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত তাহাই ভোজবাজি। ভূকৈলাসের যোগী ভোজ বাজি। দেখিয়াও বিশ্বাস হয় না এই জন্য ভোজ বাজি।